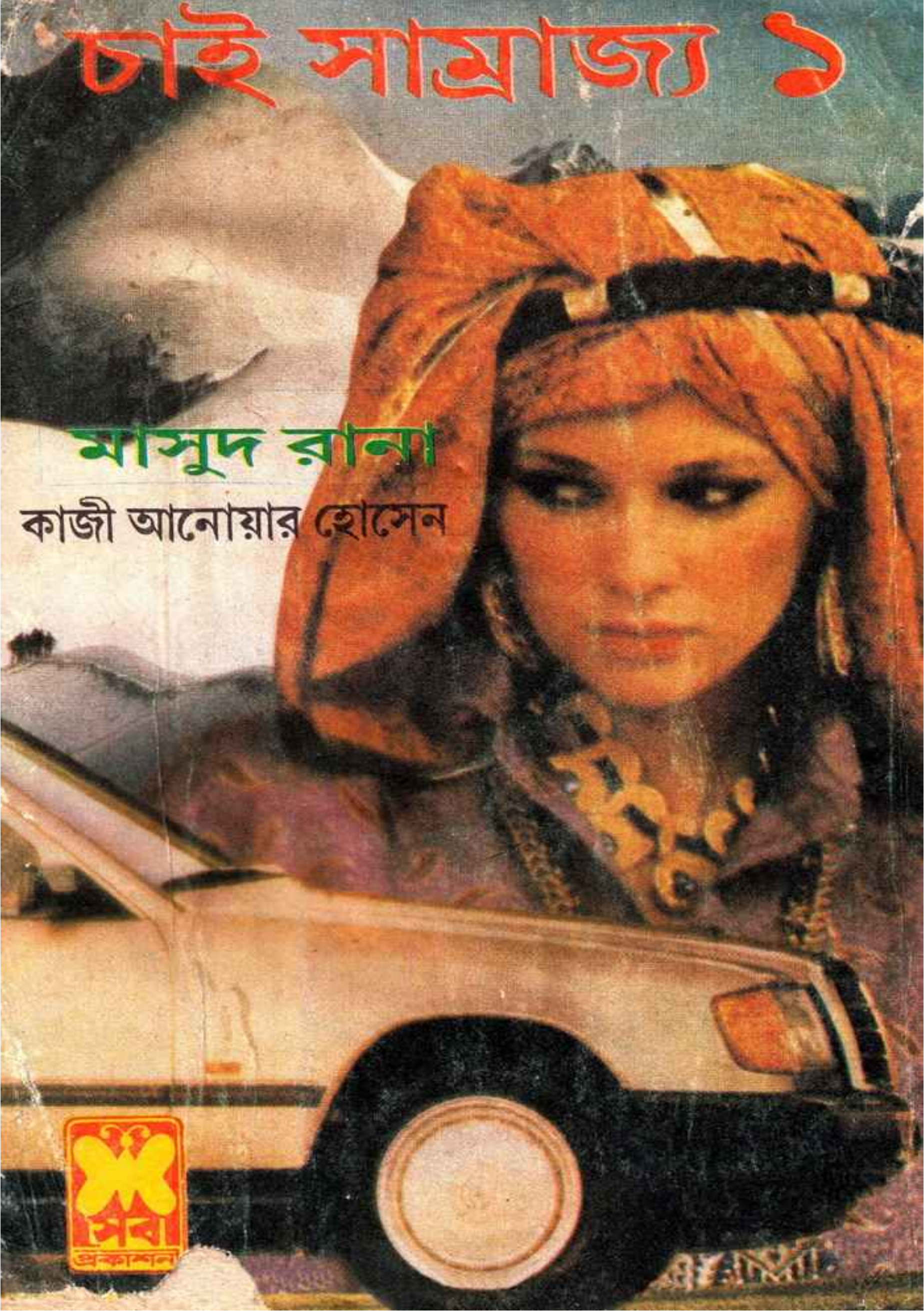
চাই সাম্রাজ্য ১
মাসুদ রানা
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

চাই সাম্রাজ্য-১

দুইখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চোপন্যাস

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও বুঝতে অসুবিধে নেই

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-১৬৮

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর-সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর অস্তিত্ব সত্যিই ছিলো। যুদ্ধ আর ধর্মান্ধতার কারণে ওর ওপর আঘাত না এলে আজ আমরা শুধু যে মিশরীয়, গ্রীক আর রোমান সাম্রাজ্য ও সভ্যতা সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারতাম তাই নয়, ভূমধ্যসাগর থেকে অনেক দূরের স্বল্পপরিচিত আরো অনেক সভ্যতা সম্পর্কেও বিশদ জানার সুযোগ পেতাম। অনেক বড় বড় গ্রীক দার্শনিকের লেখা বই ছিলো ওখানে।

তিনশো একানব্বুই খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান সম্রাট থিয়োডোসিয়াস হুকুম জারি করেন, পৌত্তলিকতার সাথে ক্ষীণতম সম্পর্ক আছে এমন সমস্ত বই-পুস্তক ও শিল্পকর্ম, পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

নানা সূত্র এবং আভাস থেকে এ-কথা মনে করবার কারণ আছে যে ঐসময়ে সংগ্রহের বেশিরভাগটাই ধ্বংস না করে গোপনে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়। তারপর সে-লাইব্রেরীর দশা কি হয়েছে বা কোথায় আছে তা আজ ষোলো শতাব্দী পরেও একটা রহস্য।

এক

পনেরোই জুলাই, তিনশো একানব্বুই খ্রিস্টাব্দ।

নিবিড় কালো সুড়ঙ্গপথে ছোট্ট, কাঁপা কাঁপা একটা আলো ভূতুড়ে আবহ তৈরি করেছে। লোকটার পরনে আঁটো জামা, উল দিয়ে বোনা, নেমে এসেছে হাঁটু পর্যন্ত। থামলো সে, হাতের কুপিটা মাথার ওপর উঁচু করে ধরলো। ছোট্ট শিখার আভায় আলোকিত হয়ে উঠলো মানুষের একটা দেহ, স্বর্ণ আর স্ফটিকের তৈরি একটা বাক্সের ভেতর রয়েছে ওটা। পিছনের মসৃণ দেয়ালে নৃত্য করছে কিম্ভূতকিমাকার ছায়া-গুলো। আঁটো জামা পরা জুনিয়াস ভেনাটর দৃষ্টিহীন চোখজোড়ার দিকে কয়েক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর কুপি নামিয়ে আরেক দিকে ঘুরলেন।

দীর্ঘ এক সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিশ্চল মূর্তিগুলো যেন মৃত্যুপুরীর নিস্তব্ধতার ভেতর ; সংখ্যায় এতো বেশি যে গুণে শেষ করা প্রায় অস-ম্ভব একটা কাজ।

হাঁটতে শুরু করলেন জুনিয়াস ভেনাটর, অমসৃণ মেঝেতে তাঁর পায়ের ফিতে বাঁধা স্যাণ্ডেল খসখস আওয়াজ তুললো। ক্রমশ চওড়া

হয়ে বিশাল এক গ্যালারিতে মিশেছে সুড়ঙ্গপথটা। গম্বুজ আকৃতির সিলিংটাকে অবলম্বন দেয়ার জন্যে খিলান তৈরি করায় প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু গ্যালারি কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। খানিক পর পর দেয়ালের চুনাপাথর কেটে একটা করে লম্বা ও গভীর দাগ টানা হয়েছে, ওগুলো দিয়ে ছাদের পানি নেমে এসে মেঝের চওড়া নর্দমায় পড়ে। দেয়ালের গায়ে বিভিন্ন আকৃতির গর্ত ; প্রতিটিতে অদ্ভুতদর্শন, গোলাকৃতি পাত্র, ব্রোঞ্জের তৈরি। খোদাই করা বিশাল এই গুহার মাঝখানে একই আকৃতির বড় বড় কাঠের বাক্সগুলো না থাকলে ভীতিকর জায়গাটাকে রোমের নিচে পাতাল সমাধিক্ষেত্র বলে ভুল হতে পারতো।

শেষ প্রান্তে তামার পাতে মোড়া ফিতে রয়েছে প্রতিটি বাক্সের সাথে, পাতগুলোয় বাক্সের নম্বর লেখা। প্যাপিরাস খুলে কাছাকাছি একটা টেবিলে সমান করলেন ভেনাটর, তাতে লেখা নম্বর তামার পাতে লেখা নম্বরের সাথে মেলালেন। বাতাস শুকনো আর ভারি, ঘামের সাথে ধুলো মিশে কাদার মতো জমছে গায়ে। দু'ঘণ্টা পর সন্তুষ্ট বোধ করলেন তিনি, প্রতিটি জিনিসের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। প্যাপিরাসটা গুটালেন, কোমরে জড়ানো কাপড়ের ভাঁজে ঢুকিয়ে রাখলেন সেটা।

ঘুরে ঘুরে গ্যালারির চারদিকে সাজানো সংগ্রহগুলোর দিকে আরেকবার তাকালেন ভেনাটর, অতৃপ্তির একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁর বুকের ভেতর থেকে। জানেন, এ-সব আর কোনোদিন তাঁর দেখা বা ছোঁয়ার সুযোগ হবে না। ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘুরলেন তিনি, হাতের কুপিটা বাড়িয়ে ধরে এগোলেন ফিরতি পথে।

বয়স হয়েছে ভেনাটরের, কিছুদিনের মধ্যে সাতষট্টিতে পড়বেন। মুখে অনেক ভাঁজ আর রেখা ফুটেছে, ক্লান্ত চরণে আগের সেই

ক্ষিপ্রতা নেই, বেঁচে থাকার আনন্দ এখন আর তিনি তেমন উপভোগ করেন না। তবে অনেক দিন পর আজ তাঁর সত্যি ভারি আনন্দ হচ্ছে, তৃপ্তি আর সন্তুষ্টির একটা অনুভূতি প্রাণশক্তির নতুন জোয়ার বইয়ে দিয়েছে তাঁর শরীরে। বিশাল একটা কর্মসূচী সাফল্যের সাথে শেষ করেছেন তিনি। কাঁধ থেকে নেমে গেছে গুরুদায়িত্ব। বাকি আছে শুধু দীর্ঘ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে রোমে ফিরে যাওয়া। কে জানে কি আছে ভাগ্যে, সমুদ্রযাত্রা নিরাপদ হবে কিনা তা শুধু নিয়তিই বলতে পারে।

আরো চারটে সুড়ঙ্গপথ ঘুরে পাহাড়ে বেরিয়ে এলেন ভেনাটর। ইতিমধ্যে একটা সুড়ঙ্গপথ পাথর ধসে বন্ধ হয়ে গেছে। ছাদ ধসে পড়ায় ওখানে বারোজন ক্রীতদাস পাথর চাপা পড়ে মারা গেছে। এখনো সেখানেই আছে তারা, চিঁড়েচ্যাপ্টা লাশগুলোর কবর হয়ে গেছে পাথরের তলায়। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন ভেনাটর। ওদের জন্যে দুঃখ করা অযৌক্তিক মনে হলো তাঁর। এখান থেকে ফিরে আবার তো সেই সম্রাটের খনিতেই কাজ করতে হতো ওদেরকে। আধপেটা খেয়ে, রোগ-শোকে ভুগে ধুঁকে ধুঁকে মরার চেয়ে এ বরং ভালোই হয়েছে। বেঁচে থাকাই ছিলো ওদের জন্যে অভিশাপ।

সুড়ঙ্গমুখটা এমনভাবে পাথর কেটে তৈরি যে বড় বাক্সগুলো ভেতরে ঢোকাতে কোনো অসুবিধে হয়নি। পাহাড়ে বেরিয়ে আসছেন ভেনাটর, এই সময় দূর থেকে একটা রোমহর্ষক আর্তচিৎকার ভেসে এলো। কপালে উদ্বেগের রেখা নিয়ে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলেন তিনি, আলোয় বেরিয়ে এসে চোখ কোঁচকালেন। থমকে দাঁড়িয়ে ক্যাম্পের দিকে তাকালেন তিনি, ঢালু একটা প্রান্তর জুড়ে সেটার বিস্তৃতি। অসভ্য কয়েকটা যুবতী মেয়েকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একদল রোমান সৈনিক। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র একটা মেয়ে আবার চিৎকার করে উঠে ধস্তা-

ধস্তি শুরু করে দিলো। সৈনিকদের পাঁচিল ভেঙে প্রায় বেরিয়ে এলো সে, কিন্তু সৈনিকদের একজন তার লম্বা কালো চুল ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো, ধুলোর ওপর ছিটকে পড়লো মেয়েটা।

দৈত্যাকার এক লোক ভেনাটরকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো। ক্যাম্পের সবার চেয়ে লম্বা সে, বিশাল কাঁধ, আর শক্তিশালী বাহু, হাতের শেষ প্রান্ত ঝুলে আছে হাঁটুর কাছাকাছি।

গল জাতির লোক লাটিনিয়াস মাসার, ক্রীতদাসদের প্রধান ওভারশিয়ার সে। হাত নেড়ে অভ্যর্থনা জানালো ভেনাটরকে, কথা বললো অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ আর কর্কশ কণ্ঠে। 'সব দেখলেন ?'

মাথা ঝাঁকালেন ভেনাটর। 'হ্যাঁ, তালিকা মেলানো হয়েছে। সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করতে পারো।'

'ধরে নিন বন্ধ হয়েছে।'

'ক্যাম্পে কিসের হৈ-চৈ ?'

ঘাড় ফিরিয়ে সৈনিকদের দিকে একবার তাকালো মাসার, ঘন ভুরু জোড়ার ভেতর তার লাল চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠলো যেন, একদলা থুথু ফেলে আবার তাকালো ভেনাটরের দিকে। তার কথা থেকে জানা গেল, বোকা সৈনিকরা অস্থির হয়ে পড়েছিল, এখান থেকে পাঁচ লীগ উত্তরের একটা গ্রামে হামলা চালিয়ে এইমাত্র ফিরে এসেছে। এই নির্মম রক্তপাতের কোনো মানে নেই। কম করেও চল্লিশজন অসভ্য মারা গেছে। তাদের মধ্যে পুরুষ ছিলো মাত্র দশজন, বাকি সবাই শিশু আর নারী। লাভ কিছুই হয়নি, কারণ সোনা আর অন্যান্য জিনিস যা সৈনিকরা লুট করে এনেছে তার মূল্য গাধার বিষ্ঠার সমানও নয়। আর এনেছে কুৎসিতদর্শন কিছু মেয়েলোক।

চেহারা কঠোর হয়ে উঠলো ভেনাটরের। 'আর কেউ বেঁচে গেছে ?'

'শুনলাম দু'জন পুরুষ নাকি জঙ্গলে পালিয়েছে।'

'তারা তাহলে অন্যান্য গ্রামে আওয়াজ দেবে। সর্বনাশ, সেভেরাস দেখছি মৌমাছির চাকে ঢিল ছুঁড়েছে।'

'সেভেরাস।' ঘৃণায় কুঁচকে উঠলো মাসারের ঠোঁটের কোণ। 'ওই ব্যাটা সেনটিউরিয়ান আর তার দল শুধু ঘুমোয় আর আমাদের মদ সাবাড় করে। পাছায় গরম লোহার ছ্যাঁকা দিন, তবে যদি ওদের কুঁড়েমি দূর হয়।'

'ওরা আমাদের রক্ষা করবে, সেজন্যেই ভাড়া করা হয়েছে,' মনে করিয়ে দিলেন ভেনাটর।

'কার হাত থেকে রক্ষা করবে?' ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞেস করলো মাসার। 'ধর্মহীন বর্বরদের হাত থেকে, যারা পোকা আর সাপ-ব্যাঙ খায়?'

'ক্রীতদাসদের এক জায়গায় জড়ো করো, তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দাও সুড়ঙ্গমুখ। খুব সাবধান, মাসার, কাজে যেন কোনো খুঁত না থাকে। আমরা চলে যাবার পর অসভ্যরা যেন আবার খুঁড়তে না পারে।'

'সে ভয় করবেন না। যতোটুকু দেখলাম, এই অভিশপ্ত দেশে এমন কেউ নেই যে ধাতুবিদ্যা জানে।' মুখ তুলে সুড়ঙ্গপথের মাথার ওপর তাকালো মাসার, গাছের বিশাল কাণ্ড পাশাপাশি সাজিয়ে প্রকাণ্ড মাচা তৈরি করা হয়েছে, মাচার ওপর পাথর, বালি আর মাটির আকাশছোঁয়া স্তূপ। স্তূপটা হেলান দিয়ে রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। 'মাচাটা সরিয়ে নেয়ার পর গোটা পাহাড় ধসে পড়বে, তখন যদি পাঁচশো হাতি থাকে নিচে, একটাকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আপনার মহামূল্য শিল্পকর্ম চিরকাল অক্ষতই থাকবে, ভেনাটর।'

নতুন করে আশ্বস্ত বোধ করলেন ভেনাটর। ওভারশিয়ারকে বিদায় করে দিয়ে রাগের সাথে ঘুরে দাঁড়ালেন, সেভেরাসের তাঁবুর দিকে যাচ্ছেন।

সামরিক বাহিনীর একটা প্রতীক চিহ্নকে পাশ কাটালেন ভেনাটর, বর্শার মাথায় একটা রূপালী ষাঁড়। একজন প্রহরী বাধা দিতে এগিয়ে এলো, এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিয়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকলেন তিনি।

তাঁবুর ভেতর একটা ক্যাম্প-চেয়ারে বসে রয়েছে সেনটিউরিয়ান, কোলের ওপর নগ্ন অসভ্য নারী। জীবনে বোধহয় কখনো গোসল করেনি মেয়েটা। সেভেরাসের দিকে মুখ তুলে দুর্বোধ্য কিচিরমিচির শব্দ করছে সে। বয়স নেহাতই কম, পনেরোর বেশি হবে না। সেভেরাসের গায়ে শুধু বুক ঢাকা আঁটো জামা। তার নগ্ন বাহু একজোড়া ব্রোঞ্জের তৈরি বন্ধনী দিয়ে অলংকৃত, দুই বাইসেপ কামড়ে আছে। একজন বীর যোদ্ধার পেশীবহুল বাহু, ঢাল আর তলোয়ার ধরায় যার রয়েছে দীর্ঘ-কালের অভিজ্ঞতা।

ভেনাটরের আকস্মিক আগমনে মুখ ফিরিয়ে তাকাবারও প্রয়োজন বোধ করলো না সেভেরাস।

'তাহলে এভাবেই তোমার সময় কাটছে, সেভেরাস?' তিরস্কার কর-লেন ভেনাটর, তাঁর কণ্ঠে শীতল ব্যঙ্গ। 'বিধর্মী একটা মেয়েকে নষ্ট করে ঈশ্বরের ক্রোধ অর্জন করছো?'

কঠিন কালো চোখ ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে ভেনাটরের দিকে তাকালো সেভেরাস। 'দিনটা আজ এতো গরম যে আপনার খ্রিস্টীয় প্রলাপ শোনার ধৈর্য হবে না। আমার ঈশ্বর আপনার ঈশ্বরের চেয়ে অনেক বেশি সহনশীল।'

'সত্যি, কিন্তু তুমি মূর্তি পুজো করো।'

'যাকে যার খুশি পূজা করতে পারে, প্রশ্নটা একান্তই বাছাইয়ের। আপনি বা আমি, কেউই আমরা নিজেদের ঈশ্বরকে মুখোমুখি কখনো দেখিনি। কে বলবে কারটা খাঁটি?'

'যীশু হলেন প্রকৃত ঈশ্বরের সন্তান।'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালো সেভেরাস। 'আপনি আমার ব্যক্তিগত সময় দখল করেছেন! সমস্যা কি, বলে বিদায় হোন।'

'তুমি যাতে বেচারি মেয়েটাকে নষ্ট করতে পারো?'

জবাব না দিয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো সেভেরাস। বুকে লেপ্টে থাকা মেয়েটাকে বস্তার মতো বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিলো সে। 'আমার সাথে যোগ দেয়ার ইচ্ছে আছে আপনার, ভেনাটর? থাকলে বলুন, আপনাকে প্রথম সুযোগ দেবো।'

সেনটিউরিয়ানের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ভেনাটর। ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল তাঁর শরীরে। যে রোমান সেনটিউরিয়ান একটা পদাতিক বাহিনীকে নেতৃত্ব দেয় তাকে অবশ্যই কঠোর হতে হবে, কিন্তু এ-লোক নির্দয় পশু। 'এখানে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে,' বললেন ভেনাটর। 'ক্রীতদাসদের নিয়ে সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করে দিচ্ছে মাসার। তাঁবু গুটিয়ে জাহাজে উঠতে পারি আমরা।'

'ঈজিপ্ট ছেড়েছি আজ এগারো মাস। আনন্দ-ফূর্তির জন্যে আরেকটা দিন দেরি করলে কোনো ক্ষতি নেই।'

'আমরা লুটপাট করতে আসিনি। অসভ্যরা প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজবে। আমরা মাত্র ক'জন, তারা অনেক।'

'আমাদের বিরুদ্ধে যতো অসভ্যই পাঠানো হোক, আমার সৈনিকরা তাদের সামলাতে পারবে।'

'তোমার লোকজন দুর্বল হয়ে পড়েছে।'

'রণকৌশল তারা ভুলে যায়নি,' আত্মবিশ্বাসের হাসি নিয়ে বললো সেভেরাস।

'কিন্তু তারা কি রোমের মর্যাদা রক্ষার জন্যে আত্মত্যাগ করবে?'

'কোন্ দুঃখে, কেন? সাম্রাজ্যের সুদিন এসে আবার চলে গেছে। আমাদের এককালের তিলোত্তমা টাইবার আজ নোংরা বস্তিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের শিরায় যদি রোমান রক্ত থেকেও থাকে, তা খুবই কম। আমার বেশিরভাগ লোকজন প্রদেশগুলোর আদি বাসিন্দা। আমি একজন স্প্যানিয়ার্ড আর আপনি একজন গ্রীক, জুনিয়াস ভেনাটর। আজকের এই বিশৃংখল পরিস্থিতিতে এমন একজন সম্রাটের প্রতি আধপোয়া বিশ্বস্ততাও থাকবে কেন, যে সম্রাট বহুদূর পুবের একটা শহর থেকে শাসন করেন? এমনকি শহরটাকে আমরা কেউ দেখিনি পর্যন্ত। না, জুনিয়াস ভেনাটর, না—আমার সৈনিকরা যুদ্ধ করবে, কারণ তারা পেশাদার যোদ্ধা, কারণ তাদেরকে যুদ্ধ করার জন্যে ভাড়া করা হয়েছে।'

'কিংবা অসভ্যরা তাদেরকে বাধ্য করবে।'

'যখনকার সমস্যা তখন। সত্যি যদি অসভ্যদের দুর্মতি হয়...।'

'সংঘর্ষ এড়ানো গেলে সব দিক থেকে ভালো। আমি সন্ধ্যা ঘনাবার আগেই রওনা হতে চাই...।'

বিকট শব্দে বাধা পেলেন ভেনাটর, পায়ের নিচে থরথর করে কেঁপে উঠলো মাটি। এক ছুটে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের ওপর দিকে তাকালেন তিনি। মাচার নিচ থেকে অবলম্বনগুলো সরিয়ে নিয়েছে ক্রীতদাসরা, বিশাল আকারের কয়েকশো টন পাথরসহ মাটি আর বালিতে ঢাকা পড়ে গেছে সুড়ঙ্গমুখ। ধুলোর প্রকাণ্ড মেঘ ক্ষীণস্রোত নালার ওপর ছড়িয়ে পড়লো। পতনের প্রতিধ্বনি এখনো শোনা

যাচ্ছে, শব্দটাকে ছাপিয়ে উঠলো সৈনিক আর ক্রীতদাসদের উল্লাস-ধ্বনি।

'যীশুর কৃপায় কাজটা শেষ হলো,' আপনমনে বিড়বিড় করলেন ভেনাটর, তাঁর প্রসন্ন চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো কি এক পবিত্র আলোয়। 'বহু শতকের জ্ঞান রক্ষা পেলো।'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালো সেভেরাস। 'দুঃখের বিষয়, কথাটা আমাদের সম্পর্কে খাটে না।'

ঘাড় ফেরালেন ভেনাটর। 'নিরাপদে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যদি ঘরে ফিরতে পারি, তারপর আর ভয় কিসের?'

'শারীরিক নির্যাতন আর মৃত্যু অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে,' চাঁছাছোলা ভাষায় বললো সেভেরাস। 'আমরা সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করেছি। সহজে ক্ষমা করার পাত্র থিয়োডোসিয়াস নন। সাম্রাজ্যের কোথাও আমাদের লুকোবার জায়গা থাকবে না। উচিত কাজ হবে বিদেশে কোথাও আশ্রয় খুঁজে নেয়া।'

'আমার স্ত্রী আর মেয়ে···এনটিওচ-এর ভিলায় তাদের সাথে আমার দেখা হওয়ার কথা···।'

'ধরে নিন ইতিমধ্যে তাদেরকে সম্রাটের লোকজন বেঁধে নিয়ে গেছে। হয় মারা গেছে, নয়তো ক্রীতদাস হিসেবে বেচে দেয়া হয়েছে।'

'অসম্ভব!' সবেগে মাথা নাড়লেন ভেনাটর, দু'চোখে অবিশ্বাস। 'উঁচু মহলে বন্ধু-বান্ধব আছে আমার, আমি না ফেরা পর্যন্ত ওদেরকে তারা রক্ষা করবে।'

'এমনকি উঁচুমহলের বন্ধুদেরকেও ভয় দেখিয়ে কাবু করা যায়। ঘুষ দিয়ে দুর্বল করাও সম্ভব।'

অকস্মাৎ কঠোর হয়ে উঠলো ভেনাটরের চেহারা। 'আমরা যা অর্জন

করেছি তার তুলনায় কোনো ত্যাগই বড় নয়। এখন শুধু দেখতে হবে আমরা যাতে অভিযানের রেকর্ড আর চার্ট নিয়ে ফিরতে পারি, তা না হলে সবই নিষ্ফল হয়ে যাবে।'

জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিলো সেভেরাস, কিন্তু সে তার সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ডকে ছুটে আসতে দেখে চুপ করে থাকলো। ঢাল বেয়ে তীর-বেগে ছুটে আসছে যুবক নোরিকাস, দুপুরের রোদে চকচক করছে তার ঘামে ভেজা মুখ, হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে সে, বার বার দূরবর্তী নিচু পাহাড়গুলোর দিকে হাত তুলে কি যেন দেখাবার চেষ্টা করছে।

কপালে হাত তুলে রোদ ঠেকালেন ভেনাটর, পাহাড়শ্রেণীর দিকে তাকালেন। শক্ত কিছু নতুন রেখা ফুটলো তাঁর মুখে।

'অসভ্যরা, সেভেরাস ! বদলা নেয়ার জন্যে ছুটে আসছে তারা !'

পাহাড়গুলো যেন পিঁপড়েতে ঢাকা পড়ে গেছে। কয়েক হাজার অসভ্য পুরুষ ও নারী ওপরে দাঁড়িয়ে তাদের দেশে অনুপ্রবেশকারী নিষ্ঠুর লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। সবাই তারা তীর-ধনুক সজ্জিত, হাতে চামড়ার ঢাল আর বর্শা—বর্শাগুলোর ডগা তীক্ষ্ণ করা হয়েছে কালো কাঁচের মতো আগ্নেয় শিলার টুকরো দিয়ে। কারো কারো হাতে কাঠের হাতলসহ পাথরের কুঠার। পুরুষদের পরনে শুধু কৌপীন। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে সবাই, যেন কার ইঙ্গিতের অপেক্ষায়, ভাবলেশহীন, ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তের মতো, ভীতিকর, থমথমে।

'আরেক দল অসভ্য জড়ো হয়েছে জাহাজ আর আমাদের মাঝ-খানে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো নোরিকাস।

ঘাড় ফেরালেন ভেনাটর, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। 'তোমার বোকামির এই হলো ফল, সেভেরাস।' রাগে কেঁপে গেল তাঁর গলা। 'তুমি আমাদের সবাইকে খুন করলে।' মাটিতে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা শুরু

করলেন তিনি।

'আপনার ঈশ্বরভক্তি অসভ্যদের ঘুম পাড়াতে পারবে না, গুরুদেব,' ব্যঙ্গের সুরে বললো সেভেরাস। 'খেলা দেখাবে শুধুমাত্র তলোয়ার।' নোরিকাসের দিকে ফিরে তার একটা বাহু আঁকড়ে ধরলো সে, 'দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিলো, 'বাদককে বলো বাজনা বাজিয়ে সৈনিকদের জড়ো করুক। ক্রীতদাসদের হাতে অস্ত্র তুলে দিক লাটিনিয়াস মাসার। শক্ত চৌকো আকৃতি নেয়ার হুকুম দাও সৈনিকদের। নদীর দিকে আমরা ঝাঁক বেঁধে এগোবো।'

ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে স্যালুট করলো নোরিকাস, ক্যাম্পের কেন্দ্র লক্ষ্য করে ছুটলো।

ষাট জন সৈনিক দ্রুত ফাঁপা একটা চৌকো আকৃতি নিলো। সিরিয়ান তীরন্দাজরা থাকলো আকৃতিটার দু'পাশে, সশস্ত্র ক্রীতদাসদের মাঝখানে, বাইরের দিকে মুখ করে। রোমান সৈনিকরা থাকলো আকৃতির সামনে আর পিছনে। সৈনিকদের তৈরি পাঁচিলের আড়ালে, চতুর্ভুজের ভেতর, মিশরীয় আর গ্রীক সহকারী ও মেডিকেল টিমসহ থাকলেন ভেনাটর। পদাতিকদের জন্যে প্রধান অস্ত্র হলো গ্লাডিয়াস—দু'মুখো তীক্ষ্ণ ডগা তলোয়ার, বিরাশি সেন্টিমিটার লম্বা। আর আছে ছুঁড়ে মারার জন্যে দু'মিটার লম্বা বল্লম। শারীরিক নিরাপত্তার জন্যে সৈনিকরা লোহার হেলমেট পরেছে, হেলমেটের কিনারা গালের দু'পাশে ঝুলে আছে, দুটো প্রান্তকে বাঁধা হয়েছে চিবুকের কাছে। খাঁচা আকৃতির লোহার বেড় দিয়ে বুক, কাঁধ আর পিঠেরও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা হাড়টাকে রক্ষার জন্যে আছে লোহার গার্ড। তাদের ঢালগুলো কাঠের তৈরি।

পাহাড় থেকে হুড়মুড় করে নেমে না এসে আস্তে ধীরে কলামটাকে

চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো অসভ্যরা। হামলা করার সময়ও তারা ব্যস্ত হলো না। প্রথমে তারা অল্প ক'জন লোক পাঠিয়ে নিবিড় ঝাঁক-টা ভাঙার জন্যে একটা খোঁচা দিলো। অনেকটা কাছাকাছি এসে দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচামেচি করলো তারা, অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে হুমকি দিলো। কিন্তু সংখ্যায় নগণ্য হলেও শত্রুপক্ষ ভয় পেলো না বা ছুটে পালালো না।

অভিজ্ঞতা মানুষকে নির্ভয় করে, আর সেনটিউরিয়ান সেভেরাসের অভিজ্ঞতার কোনো অভাব নেই। লাইন থেকে কয়েক পা এগিয়ে অসভ্য যোদ্ধায় গিজগিজ করা সামনের প্রান্তরটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা কর-লো সে। উপহাসের ভঙ্গিতে শত্রুদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লো এক-বার। অসম যুদ্ধের মধ্যে আগেও বহুবার তাকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। মাত্র ষোলো বছর বয়েসে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় সে। সাধারণ সৈনিক থেকে ধীরে ধীরে উন্নতি করেছে, দানিয়ুবের তীরে গথ-দের সাথে আর রাইনের তীরে ফ্রাঙ্ক-দের সাথে যুদ্ধ করে বীর-ত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ অনেক পদক পেয়েছে। সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর ভাড়াটে সৈনিক হয়েছে সে, যে বেশি টাকা দেবে তার পক্ষ নিয়ে লড়াই করতে আপত্তি নেই।

নিজের সৈনিকদের প্রতি অটল বিশ্বাস রয়েছে সেভেরাসের। তাদের খাপমুক্ত তলোয়ার আর হেলমেট রোদ লেগে ঝলমল করছে। সবাই তারা শক্তিশালী যোদ্ধা, যুদ্ধ করে অভিজ্ঞ হয়েছে, পরাজয় কাকে বলে জানে না।

বেশিরভাগ গৃহপালিত পশু, তার ঘোড়াটাসহ, ঈজিপ্ট থেকে সমুদ্র অভিযানে বেরুবার পরপরই মারা গেছে। কাজেই চৌকো আকৃতির ঝাঁকের সামনে থাকলো সে—হাঁটছে, কয়েক পা এগিয়ে একবার করে

ঘুরছে, যাতে চারদিকে দাঁড়ানো শত্রুপক্ষের ওপর নজর রাখা যায়।

পাহাড় প্রাচীরে সমুদ্র আছড়ে পড়ার মতো বিকট গর্জন তুলে ধেয়ে এলো অসভ্যরা, ঝাঁপিয়ে পড়লো রোমানদের ওপর। জনসমুদ্রের প্রথম ঢেউটাকে লম্বা বর্শা আর তীর ছুঁড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হলো। দ্বিতীয় ঢেউ কোনো বাধা মানলো না, বর্শা আর তীরের বাধা পেরিয়ে আছাড় খেলো ঝাঁকের গায়ে। কাস্তে দিয়ে গম কাটার মতো সাফ করা হলো তাদের। অসভ্যদের লাল রক্তে তলোয়ারের চকচকে ফলা নিষ্প্রভ হয়ে গেল। গালিগালাজ আর হুমকি-ধামকি সমানে চালিয়ে গেল লাটিনিয়াস মাসার, ক্রীতদাসরা নিজেদের জায়গা ছেড়ে এক চুল নড়লো তো না-ই, শত্রু নিধনেও তারা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিলো।

চারদিক থেকে বৃত্তটা ছোটো করে আনলো অসভ্যরা। লোক তারা যা হারিয়েছে, তার দশগুণ নেমে এলো পাহাড় থেকে। বাঁধ ভাঙা পানির মতো আসছে তো আসছেই, বিরতিহীন। রোমানদের ঝাঁকটা মন্থরগতিতে সামনে এগোলো। অসভ্যদের তৃতীয় আক্রমণ শুরু হলো। সবুজ ঘাসমোড়া ঢালে আবার রক্তস্রোত বইলো। অসভ্যদের একটা দল পিছন থেকে হামলা চালালো। সদ্য নিহত বা আহত সহযোদ্ধাদের গায়ে আছাড় খেলো তারা, পড়ে থাকা অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলো খালি পা, নিজেদের কিভাবে রক্ষা করতে হয় জানে না। ঝাঁক থেকে বেরিয়ে এসে অপ্রস্তুত অসভ্যদের কচুকাটা করলো রোমানরা, কাজ সেরে আবার তারা ফিরে গিয়ে চৌকো আকৃতি নিলো।

এবার অন্য দিকে মোড় নিলো যুদ্ধ। বিদেশীদের বল্লম, বর্শা আর তীরের বিরুদ্ধে সুবিধে করতে পারবে না বুঝতে পেরে পিছিয়ে গেল

অসভ্যরা, জড়ো হলো নতুন করে। এরপর তারা ঝাঁক ঝাঁক ভোঁতা তীর আর বর্শা ছুঁড়তে শুরু করলো, মেয়েরা ছুঁড়লো পাথর।

ঢাল তুলে মাথা বাঁচালো রোমানরা, মন্থর কিন্তু অবিচল ভঙ্গিতে এগিয়ে চললো নদী আর নিরাপদ আশ্রয় জাহাজের দিকে। অসভ্যরা দূরে সরে যাওয়ায় তাদের ক্ষতি যা করার তা শুধু সিরিয়ান তীরন্দাজরাই করতে পারছে। ক্রীতদাসদের জন্যে ঢালের সংখ্যা যথেষ্ট নয়, অরক্ষিত অবস্থায় বর্শা আর তীরের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে যাচ্ছে তারা। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়েছে বেচারিরা, তার ওপর গুহার ভেতর পাথর খোঁড়ার কাজ করতে হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই পড়ে যাবার পর আর উঠতে পারলো না। ঝাঁক থেকে বেরিয়ে এসে সাহায্য করতে রোমানরা কেউ রাজি নয়। একটু পরই অসভ্যদের হাতে আহত ধরাশায়ীদের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

যুদ্ধ পরিস্থিতি ও শত্রুপক্ষের ভাবসাব লক্ষ্য করে নতুন একটা নির্দেশ দিলো সেভেরাস। স্থির হয়ে গেল সৈনিকের ঝাঁক, সবাই তারা যে যার অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিলো। অসভ্যরা ধরে নিলো, রোমানরা আত্মসমর্পণ করতে চাইছে। বিকট রণহুংকার ছেড়ে তীরবেগে ছুটে এলো তারা। একেবারে যখন কাছে চলে এসেছে অসভ্যদের বিশাল বাহিনী, শেষ মুহূর্তে আরেকটা নির্দেশ দিলো সেভেরাস—হ্যাঁচকা টানে সৈনিকরা খাপমুক্ত করলো তলোয়ার, পাল্টা হামলা শুরু করলো।

ছুটো বোল্ডারের ওপর দাঁড়িয়ে নিপুণ ভঙ্গিতে তলোয়ার চালালো সেনটিউরিয়ান, চারজন অসভ্য তার পায়ের সামনে ধরাশায়ী হলো। তলোয়ারের চওড়া দিকটার আঘাতে আরেকজন আছড়ে পড়লো, এক কোপে তার মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করলো সে। মাত্র অল্প কয়েক

সেকেণ্ডের মধ্যে পিছু হটতে বাধ্য হলো। অসভ্যরা, কয়েকশো নিহত সঙ্গীকে ফেলে নাগালের বাইরে চলে গেল আবার।

দম ফেলার ফুরসত পেয়ে হিসাবে মন দিলো সেভেরাস। ষাটজন সৈনিকের মধ্যে বারোজন হয় মারা গেছে নয়তো যেতে বসেছে। আরো চোদ্দ জন বিভিন্ন ধরনের আঘাত পেয়ে অচল হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্রীতদাসরা। অর্ধেকের বেশি হয় মারা গেছে নয়তো নিখোঁজ।

দ্রুত পায়ে ভেনাটরের দিকে এগোলো সে। জামা ছিঁড়ে বাহুর একটা ক্ষত বাঁধার চেষ্টা করছেন তিনি। কোমরে জড়ানো কাপড়ের ভাঁজে এখনো সাহিত্য ও শিল্পকর্মের তালিকাটা বহন করছেন গ্রীক পণ্ডিত। 'এখনো আমাদের সাথে আছেন তাহলে, গুরুদেব।'

মুখ তুলে তাকালেন ভেনাটর, তাঁর দু'চোখে উপচে পড়ছে দৃঢ় প্রত্যয়। 'আমার চোখের সামনে মারা যাবে তুমি, সেভেরাস।'

'হুমকি, ঈর্ষা, নাকি দিব্যজ্ঞান?'

'কিছু আসে যায়? দেশে ফিরে যাওয়া আমাদের কারো পক্ষেই আর সম্ভব হবে না।'

জবাব দিলো না সেভেরাস। হঠাৎ করে আবার শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ, সবাই মিলে অসভ্যরা এতো বেশি পাথর আর বর্শা ছুঁড়ছে যে গোটা আকাশ কালো হয়ে গেল, ঢাল তুলে ঠেকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সৈনিকরা। এক ছুটে চৌকো ঝাঁকের সামনে পৌঁছে গেল সে।

রোমানরা সাহসের সাথে যুদ্ধ করলো, কিন্তু সংখ্যায় তারা কমে গেল। প্রায় সব ক'জন সিরিয়ান ধরাশায়ী হয়েছে। বিরতিহীন পাথর আর বর্শা-বৃষ্টি আকৃতিটাকে ছোটো আর বেঢপ করে তুললো। যারা যুদ্ধ করছে তারা সবাই আহত ও ক্লান্ত, রোদ আর পিপাসায় কাতর।

তলোয়ার ধরা হাতগুলো ঝুলে পড়তে লাগলো, হাতবদল করলো বারবার।

ক্লান্ত অসভ্যরাও, তারাও বিপুলহারে ক্ষতিগ্রস্ত, তবু তারা নদীর পথে ঢাল ছেড়ে এক ইঞ্চিও নড়লো না। রোমান সৈনিকরা একজন যদি নিহত হয়, অসভ্যরা নিহত হয়েছে বারোজন। ভাড়াটে সৈনিক-দের প্রতিটি লাশ পিনকুশনের মতো হয়েছে দেখতে, তীর বিদ্ধ।

দৈত্যাকার ওভারশিয়ার মাসার হাঁটু আর উরুতে দুটো তীর খেয়েছে। এখনো পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও, ঝাঁকের সাথে এগোতে পারছে না সে। পিছিয়ে পড়লো, আর দেখতে না দেখতে বিশজনের একটা অসভ্য বাহিনী ঘিরে ধরলো তাকে। ঘুরলো সে, অলসভঙ্গিতে, তলোয়ার চালিয়ে নিখুঁতভাবে দ্বিখণ্ডিত করলো তিন-জনকে। তার শক্তি দেখে পিছিয়ে গেল বাকি সবাই, নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগলো। চিৎকার করে তাদেরকে সামনে এসে লড়ার আহ্বান জানালো মাসার।

ঠেকে শিখেছে অসভ্যরা, এখন আর তারা হাতের নাগালে আসছে না। দূর থেকে মাসারকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়লো তারা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মাসারের শরীরের পাঁচ জায়গা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুলো। বর্শাগুলো ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে ফেললো মাসার। সে যখন এই কাজে ব্যস্ত, একজন অসভ্য ছুটে কাছে চলে এলো, তারপর ছুঁড়ে দিলো হাতের বর্শা। সরাসরি মাসারের গলায় বিঁধলো সেটা। ধীরে ধীরে ধুলোর মধ্যে পড়ে গেল সে। অসভ্য নারী-বাহিনী উন্মাদিনীর মতো ছুটে এলো, পাথর ছুঁড়ে ছাতু বানিয়ে দিল তাকে।

নদীর কিনারায় পৌঁছুনোর পথে রোমানদের সামনে একমাত্র বাধা

বেলে পাথরের একটা ঢাল। আরো সামনে, হঠাৎ করে দেখা গেল নীল আকাশ রঙ বদলে কমলা হয়ে গেছে। তারপর ধোঁয়ার একটা বিশাল স্তম্ভ মোচড় খেতে খেতে মাথাচাড়া দিলো, কালো আর ভারি, বাতাস বয়ে নিয়ে এলো কাঠের পোড়া গন্ধ।

বিস্ময়ের ধাক্কা খেলেন ভেনাটর, তারপর হতাশায় মুষড়ে পড়লেন। 'জাহাজ!' আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। 'জাহাজে ওরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে!'

রক্তাক্ত সৈনিকরা আতংকিত হয়ে পড়লো, উন্মাদের মতো ছুটলো নদীর দিকে। দু'দিক থেকে হামলা চালালো এবার অসভ্যরা। বেশ ক'জন-ক্রীতদাস অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করলো, সাথে সাথে তাদেরকে মেরে ফেলা হলো। বাকিরা একটা গাছের আড়াল থেকে পাল্টা আঘাত হানার চেষ্টা করলো, কিন্তু পিছু ধাওয়া রত অসভ্যরা ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের ওপর, আপাতত প্রাণে বাঁচতে পারলো মাত্র একজন।

সেভেরাস আর তার আহত সৈনিকরা যুদ্ধ করতে করতে ঢালের মাথায় পৌঁছুলো, তারপরই হঠাৎ তারা দাঁড়িয়ে পড়লো, খেয়াল নেই চারদিকে রক্তস্রোত বয়ে যাচ্ছে। ঢাল থেকে নিচে, নদীর দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো তারা।

আগুনের স্তম্ভগুলো পাক খেতে খেতে উঠে গিয়ে মিশছে কালো ধোঁয়ার সাথে। জাহাজের বহর, তাদের পালানোর একমাত্র বাহন, নদীর কিনারা ধরে সার সার পুড়ছে। মিশর থেকে নিয়ে আসা বিশাল আকৃতির জাহাজগুলো অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে।

সৈনিকদের ঠেলে সামনে চলে এলেন ভেনাটর, দাঁড়ালেন সেভে-রাসের পাশে। চুপ হয়ে গেছে সেনটিউরিয়ান, তার জামা আর লোহার

বর্ম রক্ত ও ঘামে পিচ্ছিল। সর্বনাশা আগুনের আভায় জ্বলজ্বল করছে তার চোখ দুটো।

নদীর তীরে নোঙর ফেলা জাহাজগুলো অরক্ষিত অবস্থায় ছিলো। অসভ্যদের বিশাল এক বাহিনী নাবিকদের এক জায়গায় জড়ো করে পায়ের তলায় পিষে মেরেছে, তারপর আগুন দিয়েছে জাহাজে। তাদের হামলা থেকে বেঁচে গেছে একটা মাত্র ছোট্ট বাণিজ্য জাহাজ। নাবিকরা যেভাবেই হোক অসভ্যদের আক্রমণ এড়িয়ে গেছে। চারজন নাবিক পাল তোলার কাজে ব্যস্ত, বাকি ক'জন দ্রুত বৈঠা চালিয়ে গভীর পানিতে সরে যাবার চেষ্টা করছে।

নিস্ফল রাগে হাত দুটো শক্ত মুঠো করে দাঁড়িয়ে থাকলেন ভেনাটর। সহস্র বছরের জ্ঞান আর শিল্পকর্মের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হতে যাচ্ছে বলে তাঁর সেই আগের দৃঢ় বিশ্বাস কর্পূরের মতো উবে গেছে মন থেকে।

কাঁধে হাতের স্পর্শ পেয়ে মুখ ফেরালেন ভেনাটর, দেখলেন তাঁর দিকে ফিরে সকৌতুকে হাসছে সেভেরাস।

'চিরকালের আশা ছিলো মারা যাবো,' বললো সেনটিউরিয়ান, 'কোলের ওপর সুন্দরী মেয়ে আর হাতে মদের পাত্র নিয়ে।'

'কে কিভাবে মরবে তা শুধু ঈশ্বরই বলতে পারেন,' অস্পষ্টস্বরে বললেন ভেনাটর।

'আমি বরং বলবো ভাগ্যের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে।'

'এতো পরিশ্রম, এতো সময় ব্যয়, সব বৃথা গেল।'

'অন্তত আপনার জিনিসগুলো নিরাপদে লুকানো থাকলো,' বললো সেভেরাস। 'কেউই পালাতে পারেনি তা তো নয়। নাবিকরা সাম্রাজ্যের সেরা পণ্ডিতদের জানিয়ে দেবে এখানে কি করেছি আমরা।'

'না,' বললেন ভেনাটর। 'কেউ তাদের রূপকথা বিশ্বাস করবে না।' ঘাড় ফিরিয়ে পাহাড়শ্রেণীর দিকে তাকালেন তিনি, 'ওগুলো চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল।'

'আপনি সাঁতার জানেন?'

সেভেরাসের দিকে ফিরে এলো ভেনাটরের দৃষ্টি। 'সাঁতার?'

'আমার সেরা পাঁচজন লোককে আপনার সাথে দিচ্ছি। অসভ্যদের মাঝখান দিয়ে পথ করে দেবে ওরা। সাঁতার জানলে জাহাজটায় আপনি পৌঁছুবার চেষ্টা করতে পারেন।'

'আমি··· আমি ঠিক জানি না।' পানির দিকে তাকালেন ভেনাটর, নদীর কিনারা আর জাহাজের মাঝখানে দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

'পোড়া একটা কাঠ ভেলা হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন,' ঝাঁঝের সাথে বললো সেভেরাস। 'যা করার তাড়াতাড়ি করুন। সবাই আমরা আমাদের ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যাবো আর কিছুক্ষণের মধ্যে।'

'তোমাদের কি হবে?'

'লড়ার বা দাঁড়াবার জন্যে ঢালের এই মাথাটা মন্দ কি?'

সেনটিউরিয়ানকে আলিঙ্গন করলেন ভেনাটর। 'ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন।'

'তারচেয়ে বরং আপনার সাথে হাঁটুন তিনি।' ঝট্ করে সৈনিকদের দিকে ঘুরলো সেভেরাস, প্রায় অক্ষত পাঁচজন শক্তিশালী লোককে বাছাই করলো, নির্দেশ দিয়ে বললো, নদীর কিনারা পর্যন্ত ভেনাটরের পথ নির্বিঘ্ন করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করতে হবে তাদেরকে, প্রয়োজনে প্রাণ দিতে হবে। তারপর বাকি সৈনিকদের নিয়ে নতুন করে ছোট্ট একটা ঝাঁক তৈরি করলো। অসম যুদ্ধের শেষাংশে অভিনয় করার জন্যে।

পাঁচজন সৈনিক ভেনাটরকে মাঝখানে নিয়ে ছোট্ট একটা বৃত্ত তৈরি করলো। সময় নষ্ট না করে নদীর কিনারা লক্ষ্য করে ছুটলো তারা। রণহুংকার ছাড়লো, হতচকিত অসভ্যদের মধ্যে সামনে যাকে পেলো তাকেই ঘায়েল করলো তলোয়ারের আঘাতে। খেপে ওঠা ষাঁড়ের মতো তীরবেগে ছুটলো তারা।

এতোই ক্লান্ত যে সব রকম অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছেন ভেনাটর, তবে তাঁর হাতে তলোয়ারটা মুহূর্তের জন্যেও স্থির হলো না বা এক-বারও হোঁচট খেলেন না তিনি। একজন পণ্ডিত, রূপান্তরিত হয়েছেন যোদ্ধায়। তাঁর ভেতর শুধু আশ্চর্য একটা জেদ কাজ করছে, মৃত্যুভয় ভুলে গেছেন।

অস্থির অগ্নি শিখার ভেতর দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে এগোলো তারা। মাংস পোড়ার গন্ধে বমি পেলো ভেনাটরের। জামাটা আরেকবার ছিঁড়ে নাকে কাপড় চেপে ধরলেন তিনি। ধোঁয়ায় কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, ঝর ঝর করে পানি ঝরছে চোখ থেকে।

এক এক করে ধরাশায়ী হলো সৈনিকরা, কিন্তু যতোক্ষণ নিঃশ্বাস থাকলো ততোক্ষণ তারা রক্ষা করলো ভেনাটরকে। হঠাৎ করে পায়ে পানির ছোঁয়া পেলেন ভেনাটর। চোখে কিছুই দেখছেন না, লাফ দিলেন সামনে। ঝপাৎ করে পানিতে পড়লেন তিনি, সাথে সাথে সাঁতার কেটে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করলেন। কাঠের একটা তক্তার স্পর্শ পাওয়া মাত্র আঁকড়ে ধরলেন সেটাকে। ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন খোলা নদীতে। তক্তার ওপর উঠলেন তিনি, পিছনে তাকাবার সাহস হলো না।

ঢালের মাথায় দাঁড়িয়ে সৈনিকরা এখনো পাথর আর বর্শা ঠেকাবার

ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে। চারবার একত্রিত হয়ে রোমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করলো অসভ্যরা, প্রতিবার সৈনিকদের প্রতিরক্ষা ভেদ করতে ব্যর্থ হয়ে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো। নিজেদের অবস্থানে অটল থাকলেও, রোমানদের সংখ্যা কমছে। চৌকো আকৃতিটা ভেঙে পড়লো, অসহায় কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ঢালের খোলা মাথায়, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে যুঝছে। তাদের চারপাশে আহতরা কাতরাচ্ছে, এখানে সেখানে স্তূপ হয়ে আছে লাশ। ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে রক্তের স্রোত। তবু লড়ে চলেছে রোমানরা।

এরপর আরো দু'ঘণ্টা ধরে চললো যুদ্ধ। এখনো আগের মতোই শক্তি নিয়ে হামলা করছে অসভ্যরা। বিজয়ের গন্ধ পেয়েছে, শেষ একটা হামলা চালাবার জন্যে আবার তারা জড়ো হলো।

মাংস থেকে ফলাটা বের করতে না পেরে তীরের বেরিয়ে থাকা অংশটা ভেঙে ফেললো সেভেরাস, অক্লান্তভাবে লড়ে যাচ্ছে সে। পাশে মাত্র অল্প ক'জন সৈনিক। তারাও এবার একে একে পড়ে যাচ্ছে। পাথর, বর্শা আর বল্লম ঢেকে ফেলছে তাদেরকে।

সবার শেষে পতন হলো সেভেরাসের। শরীরের নিচে ভাঁজ হয়ে গেল পা দুটো, তলোয়ার ধরা হাতটা নড়াতে পারলো না। মাটিতে হাঁটু গেড়ে রয়েছে সে, কাত হয়ে যাচ্ছে শরীর, তারপরও দাঁড়াবার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু পারলো না। মুখ তুললো আকাশে, বিড়বিড় করে বললো, 'মা, বাবা, তোমাদের হাতে তুলে নাও আমাকে।'

যেন তার আবেদনে সাড়া দিয়েই, ছুটে এসে তার সারা শরীরে বর্শা গাঁথলো অসভ্যরা। সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে উঠে গেল সেভেরাস।

ওদিকে তক্তার ওপর শুয়ে দ্রুত হাত চালাচ্ছেন ভেনাটর পানিতে,

মরিয়া হয়ে জাহাজটার কাছে পৌছুতে চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু ধীরে ধীরে হতাশা গ্রাস করলো তাঁকে। স্রোত আর বাতাস বাণিজ্য জাহাজটাকে আরো দুরে সরিয়ে নিলো।

নাবিকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করলেন ভেনাটর, একটা হাত তুলে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেন। নাবিকদের একটা দল আর ছোট্ট একটা মেয়ে, পাশে কুকুর নিয়ে, জাহাজের পিছনদিকের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, সবাই তারা তাকিয়ে রয়েছে তাঁর দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে, জাহাজ ঘুরিয়ে তাঁকে উদ্ধারের কোনো চেষ্টাই তারা করছে না। ভাটির দিকে এগিয়ে চললো জাহাজ, যেন ভেনাটরের কোনো অস্তিত্বই নেই।

ওরা তাঁকে ফেলে যাচ্ছে, ভেনাটর উপলব্ধি করলেন। কেউ তাঁকে উদ্ধার করবে না। তক্তার ওপর ঘুসি মারলেন তিনি, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ফুঁপিয়ে উঠলেন, স্থির বিশ্বাসে পৌচেছেন ঈশ্বর তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। অবশেষে তিনি ঘাড় ফিরিয়ে তীরের দিকে তাকালেন।

যুদ্ধ শেষ। কেউ নেই সেখানে।

দুই

হিথরো এয়ারপোর্ট, লণ্ডন।

ভি-আই-পি লাউঞ্জের ভেতর থেকে বাইরে উপচে পড়েছে ফটো-গ্রাফার আর সাংবাদিকদের ভিড়টা। ভিড়ের কিনারা দিয়ে এগোলেও, কেউ লক্ষ্য করলো না পাইলটকে। চোদ্দ নম্বর গেটের ওয়েটিং রুমে আরোহীরা অপেক্ষা করছে, তারাও কেউ খেয়াল করলো না যে ব্রিফকেসের বদলে একটা ডাফ্‌ল্ ব্যাগ রয়েছে লোকটার হাতে। মাথা সামান্য নিচু করে, চোখের দৃষ্টি নাক বরাবর সামনে, হন হন করে হেঁটে এলো সে। বিশ-পঁচিশটা টিভি-ক্যামেরা সচল হয়ে রয়েছে, সতর্কতার সাথে সব ক'টাকে এড়িয়ে গেল। অবশ্য ক্যামেরাগুলোর লক্ষ্য লম্বা এক সুন্দরী। পালিশ করা চকচকে সোনার মতো রঙ তাঁর গায়ের। আয়নার মতো মসৃণ। কয়লা-কালো চোখ ছুটো একাধারে আদেশ ও আবেদন, ছুটো ভাব প্রকাশেই সক্ষম। ফটোগ্রাফার, সাংবাদিক আর সিকিউরিটি গার্ডদের ভিড়টা তাঁকে ঘিরেই।

ঘেরা বোর্ডিং র‍্যাম্প বেয়ে উঠে এলো পাইলট, সাদা পোশাক পরা ছু'জন এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি এজেন্ট তার পথরোধ করে দাঁড়ালো।

ছ্যাঁৎ করে উঠলো লোকটার বুক, মাত্র কয়েক ফুট দূরে প্লেনের দরজা, কিন্তু মাঝখানে গার্ড দু'জনকে মনে হলো নিরেট পাঁচিল। সহজ-ভঙ্গিতে একটা হাত নেড়ে, কাঁধের মৃদু ধাক্কায় তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে সামনে এগোবার চেষ্টা করলো সে, ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি লেগে রয়েছে। কিন্তু কাজ হলো না, একটা হাত শক্ত করে তার বাহু আঁকড়ে ধরলো। 'এক মিনিট, ক্যাপটেন।'

থামলো পাইলট, মুখে হাসি আর চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো সে, যেন তাকে বিব্রত করায় কৌতুক বোধ করছে সে। তার চোখের রঙ জলপাই আর খয়ের মেশানো, দৃষ্টি যেন অন্তর ভেদ করে যায়। নাকটা কয়েকবারই ভেঙেছে। ডান চোয়ালে সরু একটা কাটা দাগ। ক্যাপের নিচে কাঁচাপাকা ছোটো করে ছাঁটা চুল আর মুখের ভাঁজ দেখে বোঝা যায় পঞ্চাশের ওপরই হবে বয়স। লম্বায় সে ছ'ফুট দু'ইঞ্চি, মোটা-সোটা, তবে ভুঁড়িটা বয়সের তুলনায় এখনো ছোটোই। ইউনিফর্মের ভেতর কাঠামোটা ঋজু। দেখে মনে হবে, আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার জেট চালায় এমন দশ হাজার এয়ারলাইন পাইলটদেরই একজন সে।

ব্রেস্ট পকেট থেকে পরিচয়-পত্র বের করে একজন এজেন্টকে দিলো লোকটা। 'এই ট্রিপে বোধহয় ভি. আই. পি. কেউ যাচ্ছেন ?'

কড়া ভাঁজের স্যুট পরা ব্রিটিশ গার্ড মাথা ঝাঁকালো। 'জাতিসংঘের একটা দল নিউ ইয়র্কে ফিরে যাচ্ছেন। ওঁদের সাথে নতুন সেক্রেটারী জেনারেলও আছেন।'

'উম্মে সালিহা ?'

'হ্যাঁ।'

'এ কি কোনো মেয়েলোকের কাজ !'

'মার্গারেট থ্যাচারের বেলায় সেক্স কোনো বাধা হয়ে দেখা দেয়নি।'

'তা অবশ্য। কথাটায় যুক্তি আছে।'

'সালিহার মতো বিচক্ষণ, এমন পুরুষই বা আপনি ক'জন পাবেন? দেখবেন, চমৎকার চালিয়ে নেবেন উনি।'

মৃদু শব্দে হাসলো পাইলট। 'তবে কথা কি জানেন, তাঁর নিজের দেশের মুসলিম ফ্যানাটিকরা তাঁকে বাঁচতে দিলে হয়।' কথার সুরেই বোঝা গেল, পাইলট আমেরিকান।

আই. ডি. কার্ডের ফটো থেকে চোখ তুলে অদ্ভুতদৃষ্টিতে তাকালো ব্রিটিশ সিকিউরিটি এজেন্ট, তবে কোনো মন্তব্য করলো না। ফটোর দিকে আবার চোখ রেখে নামটা শব্দ করে পড়লো, 'বব রিচার্ডসন।'

'কোনো সমস্যা?'

'না, যাতে না হয় সে চেষ্টা করছি,' ভারি গলায় বললো গার্ড।

হাত দুটো শরীর থেকে দূরে সরালো বব রিচার্ডসন। 'আমাকে কি সার্চও করা হবে?'

'দরকার নেই। একজন পাইলট কেন তার নিজের প্লেন হাইজ্যাক করতে যাবে? তবে আপনার কাগজ-পত্র চেক না করে উপায় নেই, আপনি সত্যি ক্রুদের একজন কিনা জানতে হবে।'

'ইউনিফর্মটা আমি ফ্যাশন শো-তে দেখাবো বলে পরিনি।'

'আমরা আপনার ব্যাগটা দেখতে পারি?'

'কেন নয়,' বলে ব্যাগটা মেঝেতে রেখে খুললো পাইলট।

ফ্লাইট অপারেশনস্ ম্যানুয়ালগুলো তুলে নিয়ে পাতা ওল্টালো দ্বিতীয় এজেন্ট, তারপর একটা মেকানিকাল ডিভাইস বের করে নেড়েচেড়ে দেখলো, সাথে ছোটো আকৃতির হাইড্রলিক সিলিণ্ডার রয়েছে। 'কিছু যদি মনে না করেন, এটা কি বলবেন?'

'অয়েল-কুলিং ডোর-এর জন্যে ওটা একটা অ্যাকটিউয়েটর আর্ম।

খোলা অবস্থায় আটকে গেছে। কেনেডিতে আমাদের মেইন্টেন্যান্সের লোকেরা অনুরোধ করেছে আমি যেন হাতে করে নিয়ে যাই, কেন নষ্ট হলো ভাল করে বুঝে দেখা দরকার।'

শক্ত প্যাকেট করা মোটাসোটা একটা জিনিসের গায়ে খোঁচা মারলো দ্বিতীয় এজেন্ট। 'আরে, এখানে এটা আমরা কি দেখছি?' মুখ তুললো সে, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। 'এয়ারলাইন পাইলটরা কবে থেকে প্যারাস্যুট নিয়ে প্লেনে উঠছে?'

হাসলো বব রিচার্ডসন। 'স্কাইডাইভিং আমার হবি। ছুটি পেলেই জাম্প করার জন্যে বন্ধুদের সাথে ক্রয়ডনে চলে যাই।'

'আপনি নিশ্চয়ই একটা জেটলাইনার থেকে লাফ দেয়ার কথা ভাবেন না?'

'পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপরে উড়ছে, নিচে আটলান্টিক, গতিবেগ পাঁচশো নট—না!' আঁতকে ওঠার ভান করলো পাইলট।

সন্তুষ্ট হয়ে পরস্পরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলো এজেন্টরা। ডাফ্‌ল্‌ ব্যাগ বন্ধ করা হলো, ফিরিয়ে দেয়া হলো আই. ডি. কার্ড। 'আপনাকে দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে দুঃখিত, ক্যাপটেন রিচার্ডসন।'

'আলাপটা আমি উপভোগ করেছি।'

'হ্যাভ আ গুড ফ্লাইট টু নিউ ইয়র্ক।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

প্লেনে চড়লো বব রিচার্ডসন, সরাসরি ককপিটে চলে এলো। দরজা বন্ধ করে কেবিনের আলো নিভিয়ে দিলো সে, এয়ারপোর্ট ভবনের জানালা থেকে কেউ যাতে তাকে দেখতে না পায়। ভালো করে রিহার্সেল দেয়া আছে, তার প্রতিটি নড়াচড়া জড়তাহীন। সিটগুলোর পিছনে হাঁটু গেড়ে বসলো সে, পকেট থেকে ছোটো একটা টর্চ বের

করে খুলে ফেললো ট্র্যাপডোরের ঢাকনি। ককপিটের নিচে ইলেক-ট্রনিকস বে-তে পৌঁছুনোর পথ এটা, কবে কে জানে কোনো এক ভাঁড় ওটার নাম দিয়েছে হেল হোল। গাঢ় অন্ধকারের ভেতর মইটা নামিয়ে দিলো সে। এই সময় ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্টদের চাপা গুঞ্জন ভেসে এলো, তার সাথে লাগেজ টানা-হ্যাঁচড়ার শব্দ। মেইন কেবিন-টাকে আরোহীদের জন্যে তৈরি করা হচ্ছে। ট্র্যাপ-ডোর দিয়ে খানিক-টা নিচে নামলো সে, ডাফ্‌ল্ ব্যাগটা টেনে নিলো। নিচে নেমে এসে পেনলাইটটা জ্বাললো সে। হাতঘড়ি দেখে বুঝলো, ফ্লাইট ক্রুদের পৌঁছু-নোর আগে তার হাতে সময় আছে পাঁচ মিনিট। প্রায় পঞ্চাশবার অনুশীলন করেছে, প্রতিটি কাজ দ্রুত নিখুঁতভাবে সারতে অসুবিধে হলো না। ফ্লাইট ক্যাপের ভেতরে লুকিয়ে নিয়ে আসা মিনিয়েচার টাইমিং ডিভাইসটার সাথে অ্যাকটিউয়েটর-টা সংযুক্ত করলো। জোড়া লাগানো ইউনিটটা ছোটো একটা দরজার কব্জায় আটকে দিলো। এই দরজা শুধু মেকানিকরা ব্যবহার করে। এরপর প্যাকেট থেকে প্যারাস্যুটটা বের করলো সে।

ফার্স্ট ও সেকেণ্ড অফিসার এসে দেখলো, তাদের ক্যাপটেন বব রিচার্ডসন পাইলটের সিটে বসে আছে, মুখটা এয়ারপোর্ট ইনফরমেশন ম্যানুয়্যাল-এর আড়ালে। স্বাভাবিক কুশলাদি বিনিময়ের পরপরই তারা রুটিন চেক-এ ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কো-পাইলট বা এঞ্জিনিয়ার, ছ'জনের কেউই খেয়াল করলো না যে অন্যান্যবারের চেয়ে তাদের ক্যাপটেন আজ বেশ চুপচাপ ও নির্লিপ্ত। তারা যদি জানতো এটাই তাদের জীবনের শেষ ফ্লাইট, তাহলে কি হতো বলা যায় না। অন্তত তাদের দৃষ্টি আর অনুভূতিগুলো যে আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

*

ভি. আই. পি. লাউঞ্জে চোখ-ধাঁধানো ক্যামেরা ফ্ল্যাশ আর ঝাঁক ঝাঁক মাইক্রোফোনের দিকে মুখ করে রয়েছেন উম্মে সালিহা। মনের অবস্থা যাই হোক, দৃঢ় ও ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, ধৈর্যের প্রতিমূর্তি, অনুসন্ধানী রিপোর্টারদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

গোটা ইউরোপ জুড়ে ঝটিকা সফর শেষে নিউ ইয়র্কে ফিরছেন উম্মে সালিহা, সরকারপ্রধানদের সাথে বিরতিহীন কথা বলেছেন, কিন্তু সে-ব্যাপারে খুব কম প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হলো তাঁকে। মৌলবাদী ধর্মীয় নেতারা তাঁর দেশের সরকারকে উৎখাত করার জন্যে যে আন্দোলন শুরু করেছে সে-সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চায় সবাই।

মিশরে এই মুহূর্তে ঠিক কি ঘটছে ভালো ধারণা নেই উম্মে সালিহার। মৌলবাদীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে মোস্তফা কামাল, ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা ও আইন সম্পর্কে সে একজন পণ্ডিত। গোটা মিশরে ভয়াবহ ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে লোকটা। অধিকার বঞ্চিত লাখ লাখ গ্রামবাসী যারা নীল নদের তীরে বসবাস করে, আর কায়রো শহরের বস্তিবাসী যারা মানবেতর জীবনযাপন করে, তাদের মনে কুসংস্কার আর হিংসার আগুন ভালোভাবেই জ্বালতে পেরেছে সে। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে গ্রামের বা বস্তির কোনো মেয়ে ঘরের বাইরে পা ফেলতে পারছে না। চাকরিজীবী মহিলাদের রাস্তা-ঘাটে শুধু যে অপদস্থ করা হচ্ছে তাই নয়, তাদের লক্ষ্য করে বোমাও ছোঁড়া হচ্ছে। মৌলবাদীরা সরকারকে হুমকি দিয়ে বলেছে, এক মাসের মধ্যে বিদেশে চাকরিরত প্রতিটি মিশরীয় নারীকে দেশে ফিরিয়ে না আনলে তার পরিণাম ভালো হবে না। কায়রোয় জোর গুজব, যে-সব মেয়ে দেশে ফিরতে রাজি নয় তাদেরকে হত্যা করার জন্যে গুপ্তঘাতক পাঠানোর সিদ্ধান্ত

নিয়েছে মোস্তফা কামাল। আমি আর এয়ারফোর্সের বড় বড় অফিসাররা কোনো রকম রাখ-ঢাক না করেই মৌলবাদীদের সাথে সলা-পরামর্শ করছে কিভাবে সদ্য নির্বাচিত নতুন সরকারপ্রধান হোসেন ইসমাইলকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়। পরিস্থিতি যে ভয়াবহ তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সরকারের কাছ থেকে প্রতি মুহূর্তের বিবরণ উম্মে সালিহা পাচ্ছেন না। কাজেই স্পষ্ট করে কিছু না বলে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ইতিমধ্যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বেশ কয়েকবার বিবৃতি দিয়েছে মৌলবাদীরা, দেশে ফিরে বোরখা পরার আদেশ জারি করেছে। উম্মে সালিহা সাড়া না দেয়ায় তাঁর প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়। মৌলবাদীরা ঘোষণা করেছে, তাদের পয়লা নম্বর শত্রুদের মধ্যে একজন হলো উম্মে সালিহা। যাদের হত্যা করা হবে বলে জোর গুজব, তালিকায় তার নামটা সবার ওপরে।

দাঁড়াবার বা কথা বলার ভঙ্গিতে যতোই দৃঢ়তা থাকুক, মনে মনে ভীষণ অসহায় ও নিঃসঙ্গ বোধ করছেন তিনি। নিজের কথা ভাবেন না, মৃত্যুভয়ও তাঁর নেই। মিশরের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর চিন্তা। মৌলবাদীরা যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছে, দেশটাকে না তারা পাঁচশো বছর পিছিয়ে দেয়। ফ্যানাটিকদের হাত থেকে গণতন্ত্র, মুক্তবুদ্ধি, মানবাধিকার ইত্যাদি রক্ষা করার জন্যে তাঁরও একটা দায়িত্ব আছে, কিন্তু জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে শপথ নেয়ার পর দেশের জন্যে কিছু করার সময় বা সুযোগ কোনোটাই তিনি পাচ্ছেন না।

এতোই সুন্দরী তিনি, যেন রানী নেফারতিতি-র পুনর্জন্ম হয়েছে। বার্লিন মিউজিয়ামে রানীর যে পোরট্রেইট আছে, একই ভঙ্গিতে পোজ দিলে উম্মে সালিহা নিঃসন্দেহে উতরে যাবেন। দু'জনেরই মরালগ্রীবা, সরু নাক—আয়ত চোখ, তীক্ষ্ণ মুখাবয়ব—একবার দেখলে ভোলা যায়

না। বয়স ছত্রিশ বলা হলেও তাঁকে দেখে তা মনে হয় না। একহারা গড়ন। কালো চোখ। রেশমের মতো কালো চুল কোমর ছাড়িয়েছে। নারীজাতির সমস্ত সৌন্দর্য যেন তার ওপর ঢেলে দেয়া হয়েছে। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা তিনি। এই মুহূর্তে ভাঁজবহুল স্কার্ট আর কোট পরে আছেন, কোটটার ডিজাইন শুধু তাঁর জন্যে করা হয়েছে প্যারিসের বিখ্যাত একটা ডিজাইন সেন্টারে।

বিখ্যাত চারজন ব্যক্তিত্বকে প্রেমিক হিসেবে পেলেও উম্মে সালিহা এখনো বিয়ে করেননি। স্বামী-সন্তান তাঁর কাছে যেন অলস সময় কাটানোর একটা মাধ্যম। দীর্ঘমেয়াদী কোনো কিছুর সাথে জড়িয়ে পড়াটাকে তিনি ভালো চোখে দেখেন না। নিজের দায়িত্ব আর কাজের ক্ষতি করে ঘর-সংসার পাতার কথা ভাবতেও পারেন না তিনি।

শুধু ছাত্রীজীবনে নয়, কর্মজীবনেও এমন দুর্লভ কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন উম্মে সালিহা যে সারা দুনিয়ায় তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। স্কুল-কলেজ আর ইউনিভার্সিটিতে জীবনে কখনো দ্বিতীয় হননি। কায়রো শহরেই মানুষ হয়েছেন, মা স্কুল শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, বাবা ছিলেন ছায়াছবি নির্মাতা। বাড়ি থেকে সাইকেলে আসা যাওয়া করা যায় এমন দূরত্বে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের স্কেচ আর খনন কাজে কেটেছে তার কৈশোরের অবসর সময়। অত্যন্ত পাকা রাঁধুনি, ছবি আঁকতে পারেন, ভালো গান জানেন, আর রয়েছে মিশরীয় প্রত্নতত্ত্বের ওপর একটা পি. এইচ. ডি.। প্রথম চাকরি করেন মিশরের মিনিস্ট্রি অভ কালচারে, রিসার্চার হিসেবে। পরে ডিপার্টমেন্টাল হেড হন। তারপর সচিব, অবশেষে মন্ত্রী। সাধারণ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ান তিনি, বিপুল ভোটে জয়লাভ করে সংসদ সদস্য নির্বাচিন হন। সরকারেও যোগ দেন, কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মন্ত্রীসভা থেকে

পদত্যাগ করেন। কাজের প্রতি নিষ্ঠা, বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা আর সততার জন্যে দেশে-বিদেশে বহুল আলোচিত ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। পরবর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর পুরনোদের মধ্যে থেকে একমাত্র তাঁকেই মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়, সবিনয়ে সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন উম্মে সালিহা। পরের নির্বাচনে আবার তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন, সরকারপ্রধানের অনুরোধে মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেন। কিছুদিন পর প্রেসিডেন্টের অনুরোধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মিশরীয় প্রতিনিধিদলের স্থায়ী নেতা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পাঁচ বছর পর জাতিসংঘের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয় তাঁকে। এক বছর পর তদানীন্তন মহাসচিব দ্বিতীয় দফার জন্যে নির্বাচিত হতে না চাওয়ায় জাতিসংঘের মহাসচিবের পদটার জন্যে বাছাই করা হয় উম্মে সালিহাকে। তাঁর সামনে লাইনে আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কেউ দায়িত্ব গ্রহণে রাজি না হওয়াতেই এই সুযোগটা পেয়ে যান তিনি। মাত্র অল্প কিছুদিন হয়েছে দায়িত্ব নিয়েছেন, কিন্তু এরইমধ্যে কর্মনৈপুণ্য দেখিয়ে মুগ্ধ করেছেন সবাইকে।

কিন্তু সব কিছু এলোমেলো করে দিতে চাইছে তাঁর দেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতি। যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে যে তিনিই হবেন জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব যার কোনো দেশ নেই।

একজন এইড এগিয়ে এসে তাঁর কানে কানে কিছু বললো। মাথা ঝাঁকিয়ে সমবেত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে একটা হাত তুললেন তিনি। 'আমাকে বলা হলো, প্লেন টেক-অফ করার জন্যে তৈরি,' স্বভাবসুলভ হাসিমুখে বললেন তিনি। 'আমি আর একজনের প্রশ্নের উত্তর দেবো।'

সাথে সাথে কয়েক ডজন হাত উঁচু হলো, চারদিক থেকে ছুটে

এলো অসংখ্য প্রশ্ন। দোরগোড়ার কাছে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোকের দিকে হাত তুললেন উম্মে সালিহা, ভদ্রলোকের হাতে একটা টেপ রেকর্ডার রয়েছে।

'জেফরি অ্যাডামস, ম্যাডাম সালিহা। মোস্তফা কামাল যদি হোসেন ইসমাইলের গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে ইসলামিক রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করেন, আপনি কি দেশে ফিরে যাবেন?'

'আমি একজন মিশরীয় এবং মুসলিম। আমার দেশের সরকার, তা সে যে সরকারই ক্ষমতায় থাক, যদি চায় আমি দেশে ফিরি তাহলে অবশ্যই ফিরবো।'

'এমনকি মোস্তফা কামাল আপনাকে পাপিষ্ঠা ও বেপর্দা মেয়েলোক বলে ঘোষণা করার পরও?'

'হ্যাঁ,' শান্তভাবে জবাব দিলেন উম্মে সালিহা।

'কথাবার্তা শুনে মনে হয়, তাঁর মতো ফ্যানাটিক দুনিয়ার মাটিতে এর আগে জন্মায়নি, আপনার দেশে ফেরা মানে আত্মহত্যা করা হতে পারে। কোনো মন্তব্য করবেন?'

নিরুদ্বিগ্ন হাসির সাথে মাথা নাড়লেন উম্মে সালিহা। 'এবার আমাকে যেতে হয়। ধন্যবাদ।'

সিকিউরিটি গার্ডদের একটা বৃত্ত বোর্ডিং র‍্যাম্পের দিকে নিয়ে চললো তাঁকে। তাঁর এইড-রা আর ইউনেস্কোর বড়সড় প্রতিনিধিদলটা আগেই আসন গ্রহণ করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের চারজন পদস্থ কর্মকর্তা আপাততঃ আলাদা একটা কেবিনে বসেছেন, কারণ তাঁরা মদ্যপান করবেন। মহাসচিব মদ স্পর্শ করেন না, তাই কেউ তাঁরা তাঁর সামনে খান না মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে। মেইন কেবিন ধরে এগিয়ে এলেন উম্মে সালিহা, বাতাসে জেট ফুয়েল আর বীফ ওয়েলিংটন-এর গন্ধ ভাসছে।

চারটে সিঙ্গেল সোফা নিয়ে তাঁর বসার আয়োজন। জানালার ধারে একটা সোফায় বসে সিট বেল্ট বাঁধলেন তিনি। জুতো খুললেন, মাথা ঝাঁকিয়ে বিদায় করে দিলেন এইড-দের। হেলান দিলেন সোফায়, চোখ বুজলেন। তাঁকে তন্দ্রায় ঢুলতে দেখে কফি নিয়ে এসেও ফিরে গেল একজন স্টুয়ার্ডেস।

জাতিসংঘের চার্টার ফ্লাইট একশো ছয় রানওয়ের শেষ মাথায় চলে এলো। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে টেক-অফ-এর অনুমতি পাবার পর থ্রাস্ট লিভার সামনে ঠেলে দিলো পাইলট, ভেজা কংক্রিটের ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করলো বোয়িং সেভেন-টু-জিরো/বি, হালকা কুয়াশার ভেতর উঠে পড়লো আকাশে।

সাড়ে দশ হাজার মিটার উঁচুতে উঠে এলো প্লেন, অটোপাইলট এনগেজ করলো বব রিচার্ডসন। সিট বেল্ট খুলে সিট ছাড়লো সে। 'প্রকৃতির ডাক,' বলে কেবিনের দরজার দিকে এগোলো।

সেকেণ্ড অফিসার অর্থাৎ এঞ্জিনিয়ার সোনালি চুল ভরা মাথাটা ঝাঁকালো, ইনস্ট্রুমেণ্ট প্যানেল থেকে চোখ না তুলেই হাসলো একটু। 'নিশ্চিন্ত মনে সাড়া দিয়ে আসুন, আমি তো আছি।'

পাল্টা হেসে প্যাসেঞ্জার কেবিনে বেরিয়ে এলো পাইলট। একটু পরই খাবার পরিবেশন করা হবে, তারই প্রস্তুতি নিচ্ছে ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্টরা। বীফ ওয়েলিংটন-এর গন্ধে জিভে জল এসে গেল বব রিচার্ডসনের। হাত-ইশারায় চীফ স্টুয়ার্ডকে একপাশে ডাকলো সে।

'আপনাকে কিছু দেবো, ক্যাপটেন?'

'শুধু এক কাপ কফি,' বললো বব রিচার্ডসন। 'তবে ব্যস্ত হয়ো না, আমি নিজেই নিতে পারবো।'

'না, ঠিক আছে।' প্যানট্রিতে ঢুকে কাপে কফি ঢাললো চীফ স্টুয়ার্ড।

'শোনো হে।'

'স্যার।'

'কোম্পানী থেকে বলা হয়েছে, সরকার পরিচালিত একটা আবহাওয়া গবেষণায় আমাদেরকে ভূমিকা রাখতে হবে। লণ্ডন থেকে আমরা যখন আটাশ হাজার কিলোমিটার দূরে থাকবো, দশ মিনিটের জন্যে পনেরো হাজার মিটারে নামিয়ে আনবো প্লেনটাকে—বাতাস আর তাপমাত্রা রেকর্ড করা হবে। তারপর আবার স্বাভাবিক অলটিচ্যুড-এ উঠে যাবো। ঠিক আছে?'

'বিশ্বাস করা কঠিন যে কোম্পানী রাজি হয়েছে। বাপরে বাপ, কি পরিমাণ ফুয়েল নষ্ট হবে ভেবে দেখেছেন, স্যার?'

'ভেবেছো ম্যানেজমেণ্টের টপ বাস্টার্ডরা ওয়াশিংটনে মোটা একটা বিল পাঠাবে না?'

'সময় হলে আরোহীদের জানাবো আমি, তা না হলে ভয় পাবেন ওঁরা।'

'ঘোষণায় এ-কথাও জানিয়ে দিতে পারো যে জানালা দিয়ে কেউ যদি কোনো আলো দেখে, ধরে নিতে হবে ওগুলো মাছ ধরার জাহাজ থেকে আসছে।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

চট করে একবার মেইন কেবিনের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো রিচার্ডসন, চঞ্চল দৃষ্টি পলকের জন্যে স্থির হলো উম্মে সালিহার ঘুমন্ত মুখের ওপর। 'তোমার মনে হয়নি, সিকিউরিটি অস্বাভাবিক কড়া?' আলাপের সুরে জিজ্ঞেস করলো সে। 'রিপোর্টারদের একজন আমাকে

বললো, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড নাকি সন্দেহ করছে মহাসচিবকে অপহরণ করা হতে পারে।'

'তাই নাকি?'

'ওদের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে ধুলোর প্রতিটি কণায় সন্ত্রাসবাদীরা ওত পেতে আছে। আমার পরিচয়-পত্র দেখে সন্তুষ্ট হয়নি, ব্যাগটাও সার্চ করলো।'

কাঁধ ঝাঁকালো চীফ স্টুয়ার্ড। 'খারাপটা কি। শুধু তো আরোহীদের নয়, আমাদের নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িত।'

প্যাসেজের দু'পাশে সিটে বসা আরোহীদের দিকে একটা হাত তুললো রিচার্ডসন। 'অন্তত ওদের কাউকে দেখে হাইজ্যাকার বলে মনে হচ্ছে না।'

'চেহারা দেখে সবাইকে যদি চেনা যেতো!'

'তা যা বলেছো। কাজেই একটু সাবধান হতে হয়। ককপিটের দরজা তালা দিয়ে রাখছি, বুঝলে। খুব যদি জরুরী কিছু বলতে চাও, ইণ্টারকমে ডেকো আমাকে।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

কফিতে মাত্র একটা চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখলো রিচার্ডসন, ফিরে এলো ককপিটে। ফার্স্ট অফিসার, তার কো-পাইলট, পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ওয়েলস-এর আলো দেখছে, তার পিছনে কমপিউটারের সাহায্যে ফুয়েলের খরচ ও মজুদ জেনে নিচ্ছে এঞ্জিনিয়ার।

তাদের দিকে পিছন ফিরে কোটের বুক পকেট থেকে ছোটো একটা চামড়ার বাক্স বের করলো রিচার্ডসন। বাক্স খুলে হাতে একটা সিরিঞ্জ নিলো, নার্ভ এজেণ্ট সারিন ভরলো তাতে। ক্রুদের দিকে ফিরলো

আবার, হাঁটতে শুরু করে হোঁচট খেলো, যেন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, সামলে নেয়ার জন্যে খপ করে সেকেণ্ড অফিসারের বাহু আঁকড়ে ধরলো। 'দুঃখিত, ক্রেন, কার্পেটে পা বেধে গিয়েছিল।'

ক্রেন ওয়ার্ডের গোঁফ জোড়া ঘন আর কালো, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, সুদর্শন চেহারা। সূচটা এতোই সরু আর তীক্ষ্ণমুখ যে টেরই পেলো না তার কাঁধে কিছু ঢুকছে। এঞ্জিনিয়ারের প্যানেলে সাজানো এক গাদা আলো থেকে চোখ তুলে হাসলো সে। 'বয়স হয়েছে, এবার কিন্তু আপনার মদ খাওয়া কমিয়ে দেয়া উচিত, ক্যাপটেন।'

'প্লেন তো সোজাই চালাই,' হালকা সুরে বললো রিচার্ডসন। 'শুধু হাঁটার সময় তাল পাই না।'

মুখ খুললো ক্রেন ওয়ার্ড, যেন কিছু বলতে চায়, কিন্তু হঠাৎ করে ভাবলেশহীন হয়ে পড়লো তার চেহারা। মাথা ঝাঁকালো সে যেন দৃষ্টি পরিষ্কার করতে চাইছে। পরমুহূর্তে উল্টে গেল চোখ জোড়া, স্থির হয়ে গেল শরীর।

ওয়ার্ডের গায়ে হেলান দিয়ে থাকলো রিচার্ডসন, সিট থেকে সে যাতে কাত হয়ে না পড়ে। সিরিঞ্জটা খুলে নিয়ে ব্যাগে ভরলো, বের করলো নতুন আরেকটা, দ্বিতীয়টাতে আগেই সারিন ভরে রেখেছে। 'আরে, ক্রেনের কিছু হলো নাকি? অমন নেতিয়ে পড়লো কেন।'

কো-পাইলটের সিটে ঝট্ করে ঘুরলো প্রকাণ্ডদেহী ফার্স্ট অফিসার ডিক হার্ট, চোখে প্রশ্ন। 'সে কি!'

'এসে দেখো না একবার।'

সিট ছেড়ে উঠে এলো ডিক হার্ট, ক্যাপটেনকে পাশ কাটিয়ে ঝুঁকে পড়লো সেকেণ্ড অফিসারের দিকে। সূচ ঢুকিয়ে সিরিঞ্জের মাথায় চাপ দিলো রিচার্ডসন, তবে ডিক হার্ট ব্যথাটা অনুভব করলো।

'উফ! কি ব্যাপার!' ঝট করে ঘুরতেই ক্যাপটেনের হাতে সিরিঞ্জটা দেখতে পেলো সে। ক্রেন ওয়ার্ডের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ডিক হার্ট, বিষটা সাথে সাথে কাজ শুরু করেনি। নগ্ন সত্য প্রকাশ পাবার সাথে সাথে তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো, পরমুহূর্তে দু'-হাত সামনে বাড়িয়ে ক্যাপটেনকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। 'কে তুমি?' রিচার্ডসনের গলাটা দু'হাতে ধরে ফেলে গর্জে উঠলো। 'বব রিচার্ডসন কোথায়? তার ছদ্মবেশ নিয়ে…'

ইচ্ছে থাক বা না থাক, উত্তর দেয়ার উপায় নেই ছদ্মবেশী লোকটার, কারণ ডিক হার্টের বিশাল দুটো হাত তার গলায় এমনভাবে চেপে বসেছে যে দম ফেলতে পারছে না সে। একটা বাল্কহেডের সাথে তাকে চেপে ধরলো ডিক হার্ট। মারা যাচ্ছে বুঝতে পেরে মরিয়া হয়ে উঠলো ছদ্মবেশী পাইলট। ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে ডিক হার্টের তলপেটে প্রচণ্ড গুঁতো মারলো সে। সামান্যই প্রতিক্রিয়া হলো, একবার শুধু গুঙিয়ে উঠলো ডিক হার্ট। চোখে অন্ধকার দেখছে নকল পাইলট।

তারপর, ধীরে ধীরে, গলার ওপর থেকে কমে এলো চাপটা, হোঁচট খেতে খেতে পিছিয়ে গেল ডিক হার্ট। মৃত্যু উপস্থিত বুঝতে পেরে আতংকে বিকৃত হয়ে উঠেছে তার চেহারা। চোখে দিশেহারা ভাব আর ঘৃণা নিয়ে পাইলটের দিকে তাকিয়ে আছে সে। শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে শেষ একটা ঘুসি মারলো পাইলটের পেটে।

হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল বব রিচার্ডসনের, কুঁজো হয়ে গোঙাতে লাগলো। সিধে হতে শুরু করে দেখলো সামনেটা ঝাপসা লাগছে। পাইলটের সিটে ধাক্কা খেয়ে কার্পেটের ওপর পড়ে গেল ডিক হার্ট, আর নড়লো না। কয়েক সেকেণ্ড ককপিটের মেঝেতে বসে থাকলো রিচার্ডসন, সশব্দে হাঁপাচ্ছে, ব্যথা কমাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে পেটে হাত

বুলিয়ে।

খানিক পর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়ালো সে। দরজার ওদিক থেকে নানা ধরনের শব্দ ভেসে আসছে। মেইন কেবিনে কোনো হৈ-চৈ নেই বলে মনে হলো তার। এঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে ককপিটের কোনো আওয়াজ দরজার ওদিকে পৌঁছায়নি।

ডিক হার্টকে কো-পাইলটের সিটে বসিয়ে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধতে ঘেমে গোসল হয়ে গেল সে। ক্রেন ওয়ার্ডের সেফটি বেল্ট বাঁধাই আছে, কাজেই তাকে আর ছুঁলো না। অবশেষে পাইলটের সিটে বসে প্লেনের পজিশন দেখলো সে।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর নির্ধারিত পথ থেকে প্লেনটাকে ঘুরিয়ে আরেক-দিকে রওনা হলো ভুয়া পাইলট। নতুন পথটা সুমেরুর দিকে চলে গেছে।

তিন

দুনিয়ার সবচেয়ে বন্ধ্যা জায়গার একটা, এখানে কখনো ট্যুরিস্টদের আগমন ঘটেনি। গত কয়েক শো বছরে মুষ্টিমেয় কিছু এক্সপ্লোরার ও বিজ্ঞানী এই অভিশপ্ত এলাকায় মাঝে মধ্যে হাঁটাচলা করেছেন। উঁচু-

নিচু তীর বরাবর সাগর দু'এক হপ্তা বাদে বছরের বাকি সময় জমাট বেঁধে থাকে, শীতের শুরুতে তাপমাত্রা নেমে যায় −৭০ ডিগ্রী ফারেনহাইটে। দীর্ঘ শীতের মাসগুলোয় ঠাণ্ডা আকাশটাকে গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করে রাখে, এমনকি গরমের দিনেও চোখ ধাঁধানো রোদ এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে ভয়াবহ তুষার ঝড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

জায়গাটা গ্রীনল্যাণ্ডের সর্ব উত্তরে। আরডেনক্যাপল ফিঅ্যরড-এর চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে বরফ ঢাকা পাহাড়। বাতাস এখানে প্রতি মুহূর্তে ঝড়ের মতো বইছে। ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগে যে প্রায় দু'হাজার বছর আগেও এখানে একদল শিকারী বসবাস করতো। ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া রেডিওকার্বন পরীক্ষা করে জানা গেছে দুশো থেকে চারশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লোকবসতি ছিলো এখানে। প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবে সময়টা তেমন লম্বা নয়, তবে তাদের রেখে যাওয়া গোটা বিশেক বাড়ি উৎসুক বিজ্ঞানীদের জন্যে বিরাট কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। হিমশীতল আবহাওয়ায় আজও প্রায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে বাড়িগুলো।

আগে থেকে তৈরি করা অ্যালুমিনিয়ামের কাঠামো হেলিকপ্টার থেকে রশি বেঁধে নামানো হয়েছে প্রাচীন গ্রামটার মাঝখানে, কাঠামোগুলো জোড়া লাগিয়ে নিজেদের জন্যে নিরাপদ আস্তানা বানিয়ে নিয়েছে কলোরাডো ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা। জবড়জং চেহারার হিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আর ফোম-গ্লাস ইনসুলেশন রক্ত হিম করা ঠাণ্ডার সাথে অসম যুদ্ধে লিপ্ত। ঝোড়ো বাতাস বিরতিহীন গোঙালেও, তাতে শুধু ভূতুড়ে হয়ে উঠেছে পরিবেশ, গ্রামের বাইরের পাঁচিল টপকে ভেতরে সহজে ঢুকতে পারে না। শীতের শুরুতে আর্কিওলজিকাল দলটিকে চারপাশে কাজ করার বিরাট একটা সুযোগ এনে দিয়েছে এই আশ্রয়।

জেনিথ কর্নেলিয়াস কালোরাডো ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপিকা অ্যানথ্রোপলজি পড়ায়। শীত বা তুষার ঝড় গ্রাহ্য করার মেয়ে নয় সে, দলের আর সবাই তাকে এস্কিমোদের বংশধর বলে ঠাট্টা করে। প্রাচীন শিকারীদের একটা ঘরের ভেতর মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসেছে সে, হাতে ছোটো একটা তোয়ালে জড়িয়ে জমাট বাঁধা মাটি সতর্কতার সাথে আঁচড়াচ্ছে। ঘরের ভেতর সে একা, অতীত খুঁড়ে প্রাচীন যুগের নিদর্শন আবিষ্কারের কাজে মগ্ন।

লোকগুলো ছিলো সী-ম্যামল্ শিকারী, শীতের সময়টা তারা নিজেদের ঘর-বাড়িতে কাটাতো। ঘরগুলো আংশিক মাটির ভেতর গাঁথা, পাথরের তৈরি দেয়ালগুলো নিচু, ঘাস বা গাছের পাতা দিয়ে ছাওয়া ছাদ দাঁড়িয়ে আছে তিমির হাড় অবলম্বন করে। তেল দিয়ে কুপি জেলে শরীর গরম রাখতো তারা, দীর্ঘ অন্ধকার মাসগুলো ঘরের ভেতর অলস বসে না থেকে নদীর স্রোত থেকে তুলে নেয়া কাঠের টুকরো, হাতির দাঁত আর হরিণের শিঙ দিয়ে কুঁদে মূর্তি বানাতো।

গ্রীনল্যাণ্ডের এই অংশে যীশুর জন্মের পর প্রথম শতাব্দীতে আস্তানা গেড়েছিল তারা। তারপর, তাদের সংস্কৃতির বিকাশ যখন তুঙ্গে, হঠাৎ করে পাততাড়ি গুটিয়ে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যায়। এর কোনো গ্রহণ-যোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে অদৃশ্য হলেও, এখানে তারা নিজেদের বহু জিনিস ফেলে গেছে। ধ্বংসাবশেষ হিসেবে তা টিকে আছে আজও।

জেনিথের নিষ্ঠা আর শ্রম বৃথা গেল না। ডিনারের পর অ্যালুমিনি-য়াম কাঠামোর ভেতর তার পুরুষ সঙ্গীরা বিশ্রাম নিচ্ছে, আবিষ্কারের আনন্দ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হলো তারা। ঝোড়ো বাতাস উপেক্ষা করে প্রাচীন গ্রামের ভেতর এসে কাজ করায় হরিণের শিঙের তৈরি

বারোটা ভালুকসদৃশ মূর্তি, জটিল আকৃতির একটা চিরুণী আর পাথরের তৈরি একটা পাতিল পেয়ে গেল সে। হঠাৎ করে জেনিথের হাতের তোয়ালে কিসে যেন আটকে গিয়েই আবার মুক্ত হলো। একই জায়গায় তোয়ালেটা আবার ঘষলো সে, কান দুটো সজাগ। এবার একটা শব্দও শুনলো। গর্তের ভেতর হাত গলিয়ে হাতড়ালো, কিন্তু কিছুই পেলো না। তোয়ালে খুলে আঙুলের টোকা দিলো মাটিতে। একটা আওয়াজ হলো। পাথরের আওয়াজ চেনা আছে, সে-ধরনের নয়। আবার গর্তের ভেতরটা হাতড়ালো সে। জিনিসটা একটু যেন চ্যাপ্টা, তবে শব্দটা ধাতব। মাটির খানিকটা আবরণ সরাতেই এবার হাতে চলে এলো।

সিধে হলো জেনিথ। ডানে বাঁয়ে ঘুরে, আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিতে, ঢিল করলো পিঠের পেশী। কোলম্যান লণ্ঠনের আলোয়, উলেন ক্যাপের বাইরে, তার দীর্ঘ লাল চুল কোমল অগ্নিশিখার মতো জ্বলজ্বল করছে। মুঠোটা খুললো সে, নীল আর সবুজ মেশানো চোখে চিকচিক করে উঠলো কৌতূহল। কয়লা-কালো মাটির প্রলেপ নিয়ে তালুতে পড়ে থাকা ছোট্ট জিনিসটা যেন তার বুদ্ধিমত্তাকে ব্যঙ্গ করলো।

এখানে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বসবাস ছিলো, নিজেকে মনে করিয়ে দিলো জেনিথ কর্নেলিয়াস। লোহা বা তামার ব্যবহার তারা জানতো না।

শান্ত থাকার চেষ্টা করলেও, অবিশ্বাস আর বিস্ময়ের একটা জোয়ার গ্রাস করে ফেললো তাকে। তারপর এলো উত্তেজনা, সবশেষে জরুরী তাগাদা। নখের হালকা আঁচড়ে মাটির আবরণ সরিয়ে ফেললো সে, লণ্ঠনের আলোয় চকচক করে উঠলো জিনিসটা। হাঁ করে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকলো জেনিথ। আর কোনো সন্দেহ নেই। একটা স্বর্ণমুদ্রা

আবিষ্কার করেছে সে।

অত্যন্ত পুরনো মুদ্রা, কিনারাগুলো ক্ষয়ে গেছে। মুদ্রার গায়ে ক্ষুদে একটা গর্ত রয়েছে, চামড়ার একটা ফিতে ঝুলছে সেটা থেকে। কিছুর সাথে ঝুলিয়ে রাখা হতো ওটা, সম্ভবত ব্যক্তিগত অলংকার হিসেবে কারো গলায়।

পাঁচ মিনিট পর, এখনো মুদ্রাটাকে পরীক্ষা করছে জেনিথ, রহস্যের কিনারা পাবার চেষ্টা করছে, এই সময় ঘরের দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকলেন বিশালদেহী সদয় চেহারার এক ভদ্রলোক, সাথে এক গাদা তুষার কণা নিয়ে। তাঁর নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসছে সাদা বাষ্প। দাড়ি আর ভুরু তুষারে সাদা হয়ে আছে।

ডঃ জ্যাকুয়েস মোরেল হাসলেন। চারজনের আর্কিওলজিস্ট দলের প্রধান তিনি। 'বাধা দেয়ার জন্যে দুঃখিত, জেনিথ,' ভারি গলায়, মৃদু কণ্ঠে বললেন তিনি। 'তবে বড় বেশি খাটাখাটনি করছো তুমি। একটু বিশ্রাম নাও। শেলটারে চলো, তোমাকে ব্র্যাণ্ডি খাওয়াবো।'

'ডক্টর মোরেল,' বললো জেনিথ, উত্তেজনা চেপে রাখার চেষ্টা করলেও তার গলা কেঁপে গেল। 'আপনাকে আমি অদ্ভুত একটা জিনিস দেখাতে চাই।'

এগিয়ে এসে জেনিথের পাশে দাঁড়ালেন জ্যাকুয়েস মোরেল। 'কি পেয়েছো দেখি?'

তাঁর সামনে মুঠোটা খুললো জেনিথ। 'দেখুন!'

পারকার ভেতর থেকে হাতড়ে চশমাটা বের করে চোখে পরলেন ডঃ মোরেল। মুদ্রাটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন তিনি, নাকটা প্রায় ঠেকে গেল সেটার গায়ে। চারদিক থেকে নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করলেন তিনি মুদ্রাটা। তারপর মুখ তুলে জেনিথের দিকে তাকালেন, কৌতুকে নাচছে

চোখের মণি দুটো। 'আমার সাথে ঠাট্টা করছো, তাই না?'

জেদ নিয়ে তাকালো জেনিথ, তারপর পেশী ঢিল করে দিয়ে মুচকি হাসলো। 'ওহ্ গড! আপনি ভাবছেন আমি নিজেই এটা এখানে রেখে আবিষ্কারের ভান করছি!'

'তোমাকেও স্বীকার করতে হবে, ব্যাপারটা পতিতালয়ে কুমারী খুঁজে পাবার মতো।'

'কিউট।'

জেনিথের কাঁধে মৃদু চাপড় মারলেন ডঃ মোরেল। 'কংগ্রাচুলেশন্স। দুর্লভ একটা আবিষ্কার।'

'কিন্তু কিভাবে এটা এলো এখানে?'

'হাজার মাইলের মধ্যে সোনার কোনো মজুদ নেই এদিকে। প্রাচীন লোক যারা এখানে ছিলো তারা খনি থেকে সোনা উদ্ধার করেছিল, তা সম্ভব নয়। পাথুরে যুগের চেয়ে সামান্য উন্নতি করেছিল তারা। মুদ্রাটা অবশ্যই আরো অনেক পরে অন্য কোনো উৎস থেকে এখানে এসেছে।'

'কিন্তু যে-সব শিল্পকর্ম আমরা উদ্ধার করেছি তার সবই তিনশো খ্রিস্টাব্দের, সেগুলোর সাথে এটা থাকে কিভাবে—এর কি ব্যাখ্যা দেবেন আপনি?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ডঃ মোরেল। 'নিজেকে আমার বোকা লাগছে।'

'ঠিক আছে, বোকার মতোই না হয় একটা কিছু আন্দাজ করুন।'

'বুদ্ধিতে যতোটুকু কুলাচ্ছে—কোনো ভাইকিং এটা বিনিময় করে বা হারিয়ে ফেলে।'

'পূর্ব তীর ধরে এতো দূর দক্ষিণে জলদস্যুদের কোনো জাহাজ এসেছিল, এমন কোনো রেকর্ড নেই।'

'আচ্ছা, এমন হতে পারে না যে আরো কাছাকাছি সময়ের এস্কিমোদের সাথে দক্ষিণের নর্স বসতিস্থাপনকারীদের বিনিময় বাণিজ্য হয়েছিল ? শিকারের সময় এই প্রাচীন গ্রামটা হয়তো ব্যবহার করা হয়।'

'আপনি খুব ভালো করেই জানেন, ডঃ মোরেল, চারশো খ্রিস্টাব্দের পর এদিকে লোকবসতির কোনো প্রমাণ আমরা পাইনি।'

ভুরু কুঁচকে জেনিথের দিকে তাকালেন ডঃ মোরেল। 'তুমি দেখছি হাল ছাড়ার পাত্রী নও। মুদ্রাটায় তো এমনকি কোনো তারিখও দেখছি না।'

'মরিস প্রাচীন মুদ্রা বিশেষজ্ঞ, চলুন দেখি সে কি বলে।'

পারকার হুড অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে কোলম্যান লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিলো জেনিথ। টর্চ জ্বাললেন ডঃ মোরেল, দরজা খুলে আগে বেরুতে দিলেন জেনিথকে। অন্ধকারে কবরস্থানের ভূতের মতো গোঙাচ্ছে বাতাস। মুখের খোলা অংশে ঠাণ্ডা বাতাস যেন মৌমাছির হুল ফুটালো। একটা রশি ধরে এগোলো ওরা, শেষ প্রান্তটা অ্যালুমিনিয়াম শেলটারে বাঁধা আছে। হাঁটতে হাঁটতে ওপরে মুখ তুললো জেনিথ। পরিষ্কার আকাশ, কালো ভেলভেটের মতো লাগলো দেখতে, তারাগুলো নকশা এঁকে রেখেছে। তারার আলোয় পশ্চিমের পাহাড় পরিষ্কার চেনা গেল। খাড়িতে নেমে আসছে তুষার আর বরফ, সেখান থেকে উপচে বেরিয়ে আসছে খোলা সাগরে। আর্কটিকের সৌন্দর্য সুন্দরী রমণীর হাতছানির মতো। পুরুষরা কেন যে ভালোবেসে ফেলে বুঝতে তার অসুবিধে হলো না।

টর্চের আলোয় ত্রিশ গজ হেঁটে নিরাপদ আশ্রয়ের স্টর্ম করিডরে পৌঁছুলো ওরা, আরো দশ ফুট পেরিয়ে দ্বিতীয় দরজা খুলে লিভিং

কোয়ার্টারে চলে এলো। বাইরের ঠাণ্ডার তুলনায় ভেতরটা উত্তপ্ত তন্দুর মনে হলো জেনিথের, কফির গন্ধ নাকে পারফিউমের পরশ বুলিয়ে দিলো। পারকা খুলে নিজের কাপটা ভরে নিলো সে।

জোসেফ পেনবার্নারের সোনালি চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, পাকানো রশির মতো গোঁফ, একটা ড্রাফটিং বোর্ডের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। নিউ ইয়র্কের একজন আর্কিটেক্ট, আর্কিওলজির প্রেমে অন্ধ। তুনিয়ার এমন কোনো সম্ভাব্য জায়গা নেই যেখানে খোঁড়াখুঁড়ির কাজে যেতে রাজি নয় পেনবার্নার, নিজের পেশা ছেড়ে প্রতি বছরই তু'মাসের জন্যে এই কাজে গায়েব হয়ে যায় সে। সতেরো শো বছর আগে প্রাচীন গ্রামটা ঠিক কি রকম দেখতে ছিলো, তার আঁকা নকশা থেকে সেটা জানতে পেরেছে ওরা।

মরিস উইনফিল্ড দলের চার নম্বর সদস্য। নিজের ছোট্ট খাটে শুয়ে অতি ব্যবহারে মলিন একটা পেপার ব্যাক পড়ছে সে। অ্যাডভেঞ্চার গল্পের পাগল। তার হাতে বা পকেটে একটা বই নেই, এমন কখনো ঘটেছে কিনা মনে করতে পারলো না জেনিথ। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সেরা আর্কিওলজিস্টদের একজন সে। অল্প বয়সেই মাথায় মস্ত টাক দেখা দিয়েছে।

'ওহে, মরিস,' ডঃ মোরেল বললেন, 'জেনিথ কি পেয়েছে দেখো।' মুদ্রাটা তার দিকে ছুঁড়ে দিলেন তিনি। আঁতকে উঠলো জেনিথ। তবে, সময় মতো বই থেকে মুখ তুলে খপ্ করে সেটা ধরে ফেললো মরিস উইনফিল্ড।

কয়েক মুহূর্ত পর মুখ তুললো সে। 'আমাকে বোকা বানাবার মতলব ?'

মন খুলে হাসলেন ডঃ মোরেল। তারপর বললেন, 'না হে। গ্রামের

একটা ঘর থেকে সত্যি ওটা খুঁড়ে পেয়েছে জেনিথ।'

ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা বের করলো মরিস উইনফিল্ড। লেন্সের তলায় ফেলে মুদ্রাটা ভালোভাবে পরীক্ষা করলো সে।

'কি হলো ?' জেনিথ ধৈর্য রাখতে পারছে না। 'একটা কিছু রায় দাও।'

'অবিশ্বাস্য,' বিড়বিড় করলো উইনফিল্ড, হতভম্ব দেখালো তাকে। 'স্বর্ণমুদ্রা। প্রায় সাড়ে তেরো গ্রাম। আগে কখনো দেখিনি আমি। অত্যন্ত দুর্লভ। একজন কালেক্টর সম্ভবত দশ থেকে পনেরো হাজার ডলারে কিনতে চাইবে।'

'চেহারাটা কার সাথে মেলে বলতে পারো ?'

'মেলে মানে! রোমান আর বাইজ্যানটাইন সাম্রাজ্যের সম্রাট থিয়োডোসিয়াস দ্য গ্রেটের মূর্তি ওটা, দাঁড়িয়ে আছে। ঝাপসা হয়ে গেছে, কিন্তু ভালো করে তাকালে দেখতে পাবে সম্রাটের পায়ের কাছে বন্দীরা পড়ে আছে। লক্ষ্য করেছো সম্রাটের হাতে দুটো জিনিস—একটা গ্লোব আর একটা ব্যানার ?'

'ব্যানার ?'

'ব্যানারটায় পাশাপাশি দুটো গ্রীক অক্ষর রয়েছে, XP, একটা মনোগ্রামের আকৃতিতে, যার অর্থ হলো—"খ্রিস্টের নামে" খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সম্রাট কনস্ট্যানটাইন মনোগ্রামটা গ্রহণ করেছিলেন, তারপর একে একে তাঁর উত্তরাধিকারীরা এটা পেয়ে এসেছে।'

'উল্টোদিকের লেখাগুলো থেকে কি বুঝছো তুমি ?' প্রশ্ন করলেন ডঃ মোরেল।

আবার লেন্সে চোখ রাখলো মরিস উইনফিল্ড। 'তিনটে শব্দ। প্রথমটা মনে হচ্ছে…TRIVMFATOR বাকি দুটো পড়া যাচ্ছে না,

মুছে প্রায় মসৃণ হয়ে গেছে। কালেক্টর'স ক্যাটালগ থেকে বর্ণনা আর ল্যাটিন অনুবাদ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সভ্য জগতে ফেরার আগে খোঁজ করতে পারছি না।'

'সময়টা আন্দাজ করতে পারো ?'

চিন্তিতভাবে সিলিঙের দিকে তাকালো উইনফিল্ড। 'থিয়োডোসিয়াসের শাসনকাল, যতদূর মনে হয়, তিনশো উনআশি থেকে তিনশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দ।'

ঝট্ করে ডঃ মোরেলের দিকে ফিরলো জেনিথ। 'ঠিক বলেছে।'

মাথা নাড়লেন তিনি। 'চতুর্থ শতাব্দীর এস্কিমোরা রোমান সাম্রাজ্যের সাথে যোগাযোগ করেছিল বললে গাঁজা শোনাবে না ?'

'সম্ভাবনার কথা আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না।' জেদের সুরে বললো জেনিথ।

'ব্যাপারটা জানাজানি হলে, দুনিয়া জুড়ে হৈ-চৈ পড়ে যাবে,' বললো জোসেফ পেনবার্নার, এই প্রথম মুদ্রাটা দেখছে সে।

ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিলেন ডঃ মোরেল। 'প্রাচীন মুদ্রা এর আগেও অদ্ভুত সব জায়গায় পাওয়া গেছে। কিন্তু মুদ্রার তারিখ বা কোথায় পাওয়া গেছে সে-সম্পর্কে আর্কিওলজিস্ট মহলকে সন্তুষ্ট করতে পারে এমন প্রমাণ বিরল।'

'তা হয়তো সত্যি,' মৃদুকণ্ঠে বললো উইনফিল্ড। 'কিন্তু এটা এখানে কিভাবে এলো জানার জন্যে আমি আমার মার্সিডিজ কনভার্টিবল-টা হারাতে রাজি আছি।'

কিছুক্ষণ কথা না বলে মুদ্রাটার দিকে তাকিয়ে থাকলো ওরা, সবাই চিন্তিত। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ডঃ মোরেল, 'তারমানে একটা রহস্যের সামনে পড়েছি আমরা। শুধু এটুকুই জানি।'

হ্যাঁ, শুধু এটুকুই ওরা জানে। এই আবিষ্কারের তাৎপর্য সম্পর্কে ওদের কারো তেমন পরিষ্কার ধারণা নেই। জানে না, একই উৎস থেকে হারিয়ে যাওয়া আরো অনেক বড় কিছু এখান থেকে অল্প দূরে আবিষ্কার হতে যাচ্ছে। জানে না, ঘটনাচক্রে কি ভয়াবহ একটা পরিস্থিতির সাথে জড়িয়ে পড়তে হবে ওদেরকে।

চার

মাঝরাতের খানিক পর প্লেন ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিলো ভুয়া পাইলট।

স্বচ্ছ পরিষ্কার বাতাস, কালো মসৃণ সাগর তীরের ওপর ম্লান একটা দাগের মতো মাথাচাড়া দিলো আইসল্যাণ্ড। ছোট্ট দ্বীপদেশটার আকৃতি সবুজাভ সুমেরুপ্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ধীরে ধীরে।

ছোটোবেলা থেকেই রক্তদর্শনে অভ্যস্ত সে, লাশ দেখে তার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে না। ভাড়াটে খুনী হিসেবে অবিশ্বাস্য মোটা টাকা পায়, তার সাথে যোগ হয়েছে ধর্মীয় উন্মাদনা। তার ধারণা, কাফেরদের খুন করে অঢেল পুণ্য অর্জন করছে সে। কেউ তাকে অ্যাসাসিন বা টেরোরিস্ট বললে ভয়ানক খেপে যায়। শব্দ দুটোর মধ্যে রাজনীতির গন্ধ আছে। বব রিচার্ডসন ওরফে মোহাম্মদ আল দাউদ রাজনীতি পছন্দ

করে না। পেশাদার খুনী সে, তবে ভাড়া খাটে শুধু মৌলবাদী ইসলামী দল বা গোষ্ঠীগুলোর পক্ষে।

বহুরূপী বলতে যা বোঝায়, সে তাই। সমস্ত কলা-কৌশল জানা আছে, দ্রুত চেহারা বদলানোয় তার জুড়ি মেলা ভার। নিখুঁত কাজ তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, একজন পারফেকশনিস্ট। ভিড় লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করা বা গাড়িতে বোমা ফিট করা তার কাছে হাস্যকর বোকামি বলে মনে হয়। তার পদ্ধতি আরো অনেক সূক্ষ্ম। আন্তর্জাতিক তদন্তকারীরা তার অনেক কীর্তিকে অ্যাক্সিডেন্ট নয় বলে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

উম্মে সালিহাকে খুন করাটা টাকার বিনিময়ে একটা কাজ বলে ভাবছে না দাউদ। জাতিসংঘের মহাসচিবকে খুন করা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আয়োজনবহুল প্ল্যানটা নিখুঁত করতে পাঁচ মাস সময় নিয়েছে সে। তারপরও ধৈর্য ধরতে হয়েছে সুবর্ণ সুযোগটির জন্যে।

প্রায় অপচয়ই বলা যায়, মুচকি হেসে ভাবলো সে। উম্মে সালিহা রাজরানীর সৌন্দর্য নিয়ে অকালে মারা যাচ্ছে। তবে দুঃখ নেই, কারণ বেপর্দা একটা মেয়েলোককে দোজখে পাঠাচ্ছে সে। ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে মেয়েলোকটা বিরাট একটা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধীরে ধীরে থ্রটল পিছিয়ে আনলো সে। একটু একটু করে নিচে নামছে প্লেন। আরোহীরা কিছু টের পাবে না। তাছাড়া, মেইন কেবিনের আরোহীরা ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই ঘুমে ঢুলছে। এইবার নিয়ে বারো বার হেডিং চেক করলো সে। কমপিউটরে আগেই রিপ্রোগ্রাম দিয়ে রেখেছে, যেখানে সে নামতে চায় সেখানকার দুরত্ব আর সময়ের হিসাব সবই সঠিকভাবে পাচ্ছে। পনেরো মিনিট পর আইসল্যাণ্ডের দক্ষিণ উপকূলরেখা পেরিয়ে ভেতর দিকে চলে এলো প্লেন। কাছা-

কাছি কোথাও কোনো লোকবসতি নেই। নিচের দৃশ্য বলতে ধূসর রঙের পাথর আর সাদা তুষার। স্পীড কমালো দাউদ। ঘণ্টায় তিন শো বাহান্ন কিলোমিটার গতিতে ছুটছে প্লেন।

হুফসজোকাল গ্লেসিয়ারে একটা বীকন রাখা আছে, সেটা থেকে পাঠানো সংকেত রেডিওতে ধরে, সরাসরি গ্লেসিয়ারের দিকে অটো-পাইলট রিসেট করলো আল দাউদ। দ্বীপের মাঝখান থেকে এক হাজার সাতশো সাঁইত্রিশ মিটার উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিমবাহ হুফসজোকাল। এরপর অলটিচ্যুড সেট করলো সে, সংঘর্ষটা যাতে চূড়ার দেড়শো মিটার নিচে ঘটে।

এক এক করে কমিউনিকেশন আর ডাইরেকশন ইণ্ডিকেটরগুলো ভাঙলো সে। সাবধানের মার নেই, তাই ফুয়েল বিসর্জন দেয়ার কাজ-টাও শান্তভাবে সারলো। হাতঘড়ি দেখলো, প্লেনে আর আট মিনিট আছে সে। ট্র্যাপডোর গলে হেল হোল-এ নেমে এলো, বিড়বিড় করে গান গাইছে নাকি কলমা পড়ছে সে-ই জানে। মোটা ইলাস্টিকের সোলসহ ফ্রেঞ্চ প্যারাবুট জোড়া আগেই পরে নিয়েছে। ডাফ্ল্ ব্যাগ থেকে একটা জাম্পস্যুট বের করে ব্যস্ততার সাথে পরে ফেললো, স্কি মাস্ক আর স্টকিং ক্যাপ পরার পর মাথায় আর হেলমেট পরার সুযোগ থাকলো না। ব্যাগ থেকে এরপর বেরুলো দস্তানা, গগলস আর একটা অলটিমিটার, শেষেরটা কব্জির সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে নিলো। প্যারা-স্যুটের প্রধান অংশটা কোমরের কাছে থাকলো, বাকিটুকু থাকলো শোল্ডার ব্লেডের ওপর। তৈরি হয়ে নিয়ে আবার হাতঘড়ির দিকে তাকালো সে।

এক মিনিট বিশ সেকেণ্ড।

এস্কেপ ডোর খুললো সে। সগর্জনে বাতাস ঢুকলো হেল হোলে।

সেকেণ্ডের কাঁটার ওপর চোখ রেখে কাউণ্ট ডাউন শুরু করলো সে।

…পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক, শূন্য। সরু ফাঁকটা দিয়ে লাফ দিলো সে, পা জোড়া সামনে, বিমান যেদিকে ছুটছে সেদিকে মুখ। বাতাসের ঘূর্ণি ধেয়ে আসা বরফ ধসের মতো আঘাত করলো মুখে, ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিলো ফুসফুসের সমস্ত বাতাস। কানের পর্দা ফাটানো গর্জন তুলে এগিয়ে গেল প্লেনটা। পরমুহূর্তে হালকা হয়ে গেল শরীর, দীর্ঘ পতন শুরু হয়ে গেছে।

ব্যাঙের মতো হাত-পা ছড়িয়ে নামছে দাউদ, নিচে ঘোর অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না। সবচেয়ে খারাপ যেটা ঘটতে পারে সেটাই আন্দাজ করে নিলো সে। সঠিক জায়গায় পৌঁছুতে ব্যর্থ হয়েছে তার সহকারীরা! অন্ধকারে নির্দিষ্ট টার্গেট এলাকা না থাকায় বাতাস কতোদূরে বা কোন্ দিকে তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বোঝার কোন উপায় নেই। নির্ধারিত জায়গা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে গিয়ে পড়তে পারে সে, পড়তে পারে চোখা কোনো বরফের মাথায়, কিংবা সরু কোনো গভীর ফাটলের ভেতর। কেউ হয়তো তাকে খুঁজেই পাবে না কোনোদিন।

দশ সেকেণ্ডে প্রায় তিন শো ষাট মিটার নেমেছে। আলোকিত অলটিমিটারের ডায়ালে কাঁটাটা লাল ঘরে পৌঁছুতে যাচ্ছে। আর তো দেরি করা যায় না। একটা পাউচ থেকে পাইলট শূট-টা বের করে বাতাসে ছুঁড়ে দিলো সে। আকাশে নোঙর ফেললো সেটা, মেইন প্যারাস্যুটটাকে টেনে খুলে ফেললো। হাত-পা ছড়ানো ব্যাঙের আকৃতি বদলে গেল, খাড়াভাবে নামছে এখন দাউদ।

হঠাৎ করে আলোর ছোট্ট একটা বৃত্ত তার ডান দিকে মাইলখানেক দূরে পিট পিট করে উঠলো। তারপর আকাশে উঠে এলো একটা

ফ্লেয়ার, স্থির হয়ে ঝুলে থাকলো বেশ কয়েক সেকেণ্ড। বাতাসের গতি আর দিক বোঝার সুযোগ হলো তার। ডান দিকের স্টিয়ারিং টগ্ল্ টেনে আলোটার দিকে নামতে শুরু করলো সে।

আকাশে আরেকটা ফ্লেয়ার উঠলো। মাটির কাছাকাছি বাতাস স্থির হয়ে আছে। এতোক্ষণে সহকারীদের পরিষ্কার দেখতে পেলো সে। আলোর এক জোড়া সরল রেখা তৈরি করেছে ওরা, আগে দেখা বৃত্ত-টার দিকে চলে গেছে! স্টিয়ারিং টগ্ল্ টেনে একশো আশি ডিগ্রী বাঁক নিলো দাউদ। মাটিতে নামার প্রস্তুতি শেষ করলো। তার সহ-কারীরা জায়গাটা ভালোই বেছেছে। নরম তুন্দ্রায় পা দিয়ে পড়লো সে, বৃত্তের ঠিক মাঝখানে, খাড়াভাবে। কথা না বলে স্ট্র্যাপগুলো খুললো সে, চোখ ধাঁধানো আলোর মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসে মুখ তুললো আকাশে।

আকাশছোঁয়া হিমবাহের দিকে ছুটে চলেছে প্লেনটা। কি ঘটতে যাচ্ছে সে-সম্পর্কে আরোহী বা ক্রুদের কারো কোনো ধারণা নেই। হিমবাহ আর ধাতব মেশিনের মাঝখানের দূরত্ব দ্রুত ক্রমে আসছে।

নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলো দাউদ। জেট এঞ্জিনের আওয়াজ ক্রমশ মিলিয়ে গেল দূরে। কালো রাতের সাথে মিশে অদৃশ্য হয়ে গেল নেভিগেশন লাইট।

গ্যালির পিছনে মাথাটা একদিকে কাত করলো একজন অ্যাটেনড্যাণ্ট। 'ককপিটে কিসের আওয়াজ বলো তো ? শুনতে পাচ্ছো ?'

হাতের কাজ ফেলে প্লেনের নাকের দিকে ঘুরলো চীফ স্টুয়ার্ড। ভোঁতা, অবিচ্ছিন্ন গর্জনের মতো একটা আওয়াজ, যেন কাছে পিঠে কোথাও সবেগে পানি ঢুকছে।

আল দাউদ প্লেন ত্যাগ করার দশ সেকেণ্ড পর অ্যাকটিউয়েটর সেটের টাইমার হাইড্রলিক আর্ম-টাকে সচল করে তুললো। বন্ধ হয়ে গেল হেল হোলের হ্যাচ, সেই সাথে থেমে গেল শব্দটাও।

'কই, আর তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না।'

'কিসের শব্দ ছিলো ওটা?'

'কি জানি। আগে কখনো শুনিনি। একবার মনে হলো, প্রেশার লিক কিনা-।'

অ্যাটেনড্যাণ্ট তার কাঁধ ছোঁয়া সোনালি চুল নেড়ে মেইন কেবিনের দিকে এগোলো। 'তুমি বরং ক্যাপটেনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।'

চীফ স্টুয়ার্ড ইতস্তত করতে লাগলো। জরুরী কোনো ব্যাপার না হলে ক্যাপটেন তাঁকে বিরক্ত করতে নিষেধ করেছেন। তবে, ভাবলো সে, আগে তাকে প্লেন আর আরোহীদের নিরাপত্তার দিকটা দেখতে হবে। ইন্টারকম ফোনের রিসিভার কানে তুললো সে, চাপ দিলো বোতামে। 'ক্যাপটেন, চীফ স্টুয়ার্ড বলছি। মেইন কেবিনের সামনে থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ শুনলাম আমরা। ওখানে কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে?'

কোনো জবাব এলো না। তিনবার চেষ্টা করার পরও সাড়া না পেয়ে দিশেহারা বোধ করলো চীফ স্টুয়ার্ড, বারো বছরের চাকরিতে এটা তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন একটা অভিজ্ঞতা। কি করবে ভাবছে, এই সময় প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো ফ্লাইট অ্যাটেনড্যাণ্ট, কি যেন বললো তাকে। প্রথমে কান দেয়নি তার কথায়, তারপর ঝট্ করে তার দিকে ঘুরলো চীফ স্টুয়ার্ড। 'কি বললে?'

'আমাদের নিচে মাটি।'

'মাটি?'

'সরাসরি আমাদের নিচে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো মেয়েটা, চোখ পিটপিট করছে। 'একজন আরোহী আমাকে দেখালো।'

মাথা নাড়লো চীফ স্টুয়ার্ড। 'অসম্ভব। সমুদ্রের মাঝখানে থাকার কথা আমাদের। সম্ভবত ফিশিং বোটের আলো দেখেছে সে। আবহাওয়া সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে, ক্যাপটেন বলেছেন...।'

'বিশ্বাস না হয় নিজেই দেখো না!' তাকে থামিয়ে দিয়ে আবেদনের সুরে বললো অ্যাটেনড্যাণ্ট। 'নিচের মাটি দ্রুত উঠে আসছে। আমরা বোধহয় ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছি।'

গ্যালির একটা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো চীফ স্টুয়ার্ড, নিচে তাকালো। আটলান্টিকের কালো পানির বদলে সাদা একটা উজ্জ্বল ভাব দেখতে পেলো সে। প্লেনের নিচে বরফের বিশাল একটা বিস্তৃতি পিছন দিকে ছুটে যাচ্ছে, খুব বেশি হলে দুশো চল্লিশ মিটার নিচে, নেভিগেশন লাইটের প্রতিফলন পরিষ্কার দেখা গেল। আঁতকে উঠলো চীফ স্টুয়ার্ড, ঘুরে উঠলো মাথাটা। এটা যদি ইমার্জেন্সী ল্যাণ্ডিং হয়, ক্যাপটেন মেইন কেবিনের ক্রুদের জানাননি কেন? সিট বেল্ট বাঁধার বা ধূমপান না করার নির্দেশ দেননি কেন? হতভম্ব চেহারা নিয়ে অ্যাটেনড্যাণ্টের দিকে ফিরলো সে। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

জাতিসংঘের প্রায় সব আরোহীই জেগে রয়েছে, পত্র-পত্রিকা পড়ছে বা কথা বলছে। ঘুমোচ্ছেন একা শুধু উম্মে সালিহা। মেক্সিকো সরকারের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি, অর্থনৈতিক সেমিনার শেষ করে বিশ্বব্যাংকের হেডকোয়ার্টারে ফিরছে, প্লেনের লেজে একটা টেবিলে জড়ো হয়েছে তারা সবাই। প্রতিনিধিদলের নেতা, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব, নিচু গলায় কথা বলছেন, থমথম করছে তাঁর চেহারা। মেক্সিকোর অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, গোটা দেশ দেউলিয়া হতে আর

বেশি দেরি নেই, অথচ আর্থিক সহায়তা লাভেরও কোনো আশা কেউ তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না।

ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্ট রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো, 'ইমার্জেন্সী প্রসিডিউর শুরু করা উচিত নয়?'

'আরোহীদের কিছু জানিয়ো না। অন্তত এখুনি নয়। আগে আমাকে ক্যাপটেনের সাথে যোগাযোগ করতে দাও।'

'কিন্তু তার কি সময় আছে?'

'জা-জানি না।' নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে মেইন কেবিন ধরে হন হন করে এগোলো চীফ স্টুয়ার্ড, আরোহীদের কিছু বুঝতে না দেয়ার জন্যে মুখের সামনে একটা হাত রেখে হাই তুললো। সামনের পর্দাটা হ্যাচকা টানে সরিয়ে ককপিটের দরজার সামনে থামলো সে, হাতল ধরে মোচড় দিলো। ভেতর থেকে তালা মারা।

নক করলো সে। তারপর ঘুসি মারলো। কোনো সাড়া নেই। ক্যাপটেনকে নিয়ে তিনজন রয়েছে ভেতরে, কি করছে তারা? মরিয়া হয়ে দরজার গায়ে লাথি মারলো সে। দরজার কবাট হালকা বোর্ড দিয়ে তৈরি, বাইরের দিকে খোলে। দ্বিতীয় লাথিতে সেটা ভেঙে গেল। দোরগোড়া টপকে ভেতরে ঢুকলো চীফ স্টুয়ার্ড। ঢুকেই পাথর হয়ে গেল।

অবিশ্বাস, বিস্ময়, ভয় ও আতংক, বাঁধ ভাঙা পানির মতো একযোগে সবগুলো অনুভূতি গ্রাস করে ফেললো তাকে। ক্রুদের একজন মেঝেতে পড়ে আছে, আরেকজন তার প্যানেলে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে। ক্যাপটেন বব রিচার্ডসন অদৃশ্য। ডিক হার্টকে টপকাতে গিয়ে তার গায়ে হোঁচট খেলো চীফ স্টুয়ার্ড, খালি পাইলটের সিটের ওপর ঝুঁকে উইণ্ডশীল্ড দিয়ে বাইরে তাকালো।

প্লেনের নাকের সামনে বিপুল বিস্তার নিয়ে ঝুলে রয়েছে হফ্স্জো-কাল গ্লেসিয়ারের চূড়া, খুব বেশি হলে মাইল দশেক দূরে। তারার আলোয় সবুজাভ দেখালো বরফের গা। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আতংকে দিশেহারা বোধ করলো স্টুয়ার্ড। প্লেন কিভাবে চালাতে হয় সে-সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তার, তবু পাইলটের সিটে বসে কণ্ট্রোল কলামটাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরলো সে। নিজের কথা ভাবছে না, কিন্তু আরোহীদের বাঁচানোর শেষ একটা চেষ্টা তো করতেই হবে। হুইলটাকে নিজের বুকের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করলো সে।

কিছুই ঘটলো না।

কলাম ঢিল হতে চাইছে না অথচ আশ্চর্য, অলটিমিটারে দেখা গেল প্লেন ধীরে ধীরে হলেও ওপর দিকে উঠছে। আবার হুইলটা নিজের দিকে টানলো সে, এবার আরো জোরে। সামান্য একটু কাছে এলো। দৃঢ় চাপ অনুভব করে বিস্মিত হলো সে। তার চিন্তাশক্তি স্বাভাবিক নিয়মে কাজ করছে না। অভিজ্ঞতা এতোই কম যে বুঝতে পারছে না অটো-মেটিক পাইলটের ওপর আসুরিক শক্তি খাটাচ্ছে সে, যেখানে মাত্র পঁচিশ পাউণ্ড চাপ-ই ওটাকে নত করতে পারে।

স্বচ্ছ ঠাণ্ডা বাতাসে গ্লেসিয়ারটাকে এতো কাছে মনে হলো যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। থ্রটল সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে কলাম-টাকে আবার কাছে টানলো সে। থেমে থেমে, জেদ আর অনিচ্ছার ভাব নিয়ে, কাছে এলো বটে, কিন্তু আবার পিছিয়ে গেল খানিকটা। যেন যন্ত্রণাকাতর মন্থরতার সাথে ওপর দিকে নাক তুললো প্লেন, বরফ আর তুষার ঢাকা চূড়াটাকে টপকালো মাত্র একশো মিটার ওপর দিয়ে।

*

আসল বব রিচার্ডসনকে তার লণ্ডন ফ্ল্যাটে খুন করেছে আল দাউদ। ছদ্মবেশ নেয়ার ব্যাপারে সে একজন জাদুকর, বেচারা বব রিচার্ডসনের ফ্ল্যাটে বসেই চেহারা বদলে নিয়েছে। এই মুহূর্তে বরফের রাজ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, চোখে একজোড়া নাইট গ্লাস তুলে তাকিয়ে রয়েছে দূরে। সুমেরুপ্রভা ম্লান হয়ে এলেও আকাশের গায়ে হফ্‌স্‌-জোকালের কিনারাগুলো এখনো ঠাহর করা যায়।

উত্তেজনা আর প্রত্যাশায় টান টান হয়ে আছে পরিবেশ। দু'জন টেকনিশিয়ান আলো আর ট্র্যান্সমিটার বীকন তুলে একটা হেলিক-প্টারে ভরছে বটে, কিন্তু তারাও ঢালের ওপর দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে গ্লেসিয়ারের চূড়ার দিকে। পাথুরে মূর্তির মতো স্থির হয়ে রয়েছে আল দাউদ, এক দুই করে সেকেণ্ড গুণছে, আশা যে-কোনো মুহূর্তে আগুনের বিস্ফোরণ দেখতে পাবে। কিন্তু কিছুই ঘটলো না।

চোখ থেকে বিনোকিউলার নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। গ্লেসি-য়ারের নিস্তব্ধতা চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো তাকে, ঠাণ্ডা আর নির্বিকার। মাথার কাঁচা-পাকা পরচুলা খুলে বরফের ওপর ছুঁড়ে মারলো সে। বুট জোড়া খুললো, বুটের ভেতর থেকে বের করলো শক্ত মোটা স্পঞ্জ, দৈর্ঘ্য বাড়াবার জন্যে ব্যবহার করতে হয়েছিল। সচেতন, পাশে তার অন্ধভক্ত বন্ধু এখলাস দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'আশ্চর্য মেকআপ, আল দাউদ, আপনাকে চেনাই যাচ্ছিলো না।' লম্বা সে, রোগাটে, পাকানো রশির মতো শরীর, মাথায় বাবরি।

'ইকুইপমেন্ট সব তোলা হয়েছে?'

'জ্বী। আমাদের মিশন কি সাকসেসফুল, আল দাউদ?'

'হিসেবে ছোট্ট একটা ভুল হয়েছে। যেভাবেই হোক চূড়া টপকে

বেরিয়ে গেছে প্লেন। মহান করুণাময় আল্লাহ্ উম্মে সালিহাকে আরো কয়েক মিনিট হায়াৎ দরাজ করেছেন।'

'আল দাউদ, সভয়ে বলছি, মোস্তফা কামাল কিন্তু মোটেও খুশি হবেন না।'

'প্ল্যান মোতাবেকই মারা যাবে উম্মে সালিহা,' আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো দাউদ। 'আমার কাজে কোনো ফাঁক থাকে না।'

'কিন্তু প্লেনটা যে এখনো উড়ছে!'

'এমনকি আল্লাহও ওটাকে অনন্তকাল আকাশে রাখতে পারবেন না।'

'আল্লাহর ব্যর্থতা নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে,' নতুন একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আগে ব্যাখ্যা করো তুমি কেন ব্যর্থ হলে?' চাপা, ক্রুদ্ধ গর্জনের মতো শোনালো কথাগুলো।

ঝট্ করে ঘুরলো দাউদ, আবু সুফিয়ানকে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার পিত্তি জ্বলে গেল। শিশুসুলভ নিরীহ ভাব ফুটে আছে প্রায় গোল চেহারায়। কালো মুক্তোর মতো একজোড়া চোখ। শুধু ঘন ভুরু জোড়া একজন পেশাদার খুনীর চেহারাতেই যেন বেশি মানায়। দৃষ্টি কেমন যেন আচ্ছন্ন, যেন শুধু ছুঁয়ে যায়, গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। দাউদের জানা আছে, এ লোক সহজে খুন করতে ভালোবাসে, কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে যেতে চায় না, জানে না হত্যাকাণ্ডকে শিল্পের পর্যায়ে তোলা সম্ভব। সে আরো জানে, আবু সুফিয়ানের বিরক্তিকর উপস্থিতি না মেনে নিয়ে তার কোনো উপায় নেই। কায়রো শহরের একজন মোল্লা সে, দাউদের ঘাড়ে প্রায় জোর করে তাকে চাপিয়ে দিয়েছে মোস্তফা কামাল। গোঁড়া মৌলবাদী আবু সুফিয়ানকে বড় বেশি পছন্দ আর বিশ্বাস করে সে। অবিশ্বাস না করলেও, দাউদকে

নিয়ে চিন্তিত মনে হয় তাকে। দাউদ মৌলবাদী রাজনৈতিক নেতাদের যথাযোগ্য সম্মান দেয় না, তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সব সময় কড়া সমালোচনা করে, ইত্যাদি লক্ষ্য করে সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করেছে সে। সেই সতর্কতারই ফলশ্রুতি আবু সুফিয়ান। তার চোখের সামনে, তার পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হয় দাউদকে। কোনো রকম প্রতিবাদ না করেই আবু সুফিয়ানকে গ্রহণ করেছে দাউদ। ছল চাতুরি তার মজ্জাগত, আবু সুফিয়ান নিজেও জানে না দাউদের পক্ষে তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে সে।

শান্তভাবে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলো দাউদ। 'যান্ত্রিক ব্যাপার, অনেক ধরনের বিচ্যুতি ঘটতে পারে। তবে যা যা ঘটতে পারে সবই ধারণার মধ্যে ছিলো। ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। অটোমেটিক পাইলট মেরুর দিকে একটা কোর্সে লক করা আছে। আকাশ সময় খুব বেশি হলে আর মাত্র নব্বুই মিনিট অবশিষ্ট আছে।'

'কিন্তু তার আগেই যদি ককপিটের লাশগুলো কেউ দেখে ফেলে? আর যদি আরোহীদের মধ্যে কেউ প্লেন চালাতে জানে?' আবু সুফিয়ান নাছোড়বান্দা।

'আরোহীদের ব্যাকগ্রাউণ্ড স্টাডি করা হয়েছে। প্লেন চালানোর অভিজ্ঞতা কারো নেই। তাছাড়া, রেডিও আর নেভিগেশন ইনস্ট্রুমেণ্ট চুরমার করে দিয়েছি আমি। কেউ যদি প্লেনটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে চায়, কোথায় আছে বা কোথায় যাচ্ছে কিছুই টের পাবে না। চিরকালের জন্যে আর্কটিক সাগরে হারিয়ে যাবে উম্মে সালিহা আর তার জাতিসংঘের হোমরাচোমরা শয্যাসঙ্গীরা।'

'বলতে চাইছো ওদের বাঁচার কোনো উপায়ই নেই?'

'নেই,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো দাউদ। 'একেবারেই নেই।'

পাঁচ

একটা সুইভেলচেয়ারে পেশী ঢিল করে দিয়ে বসে আছে মাসুদ রানা, কোমরে হাত রেখে পা ছুটো লম্বা করে দেয়ায় আকৃতিটা দেখতে হয়েছে ঠিক একটা প্লেনের মতো। মস্ত একটা হাই তুললো, কালো চুলে আঙুল চালালো বার কয়েক।

একহারা গড়ন ওর, সুঠাম শক্ত পেশী। রোজ দশ মাইল দৌড়ে বা নিয়মিত মুগুর ভেঁজে যারা স্বাস্থ্য তৈরির জন্যে গলদঘর্ম হয় তাদের দলে পড়ে না ও। বছরের বেশিরভাগটা ঘরের বাইরে থাকে, ঘুরে বেড়ায় পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল আর মরুভূমিতে, রোদে পুড়ে অনেককাল আগেই তামাটে হয়ে গেছে গায়ের চামড়া। কালো চোখ ছুটো মায়াময়, কিন্তু ঠোঁটের কোণে উঁকি দেয় নিষ্ঠুর একটা ভাব ; অথচ মুখের চেহারা হাসিখুশি।

জীবনযাপনে আশ্চর্য একটা সাবলীল ভঙ্গি আছে রানার, হীনমন্যতায় ভোগে না কখনো, যে-কোনো পরিবেশে বা ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে সপ্রতিভ ও সহজ হতে পারে। অভিজাত আর প্রভাবশালী মহলে অবাধ যাতায়াত ওর। যে-কোনো বিষয়ে, সংশ্লিষ্ট পাত্র বা পাত্রী যদি

কঠিন হয়, তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে ও। একটা কিছু অর্জন করার জন্যে কাউকে যুদ্ধ বা সংগ্রাম করতে দেখলে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ে। রোমাঞ্চ আর চ্যালেঞ্জ, ওর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটো দুর্বলতা।

ওর সবচেয়ে বড় যে পরিচয়, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম সেরা এজেন্ট ও। দেশপ্রেম আর রোমাঞ্চের হাতছানি এই পেশায় ধরে রেখেছে ওকে। আরো অনেক পরিচয় আছে ওর। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের সদস্য। যুক্তরাষ্ট্রের আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি (নুমা)-র স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর (অনারারি)। রাশিয়ার সী রিসার্চ অ্যাণ্ড মেরিন একাডেমীর সদস্য (আনঅফিশিয়ালি)। এরকম আরো অনেক।

নুমায় ওর বন্ধু হলো বেন নেলসন, আর রাহাত খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন হলেন ওর গুণমুগ্ধ শুভানুধ্যায়ী। নুমা পরিচালিত অনেক সমুদ্র-অভিযানে ছুটি কাটানোর অবসরে অংশগ্রহণ করেছে রানা, ওদের সাথে এমন কোনো সাগর বা মহাসাগর নেই যেখানে যাবার সুযোগ ঘটেনি ওর। নানা কারণেই নুমা আর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের প্রতি কৃতজ্ঞ ও। তবে রানা হলো সেই প্রকৃতির মানুষ যে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকাটা পছন্দ করে না, বিনিময়ে উপকার করে ঋণমুক্ত হতে চায়। এমন বহু দৃষ্টান্ত রেখেছে সে অতীতে।

এবারও অনেকটা সেই ঋণমুক্ত হবার তাড়না থেকেই জর্জ হ্যামিলটনের অনুরোধে সাড়া দিয়ে নুমার একটা অনুসন্ধানী অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে রানা।

'তুমি বোধহয় এটা দেখতে চাইবে,' কামরার আরেক প্রান্ত থেকে বললো বেন নেলসন।

কালার ভিডিও মনিটরের ওপর আরো কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো রানা। সার্ভে শিপ আইসব্রেকার শারলকে রয়েছে ওরা। খোলের একশো মিটার নিচের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে ও। শারলক ভোঁতা চেহারার বিশাল জাহাজ, বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে বরফবহুল পানিতে চলার জন্যে। বাক্স আকৃতির প্রকাণ্ড সুপারস্ট্রাকচার পাঁচ তলা অফিস ভবনের মতো দেখতে। জাহাজটাকে চালায় আশি হাজার ঘোড়া-র এঞ্জিন। দেড় মিটার পুরু বরফ ভেঙে অনায়াসে এগোতে পারে।

'মনে হচ্ছে যেন একটা গর্ত এগিয়ে আসছে।' সামনে একটা কনসোল নিয়ে বসে রয়েছে বেন নেলসন, সোনার রেকর্ডার স্টাডি করছে। সব কিছু মিলিয়ে তার চেহারাটা বুলডোজারের কাছাকাছি। আদি নিবাস ইটালিতে, তার চোদ্দ পুরুষ কেউ মাফিয়াদের সাথে হাত মেলায়নি। বেন নেলসন তিন পুরুষ ধরে আমেরিকান। একটা কানে দুল পরে সে। শুধু বন্ধু নয়, অনেকক্ষেত্রেই রানার বীমা পলিসি হিসেবে কাজ করে সে।

একটা কাউন্টারে পা ঠেকালো রানা, ভাঁজ করা হাঁটু সমান করলো সজোরে, সুইভেল চেয়ারটা ঘুরলো, সেইসাথে চাকাগুলো গড়াতে শুরু করে বেন নেলসনের পাশে পৌঁছে দিলো ওকে। কমপিউটরের সাহায্য পাওয়া সোনোগ্রাফ-এর দিকে তাকিয়ে থাকলো ও, উঁচু কিনারা নিয়ে সত্যি একটা গর্ত ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে। এক সময় অন্ধকার গভীর গর্তের ভেতরটারও আভাস পাওয়া গেল। পাশ থেকে বেন নেলসন মন্তব্য করলো, 'ঝপ করে নেমে গেছে খাদটা।'

চট করে একবার ইকো সাউণ্ডারের ওপর চোখ বুলালো রানা। 'একশো চল্লিশ থেকে একবারেই একশো আশি মিটার।'

'অথচ কিনারা থেকে বাইরের কোনো দিকে ঢাল নেই।'

'দুশো মিটার, এখনো তল দেখা যাচ্ছে না।'

'যদি আগ্নেয়গিরি হয়, স্বীকার করতে হবে আকৃতিটা অদ্ভুত। লাভা পাথরের কোনো চিহ্ন নেই।'

জন ম্যাকেঞ্জি, সার্ভে ভেসেলের কমাণ্ডার, দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিলেন। লালমুখো একটা গরিলাই বলা যায় তাঁকে। রানা আর বেন নেলসন বাদে গোটা জাহাজে তিনিই শুধু ইলেকট্রনিক্স কমপার্টমেন্টে ঢুকতে পারেন। 'রাত জাগা পাখিদের কিছু দরকার থাকলে বলতে পারে।' হাসছেন তিনি।

'কফি। ধন্যবাদ, কমাণ্ডার,' বললো রানা, মাথাটা টেনে নিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন জন ম্যাকেঞ্জি।

সোনোগ্রাফে চোখ রেখে আকৃতিটাকে বড় হতে দেখলো নেলসন। 'ডায়ামিটারে প্রায় দু'কিলোমিটার।'

'তলাটা সমতল,' বললো রানা।

'নিশ্চয়ই প্রকাণ্ড একটা আগ্নেয়গিরি ছিলো এক সময়...।'

'উঁহুঁ, তা নয়।'

রানার দিকে অদ্ভুতদৃষ্টিতে তাকালো নেলসন। 'তাহলে?'

'উল্কার আঘাত হতে পারে না?'

চেহারায় সন্দেহ নিয়ে চিন্তা করলো নেলসন। 'সাগরের এতো গভীরে উল্কার আঘাতে এই প্রকাণ্ড গর্ত তৈরি হতে পারে?'

'হয়তো কয়েক হাজার বা কয়েক মিলিয়ন বছর আগে পড়েছিল, যখন সী লেভেল অনেক নিচু ছিলো।'

'তোমার এরকম ভাবার কারণ ?'

'কারণ তিনটে,' বললো রানা। 'গর্তের মুখটা বড় বেশি নিখুঁত, উঁচু-নিচু নয়। বাইরের দিকে কোনো ঢাল নেই। আর, ম্যাগনেটো-মিটারের দিকে তাকিয়ে দেখো কাঁটাটা কেমন লাফাচ্ছে, তারমানে নিচে যথেষ্ট লোহা রয়েছে।'

হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল নেলসন। 'আমরা একটা টার্গেট পেয়েছি।'

'কোন দিকে ?'

'স্টারবোর্ড সাইডে, দুশো মিটার দূরে। গর্তের ভেতর দিকের ঢালে খাড়াভাবে রয়েছে। রিডিং খুবই আবছা। জিনিসটাকে আংশিক আড়াল করে রেখেছে জিওলজি। কমাণ্ডারকে খবরটা দাও। ভিডিও ক্যামেরা কি বলে ?'

মনিটরগুলোর দিকে তাকালো রানা। 'রেঞ্জের মধ্যে পাচ্ছে না। পরের বার পাশ কাটানোর সময় পাবে।'

'দ্বিতীয়বার পাশ কাটালে রাশিয়ানরা সন্দেহ করবে না ?'

রাশিয়ানরা কিছু সন্দেহ করলে খুশি হয় রানা, কিন্তু নিজে থেকে এমন কিছু করবে না বা করার পরামর্শ দেবে না যার অর্থ দাঁড়ায় নুমার সাথে বেঈমানী। ফোনের রিসিভার তুলে কমাণ্ডার ম্যাকেঞ্জিকে ডাকলো ও। সিদ্ধান্ত যা নেয়ার তিনিই নেবেন। তবে ওর একটা প্রশ্ন আছে।

রেকর্ডিং পেপারে সোনার ইমেজ এলো আবছা। নানা ধরনের পদার্থে আড়াল করা একটা দাগ মাত্র। তারপর এলো কমপিউটর ইমেজ, অনেকটা পরিষ্কার ও বিশদ বিবরণসহ। ইমেজটা ফোটানো হলো কালার ভিডিও মনিটরে। এতোক্ষণে একটা প্রায় স্পষ্ট আকৃতি পাওয়া গেল। বোতাম টিপে আকৃতিটাকে আরো বড় করলো রানা স্ক্রীনে।

টার্গেটের চারদিকে আপনাআপনি একটা চতুষ্কোণ তৈরি হলো, ফলে আরো পরিষ্কারভাবে ধরা পড়লো জিনিসটার ধাঁচ আর আকৃতি। একই সময়ে আরেকটা মেশিন থেকে বেরিয়ে এলো রঙিন আকৃতি।

হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকলেন কমাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি। দিনের পর দিন গোটা এলাকা চষে ফেলেছে শারলক, নিখোঁজ রাশিয়ান সাবমেরিনের কোনো সন্ধান না পাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন ভদ্রলোক, রানার আকস্মিক ডাক পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। 'পেয়েছো? টার্গেট পেয়েছো?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলেন তিনি।

রানা বা নেলসন, দু'জনের কেউই জবাব দিলো না, নিঃশব্দে হাসতে লাগলো। হঠাৎ বুঝতে পারলেন কমাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি।

'গুড গড! সত্যি আমরা পেয়েছি ওটাকে?'

'বিশাল এক গর্তের ভেতর লুকিয়ে আছে,' কমাণ্ডারের হাতে একটা ফটো ধরিয়ে দিয়ে মনিটরের দিকে ইঙ্গিত করলো রানা। 'আলফা-ক্লাস সোভিয়েত সাবমেরিনের নিখুঁত একটা ইমেজ।'

ফটো আর সোনার ইমেজের ওপর চোখ বুলিয়ে মুখ তুললেন জন ম্যাকেঞ্জি। 'সাগরের এদিকটা কোথাও খুঁজতে বাকি রাখেনি রাশিয়ানরা। পায়নি কেন?'

'না পাওয়ার কারণ আছে,' বললো রানা। 'ওরা যখন খোঁজ করে তখন বরফের স্তর অনেক মোটা ছিলো। পাশাপাশি সরল রেখা তৈরি করে আসা-যাওয়া করতে পারেনি ওদের জাহাজগুলো। ওদের সোনার বীম শুধু ছায়া দেখাতে পেরেছে। তাছাড়া গর্তের তলায় প্রচুর লোহা থাকায়...।'

'আমাদের ইন্টেলিজেন্স খবর পাওয়া মাত্র ধেই ধেই করে নাচবে।'

'অথচ খবরটা আগে পাওয়া উচিত রাশিয়ানদের,' মৃদু কণ্ঠে বললো

রানা। 'ওদেরকেও তো জানাবেন, নাকি?'

'অবশ্যই জানাবো,' বললেন জন ম্যাকেঞ্জি। 'বিশেষ করে পুব ইউরোপের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রাশিয়া বাধা হয়ে না দাঁড়ানোয়, আমরা আমেরিকানরা, ওদের প্রতি ভারি খুশি। জানাবো, তবে খানিক দেরি করে। ওদের আলফা-ক্লাস সাবমেরিন আনকোরা নতুন, এতো ভালো জিনিস একটাও নেই আমাদের। নেড়েচেড়ে দেখে নিই আগে, তারপর ওদের জিনিস ওদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে বলবো।'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করলো রানা, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'আপনার খুশি।' উত্তর শুনে সন্তুষ্ট বোধ করছে ও। অনুসন্ধান কর্ম-সূচীতে রানাকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ খোদ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন জানালেও, এ-বিষয়ে ওর সাথে কোনো কথা হয়নি তাঁর। রানাকে শুধু তিনি জানান, রাশিয়ানদের নিখোঁজ একটা সাবমেরিন খুঁজে পাবার চেষ্টা করা হবে। 'তবে, একটা ব্যাপার। দ্বিতীয়বার পাশ না কাটালে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারবো না ওটা সত্যি একটা সাবমেরিন কিনা। তা করলে রাশিয়ানরা অবশ্যই সন্দেহ করবে। জানা কথা, আমাদের ওপর নজর রাখছে ওরা।'

চিন্তিত হয়ে পড়লেন জন ম্যাকেঞ্জি। 'কি করা যায় বলো তো?'

সমাধানটা আগেই ওর মাথায় এসেছে, মুচকি হেসে রানা বললো, 'ব্রিজে ফোন করুন। জানান, ইকুইপমেন্টে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে গর্তের ওপর দিয়ে যেমন যাচ্ছে তেমনি যেতে থাকুক শারলক। ব্রিজকে আরো জানান, যান্ত্রিক ত্রুটি দূর হলে একই পথে আবার ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হবে। তারপর রেডিওতে ওয়াশিংটনের এঞ্জিনিয়ারদের জানান, ইকুইপমেন্ট ঠিকমতো কাজ

করছে না বলে অনুসন্ধান স্থগিত রাখা হয়েছে। রাখাও হবে তাই। আমরা অনুসন্ধান চালাচ্ছি না দেখে রাশিয়ানরা হতাশ হবে, হপ্তা-খানেক অপেক্ষা করার পর এলাকা ছেড়ে চলে যাবে ওরা।'

'হ্যাঁ, বিশ্বাসযোগ্য হবে ব্যাপারটা, টোপটা ওরা গিলতে পারে। ওয়াশিংটনে পাঠানো আমাদের মেসেজ অবশ্যই শুনতে পাবে রাশিয়ানরা।' রানার সাথে করমর্দন করলেন তিনি। 'ধন্যবাদ, রানা।'

গর্ত ছাড়িয়ে খানিক দূরে চলে এলো শারলক। ব্রিজকে জানানো হলো, যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামত করা গেছে, ফিরতি পথে চলো।

জাহাজ ঘুরে গেল। পানিতে ডুবে থাকা রোবট, নাম এসেক্স, একজোড়া মুভি ক্যামেরা আর একটা স্টীল ক্যামেরার সাহায্যে ছবি পাঠাতে শুরু করলো। আবার গর্তের কিনারায় ফিরে এসেছে ওরা। গভীর তলদেশের ফটো দেখতে পাচ্ছে। ''ওই যে, আবার আসছে ওটা।' ফিসফিস করে বললো নেলসন।

সোনোগ্রাফের পোর্টসাইড প্রায় সবটুকু দখল করে রেখেছে রাশিয়ান সাবমেরিন। গর্তের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে ওটা, প্রায় খাড়া অবস্থায়, গর্তের মুখের দিকে বো। তবে অক্ষত। নিখোঁজ হবার পর দশ মাস পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনো ওটার গায়ে শ্যাওলা বা মরচে ধরেনি। 'আলফা-ক্লাস যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' বিড়বিড় করে বললেন জন ম্যাকেঞ্জি। 'পারমাণবিক শক্তিচালিত, খোলটা টাইটানিয়ামে তৈরি, লবণাক্ত পানিতে মরচে ধরে না, ননম্যাগনেটিক।'

'সাথে লেটেস্ট সাইলেন্ট-প্রপেলার টেকনোলজি-ও আছে,' বললো নেলসন। 'ওটার মতো দ্রুতগামী সাবমেরিন আর নেই কোথাও।'

সোনার রেকর্ড আর ভিডিও ফটো আগেপিছে আসছে। ঘন ঘন ঘাড় ফেরাচ্ছে ওরা, যেন টেনিস ম্যাচ দেখছে সবাই। ধীরে ধীরে

ক্যামেরার আওতা থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে রাশিয়ান সাবমেরিন। দেড়শো ক্রু নিয়ে ডুবে যাবার পর আজই প্রথম ওটার ওপর কোনো মানুষের চোখ পড়লো, ভাবতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ওরা।

'রেডিও অ্যাকটিভিটির অস্বাভাবিক কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'সামান্য একটু বেড়েছে,' বললো নেলসন। 'সম্ভবত সাবমেরিনের রিয়্যাক্টর থেকে।'

'সাবমেরিনের কিছু গলে যায়নি?'

'রিডিং তাই বলছে।'

'বো-র কিছুটা ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয়,' জন ম্যাকেঞ্জি বললেন, মনিটরগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। 'পোর্ট ডাইভিং প্লেন ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। পোর্ট বটমে গভীর দাগ, প্রায় বিশ মিটার লম্বা।'

'বেশ গভীর,' বললো রানা। 'ব্যালাস্ট ট্যাংক ভেদ করে ইনার প্রেশার-হাল-এ ছুঁয়েছে। গর্তের ভেতর নামার সময় মুখের কোথাও বাড়ি খেয়েছিল।' ক্যামেরার রেঞ্জ থেকে হারিয়ে গেল সাবমেরিনটা।

তারপরও মনিটরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলো ওরা, কারো মুখে কথা নেই, তাকিয়ে আছে সাগরতলের দিকে, ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে স্ক্রীনে। প্রায় আধ মিনিট চুপ করে থাকলো ওরা। তারপর ঢিল পড়লো পেশীতে, যে যার চেয়ারে হেলান দিলো সবাই। রানা আর নেলসনের কাজ বলতে গেলে শেষ হয়েছে। খড়ের গাদার ভেতর একটা সূচ খুঁজে পেয়েছে ওরা। রানাকে নির্লিপ্ত চেহারা নিয়ে সিলিঙের দিকে তাকাতে দেখে নেলসন বুঝতে পারলো কি ভাবছে ও। চ্যালেঞ্জ নেই, কাজেই ভালো লাগাও নেই। এবার অন্য কোথাও, অন্য

কোনোখানে যাবার তাড়না অনুভব করছে দুঃসাহসী লোকটা।

মনিটরের দিকে ফিরলো নেলসন, এক সেকেণ্ড পরই চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'ওটা আবার কি! মোটাসোটা একটা জাগ মনে হচ্ছে না?'

'আরে তাইতো!' বিস্ময় প্রকাশ করলেন কমাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি। 'কি হতে পারে?'

দীর্ঘক্ষণ মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা, চিন্তিত। হঠাৎ করে কুঁচকে উঠলো ভুরু জোড়া। জিনিসটা খাড়া হয়ে রয়েছে। সরু গলার দুইপাশে বেরিয়ে রয়েছে দুটো হাতল, ক্রমশ চওড়া হয়ে গোল আকৃতি পেয়েছে। মুখ খুললো ও, 'ওটা একটা টেরা-কোটা জার, রোমান আর গ্রীকরা ওগুলোয় তেল রাখতো।'

'আমার ধারণা তুমি ঠিকই বলেছো,' মন্তব্য করলেন জন ম্যাকেঞ্জি। 'মদ বা তেল নেয়ার জন্যে গ্রীক আর রোমানরা ব্যবহার করতো ওগুলো। ভূমধ্যসাগরের বহু জায়গায় এ-ধরনের অনেক জার পাওয়া গেছে।'

'ওটা এখানে, গ্রীনল্যাণ্ড সাগরে কি করছে?' জিজ্ঞেস করলো নেলসন। 'ওই যে, আরেকটা উঁকি দিচ্ছে, ছবির বাঁ দিকে।'

তারপর একসাথে আরো তিনটে জার বেরিয়ে গেল ক্যামেরার তলা দিয়ে।

রানার দিকে ফিরলেন জন ম্যাকেঞ্জি। 'তুমি তো বেশ কয়েকটা পুরনো জাহাজ উদ্ধার করেছো, এ ব্যাপারটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?'

উত্তর দেয়ার আগে ঝাড়া দশ সেকেণ্ড চুপ করে থাকলো রানা। যখন কথা বললো, মনে হলো দূর থেকে ভেসে আসছে ওর গলা, 'আমার ধারণা, প্রাচীন কোনো বিধ্বস্ত জাহাজ থেকে এসেছে ওগুলো।

কিন্তু ইতিহাসের বই বলছে জাহাজটার এই এলাকায় আসার কোনো কারণ নেই।'

ছয়

অসম্ভব কাজটা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে নিজের আত্মা বিক্রি করতেও রাজি আছে চীফ স্টুয়ার্ড, ঘামে ভেজা হাত স্টিয়ারিং হুইল থেকে তুলে নিতে চায় সে, ক্লান্ত চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে চায় মৃত্যুকে, কিন্তু আরোহীদের প্রতি তার দায়িত্ববোধ তাকে হাল ছাড়তে দিলো না।

নেভিগেশন ইনস্ট্রুমেন্টের কোনোটাই কাজ করছে না। প্রতিটি কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট অচল। আরোহীদের কেউ জীবনে কখনো প্লেন চালায়নি। ফুয়েল গজের কাঁটা শূন্যের ঘরের কাছে কাঁপছে। দুঃস্বপ্নও বোধহয় এমন ভয়ংকর হয় না।

অনেক প্রশ্ন মাথা কুটছে চীফ স্টুয়ার্ডের মনে। পাইলট কোথায় গেলেন? ফ্লাইট অফিসারদের মৃত্যুর কারণ কি? এই সর্বনাশের পিছনে কার হাত আছে?

একটাই সান্ত্বনা চীফ স্টুয়ার্ডের। সে একা নয়। ককপিটে আরেক লোক তাকে সাহায্য করছে। জিন ডেলাফর্জ, মেক্সিকো প্রতিনিধি

দলের একজন সদস্য, এক সময় তার দেশের এয়ারফোর্সে মেকানিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। মান্ধাতা আমলের একটা প্লেনে কাজ করার পর পেরিয়ে গেছে ত্রিশটা বছর, তবে কো পাইলটের সিটে বসার পর ভুলে যাওয়া কারিগরি জ্ঞান একটু একটু করে মনে পড়লো তার। ইনস্ট্রুমেন্টের রিডিং জানাচ্ছে সে চীফ স্টুয়ার্ডকে, থ্রটলের দায়িত্ব নিয়েছে।

স্যুট পরিহিত জিন ডেলাফর্জ মোটাসোটা মানুষ, গায়ের রঙ তামাটে, মুখটা প্রায় গোল। ককপিটে তাকে একেবারেই বেমানান লাগছে। আশ্চর্য, একটুও ঘাবড়ায়নি সে, কপালে ঘাম ফোটেনি। কোট তো খোলেইনি, এমনকি টাইয়ের নটটা পর্যন্ত ঢিল করেনি। একটা হাত তুলে উইণ্ডশীল্ডের বাইরে, আকাশ দেখালো সে। ‘তারা দেখে যতোটুকু বুঝতে পারছি, উত্তর মেরুর দিকে যাচ্ছি আমরা।’

‘সম্ভবত পুবদিকে রাশিয়ার ওপর দিয়ে,’ থমথমে গলায় বললো চীফ স্টুয়ার্ড। ‘কোর্স বা দিক, কিছুই জানা নেই।’

‘কিন্তু পিছনে ওটা আমরা একটা দ্বীপ ফেলে এসেছি।’

‘গ্রীনল্যাণ্ড হতে পারে?’

মাথা নাড়লো জিন ডেলাফর্জ। ‘গত কয়েক ঘণ্টা আমাদের নিচে পানি রয়েছে। দ্বীপটা গ্রীনল্যাণ্ড হলে এতোক্ষণে আমরা আইসক্যাপের ওপর পৌঁছে যেতাম। আমার ধারণা, আইসল্যাণ্ডকে পেরিয়ে এসেছি।’

‘মাই গড, তাহলে কতোক্ষণ ধরে আমরা উত্তর দিকে যাচ্ছি?’

‘লণ্ডন-নিউ ইয়র্ক কোর্স থেকে ঠিক কখন সরে আসেন পাইলট কে জানে।’

তাৎক্ষণিক মৃত্যু থেকে আরোহীদের প্রায় অলৌকিকভাবে বাঁচানো

সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বিপদ কাটেনি। সামনে উত্তর মেরু—হিমশীতল মৃত্যুফাঁদ। বেপরোয়া মানুষ দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে, চীফ স্টুয়ার্ডও তাই নিলো। 'পোর্টের দিকে নব্বুই ডিগ্রী বাঁক নেবো আমি।'

শান্তভাবে সায় দিলো ডেলাফর্জ। 'আর কোনো উপায় দেখছি না।'

'প্লেন যদি বরফের ওপর আছড়ে পড়ে, দু'একজন বাঁচলেও বাঁচতে পারে। কিন্তু পানিতে পড়ে ডুবে গেলে কারো কোনো আশা নেই। আর যদি মিরাকল ঘটে, অক্ষত অবস্থায় নামাতে পারি প্লেনটাকে, আরোহীরা যে-ধরনের কাপড় পরে আছে, কয়েক মিনিটের বেশি বাঁচবে না কেউ।'

'বোধহয় অনেক দেরি করে ফেলেছি,' মেক্সিকো প্রতিনিধি দলের সদস্য বললো। ইনস্ট্রুমেণ্ট প্যানেলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সে। লাল ফুয়েল ওয়ার্নিং লাইট ঘন ঘন জ্বলছে আর নিভছে। 'আকাশে ভেসে থাকার সময় শেষ হয়েছে আমাদের।'

লাল আলোটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো চীফ স্টুয়ার্ড। তার জানা নেই, দেড় হাজার মিটার ওপরে দুশো নট গতিবেগে বোয়িং প্লেন যে পরিমাণ ফুয়েল হজম করে, সাড়ে দশ হাজার মিটার ওপরে পাঁচ শো নট গতিবেগেও সেই একই পরিমাণ ফুয়েল হজম করে। সে ভাবলো, যা আছে কপালে। 'পশ্চিম দিকে যেতে থাকি, তারপর যেখানে খুশি পড়ুক গে। ঈশ্বর ভরসা।'

হাতের তালু ট্রাউজারের পায়ায় মুছে নিয়ে শক্ত করে কণ্ট্রোল কলাম ধরলো সে। গ্লেসিয়ারের চূড়া টপকাবার পর এই প্রথম আবার প্লেনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিলো। বড় করে একটা শ্বাস টেনে চাপ দিলো 'অটোপাইলট রিলিজ' বোতামে। ধীর ভঙ্গিতে ঘোরাতে শুরু করলো

প্লেন।

প্লেনের নাক আবার সরল একটা কোর্স ধরতেই সে বুঝতে পারলো, কোথাও কোনো গোলযোগ ঘটে গেছে। 'চার নম্বর এঞ্জিনের আর. পি. এম. নামছে,' কেঁপে গেল জিন ডেলাফর্জের গলা। 'ফুয়েলের অভাবে অচল হয়ে যাচ্ছে ওটা।'

'এঞ্জিনটা তাহলে বন্ধ করে দেয়া উচিত নয়?'

'নিয়মটা আমার জানা নেই,' শুকনো গলায় বললো ডেলাফর্জ।

হায় ঈশ্বর, কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করলো চীফ স্টুয়ার্ডের, এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে। অলটিমিটারে দেখা গেল প্লেন বিরতি-হীন নামছে। এয়ারস্পীডও কমতির দিকে। প্লেন আর সাগরের মাঝ-খানে দূরত্ব কমে আসছে দ্রুত। তারপর, হঠাৎ করে, কণ্ট্রোল কলাম হাতের মুঠোর ভেতর নড়বড়ে হয়ে গেল, কাঁপতে লাগলো থরথর করে।

'প্লেন স্টল করছে!' চেঁচিয়ে উঠলো ডেলাফর্জ, এই প্রথম ভয় পেলো সে। 'নাকটা নিচে নামান!'

কণ্ট্রোল কলাম সামনের দিকে ঠেলে দিলো চীফ স্টুয়ার্ড, জানে অবধারিত মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করছে সে। 'ফ্ল্যাপ নামাও,' ডেলাফর্জকে নির্দেশ দিলো।

'ফ্ল্যাপস কামিং ডাউন,' বললো ডেলাফর্জ।

বিড়বিড় করলো চীফ স্টুয়ার্ড, 'দিস ইজ ইট।'

খোলা ককপিটের দরজায় একজন স্টুয়ার্ডেস দাঁড়িয়ে রয়েছে, চোখ দুটো বিস্ফারিত, চেহারা কাগজের মতো সাদা। জানতে চাইলো, 'আমরা কি ক্র্যাশ করছি?' কোনো রকমে শোনা গেল।

চীফ স্টুয়ার্ড ব্যস্ত, তাকানোর সময় নেই, কর্কশকণ্ঠে বললো, 'হ্যাঁ,

সিটে বসে বেল্ট বাঁধো—যাও।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটলো স্টুয়ার্ডেস, পর্দা সরিয়ে মেইন কেবিনে ঢোকার সময় হোঁচট খেলো একবার। তার আতংকিত চেহারা দেখে ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্ট আর প্যাসেঞ্জররা বুঝলো, উদ্ধার পাবার কোনো আশা নেই। আশ্চর্যই বলতে হবে, কেউ ফুঁপিয়ে বা চেঁচিয়ে উঠলো না। লোকজন প্রার্থনাও করছে নিচু গলায়।

স্টুয়ার্ডেস মেইন কেবিনে ঢোকার সময় পর্দাটা ছিঁড়ে খসে পড়েছে, ককপিট থেকে ঘাড় ফিরিয়ে মেইন কেবিনের দিকে তাকালো জিন ডেলাফর্জ। বৃদ্ধ এক লোক নিঃশব্দে কাঁদছে, তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন উম্মে সালিহা। মহাসচিবের চেহারা সম্পূর্ণ শান্ত। সত্যি আশ্চর্য এক মহিলা, ভাবলো ডেলাফর্জ। দুঃখজনকই বটে যে তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য খানিক পরই নিঃশেষে মুছে যাবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের দিকে ফিরলো সে।

দুশো মিটারের ঘর ছাড়িয়ে নেমে এসেছে অলটিমিটারের কাঁটা। বিরাট একটা ঝুঁকি নিয়ে অবশিষ্ট তিনটে এঞ্জিনের ফুয়েল খরচ বাড়িয়ে দিলো ডেলাফর্জ। বেপরোয়া একজন মানুষের অর্থহীন কাণ্ড। এঞ্জিন-গুলো এখন শেষ কয়েক গ্যালন ফুয়েল তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে অচল হয়ে যাবে। আসলে ডেলাফর্জের চিন্তা-ভাবনায় এই মুহূর্তে যুক্তির কোনো অবদান নেই। কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকতে পারছে না সে। একটা কিছু করার তাগাদা অনুভব করছিল সে, তাতে যদি তার নিজের মৃত্যু হয় তো হোক।

বিভীষিকাময় পাঁচটা মিনিট পেরিয়ে গেল যেন এক পলকে। প্লেন-টাকে খামচে ধরার জন্যে বিদ্যুৎবেগে ওপর দিকে ছুটে এলো কালো সাগর। 'আ-আলো!' অবিশ্বাস আর উত্তেজনায় তোতলালো চীফ

স্টুয়ার্ড। 'আমি আ-আলো দেখতে পাচ্ছি। নাক বরাবর সামনে।'

উইণ্ডশীল্ড দিয়ে বাইরে তাকালো ডেলাফর্জ। 'জাহাজ!' চেঁচিয়ে উঠলো সে। 'ওটা একটা জাহাজ!'

আর ঠিক সেই মুহূর্তে, আইসব্রেকার শারলকের ওপর দিয়ে উড়ে গেল বোয়িং, দশ মিটারের জন্যে রাডার মাস্টের সাথে ধাক্কা খেলো না। হাঁ করে তাকিয়ে রইলো রানা।

মহা হুলস্থুল পড়ে গেল আইসব্রেকার শারলকে। রাডার আগেই সাবধান করে দিয়েছিল ক্রুদের, একটা প্লেন আসছে। ব্রিজে দাঁড়ানো লোকজন বোয়িঙের গর্জন শুনে নিজেদের অজান্তেই মাথা নামিয়ে আড়াল খুঁজলো। জাহাজের মাস্তুল প্রায় ছুঁয়ে গ্রীনল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলের দিকে ছুটে গেল প্লেনটা।

কমাণ্ডার জন ম্যাকেঞ্জির সাথে ঝড়ের বেগে ব্রিজে ঢুকলো রানা আর নেলসন। অপসৃয়মান প্লেনটার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। 'হোয়াট দ্য হেল ওয়াজ দ্যাট?' ডিউটিরত অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন কমাণ্ডার।

'অজ্ঞাত পরিচয় একটা প্লেন, ক্যাপটেন।'

'সামরিক?'

'না, স্যার। মাথার ওপর দিয়ে যাবার সময় ডানার তলাটা দেখেছি আমি। কোনো মার্কিং নেই।'

'সম্ভবত একটা স্পাই প্লেন।'

'মনে হয় না। সব ক'টা জানালায় আলো ছিলো।'

বেন নেলসন মন্তব্য করলো, 'কমার্শিয়াল এয়ার লাইনার?'

বিস্মিত কমাণ্ডার বললেন, 'লোকটা পাইলট, নাকি গাড়োয়ান?

আমার জাহাজকে বিপদে ফেলতে যাচ্ছিলো! ব্যাটা এদিকে কি করছে, শুনি? কমার্শিয়াল ফ্লাইটের পথ থেকে কয়েক শো মাইল দূরে রয়েছি আমরা!'

'প্লেনটা নিচে নামছে,' বললো রানা, পুবদিকে তাকিয়ে ক্রমশ ছোটো হয়ে আসা নেভিগেশন লাইটগুলো দেখছে ও। 'আমার ধারণা, নামতে বাধ্য হচ্ছে ওরা।'

'এই অন্ধকারে ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে?' নেলসন ক্রস চিহ্ন আঁকলো বুকে। 'ঈশ্বর ওদের সহায় হোন। কিন্তু তাহলে ল্যাণ্ডিং লাইট জ্বালেনি কেন?'

ডিউটি অফিসার বললো, 'বিপদে পড়লে পাইলট তো ডিসট্রেস সিগন্যাল পাঠাবে। কমিউনিকেশন রুম কিছুই শোনেনি।'

'তুমি সাড়া পাবার চেষ্টা করেছো?' জিজ্ঞেস করলেন জন ম্যাকেঞ্জি।

'হ্যাঁ, রাডারে ধরা পড়ার সাথে সাথে। কোনো রিপ্লাই পাইনি।'

জানালার সামনে সরে গিয়ে বাইরে উঁকি দিলেন কমাণ্ডার। জানালার কাঁচে চার সেকেণ্ড আঙুল নাচালেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হলেন ডিউটি অফিসারের। 'যেখানে আছি সেখানেই থাকছি আমরা।'

কেউ কোনো কথা বললো না দেখে রানাই মুখ খুললো, 'সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার নিঃসন্দেহে আপনারই, তবে সমর্থন বা প্রশংসা করতে পারছি না।'

'তুমি একটা নেভি শিপে রয়েছো, রানা,' অহেতুক কর্কশ স্বরে বললেন জন ম্যাকেঞ্জি। 'আমরা কোস্ট গার্ড নই। তুমি জানো, এখানে এই মুহূর্তে আমরা একটা দায়িত্ব পালন করছি।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে, অনেকটা যেন জনান্তিকে

বললো রানা, 'প্লেনটায় বাচ্চা আর মহিলাও থাকতে পারে।'

'দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, তা কে বলবে? এখনো প্লেনটা আকাশে রয়েছে। উদ্ধার করো বলে কোনো সাহায্যও তারা চাইছে না। তুমি তো একজন পাইলট, তুমিই বলো, বিপদেই যদি পড়ে থাকে, শার-লর্ককে ঘিরে চক্কর দেয়নি কেন ওরা?'

'মাফ করবেন, ক্যাপটেন,' ডিউটি অফিসার বললো, 'বলতে ভুলে গেছি, ল্যাণ্ডিং ফ্ল্যাপস নামানো ছিলো।'

'তাতেও প্রমাণ হয় না যে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে,' জেদের সুরে বললেন জন ম্যাকেঞ্জি।

হঠাৎ হেসে উঠলো রানা। 'উদ্ধার করতে যেতে না চেয়ে আপনি আসলে নিজেই অপরাধবোধে ভুগছেন, ক্যাপটেন। আপনার সিদ্ধান্ত-কে কেউ চ্যালেঞ্জ করেনি, তাহলে এতো কথা কিসের? তবে, যদি আমার ব্যক্তিগত মতামত জানতে চান, আমি বলবো—ফুল স্টীম অ্যাহেড। সময়মতো তৎপর হইনি বলে যদি একশো মানুষ মারা পড়ে, আপনার মতো আমিও নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না। অন্তত খোঁজ নিয়ে দেখে আসতে দোষ কি? কতোই বা আর তেল খরচ হবে।'

খালি চার্ট রুমের দিকে ইঙ্গিত করলেন ক্যাপটেন, রানা আর নেলসন ঢোকার পর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। 'ক্রুদের সবাই জানে না কি খুঁজছি আমরা, তাই এখানে চলে এলাম। অনুসন্ধান বন্ধ রাখা এক কথা, আর স্পট ছেড়ে চলে যাওয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা—রাশিয়ান-রা সন্দেহ করবে তাদের সাবমেরিন আমরা খুঁজে পেয়েছি। আমরা চলে যাবার সাথে সাথে এলাকাটা চষে ফেলবে ওরা।'

'আপনার কথায় যুক্তি আছে,' বললো রানা। 'সেক্ষেত্রে আমাদের-কে একটা হেলিকপ্টার দিন।'

'বলো, আমি শুনছি।'

'আফটার ডেক থেকে নুমার একটা 'কপ্টার নিয়ে আমি আর নেলসন রওনা হয়ে যাই, সাথে একটা মেডিকেল টিম আর দু'জন ক্রু থাকুক। ঘুরে দেখে আসি প্লেনটা কোথায় পড়েছে। যদি সম্ভব হয় উদ্ধার কাজ চালানো হবে।'

'বুদ্ধিটা মন্দ নয়। তাহলে দেরি করছো কেন?' ভুরু কুঁচকালেন কমাণ্ডার। 'জলদি 'কপ্টারে গিয়ে ওঠো তোমরা, বাকি সবাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' চার্টরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন জন ম্যাকেঞ্জি।

অকস্মাৎ দেখা গেল কালো সাগর নয়, ওদের নিচে জমাট বাঁধা নিরেট বরফ। তারার আলোয় কাছ থেকে নীলচে আর চকচকে দেখালো আদিগন্ত বরফের রাজ্য। সংঘর্ষ, স্পর্শ বা পতন, যাই বলা হোক, আর মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। এই সময় হঠাৎ চীফ স্টুয়ার্ডের মনে পড়লো ডেলাফর্জকে ল্যাণ্ডিং আলো জ্বালার কথা বলা দরকার।

আলো জ্বলে ওঠার সাথে সাথে হতচকিত একটা মেরু ভাল্লুককে দেখতে পেলো ওরা। এক পলকে প্লেনের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা। 'যীশুর মায়ের দিব্যি,' বিড়বিড় করে উঠলো ডেলাফর্জ, 'ডান দিকে পাহাড় দেখতে পাচ্ছি আমি। সাগর পেরিয়ে জমির ওপর চলে এসেছি আমরা।'

অবশেষে ভাগ্যের দাঁড়িপাল্লা চীফ স্টুয়ার্ড আর আরোহীদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ডেলাফর্জের পাহাড় একটা নয়, এক সারিতে পাশাপাশি অনেকগুলো, গ্রীনল্যাণ্ডের উপকূল বরাবর দু'দিকে একশো মাইল পর্যন্ত ওগুলোর বিস্তৃতি। তবে সেদিকে প্লেনের নাক ঘোরাতে ব্যর্থ হলো চীফ স্টুয়ার্ড, নিজের অজান্তে আরডেনক্যাপল ফিঅ্যরড-

এর মাঝখানে নামিয়ে আনছে নিজেদের। 'লোয়ার দ্য ল্যাণ্ডিং গিয়ার।' নির্দেশ দিলো সে।

নিঃশব্দে নির্দেশ পালন করলো ডেলাফর্জ। সাধারণ ইমার্জেন্সী ল্যাণ্ডিঙের সময় এই পদ্ধতি সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে, তবে অজ্ঞতাবশত হলেও সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে চীফ স্টুয়ার্ড। বরফে ল্যাণ্ড করার সময় দক্ষ একজন পাইলটও এই সিদ্ধান্ত নিতো। ল্যাণ্ডিং গিয়ার নামানোর ফলে দ্রুত নিচে নামছে প্লেন। চীফ স্টুয়ার্ড বা ডেলাফর্জ, কারো কিছু করার নেই আর। দু'জনের কেউই জানে না যে নিচের বরফ মাত্র এক মিটার পুরু, একটা বোয়িং সাতশো বি-র ভার সহ্য করার জন্যে যথেষ্ট নয়।

ইনস্ট্রুমেণ্ট প্যানেলের প্রায় সব আলো লাল সংকেত দিচ্ছে। ওদের মনে হলো কালো একটা পর্দা ছিঁড়ে সাদা পাতালে প্রবেশ করলো প্লেন। কণ্ট্রোল কলাম ধরে টানলো চীফ স্টুয়ার্ড। বোয়িঙের গতি কমে গেল, সেই সাথে শেষবারের মতো উঁচু হলো নাকটা—আবার আকাশে উঠতে চাওয়ার দুর্বল প্রচেষ্টা।

আতংকে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে ডেলাফর্জ। তার মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না। থ্রটল টেনে কাছে আনার কথা মনে থাকলো না, মনে থাকলো না ফুয়েল সাপ্লাই বন্ধ করা দরকার, অফ করা দরকার ইলেকট্রিক সুইচগুলো।

তারপর সংঘর্ষ ঘটলো।

চোখ বুজে হাত দিয়ে নিজেদের মুখ ঢাকলো ওরা। চাকা বরফ স্পর্শ করলো, পিছলে গেল, গভীর জোড়া দাগ তৈরি হলো বরফের গায়ে। পোর্ট সাইডের ইনবোর্ড এঞ্জিন দুমড়েমুচড়ে মাউন্টিং থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল, ছিটকে পড়ে ডিগবাজি খেলো বরফের ওপর।

স্টারবোর্ডের দুটো এঞ্জিনই গেঁথে গেল বরফের ভেতর, মোচড় খেয়ে বিচ্ছিন্ন হলো ডানাটা। পরমুহূর্তে সমস্ত পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেল, নেমে এলো ঘোর অন্ধকার।

বরফ ঢাকা খাঁড়ির ওপর দিয়ে ধূমকেতুর মতো ছুটে চলেছে প্লেনটা, পিছনে ছড়িয়ে যাচ্ছে উত্তপ্ত ধাতব টুকরো। প্যাক আইস পরস্পরের সাথে সংঘর্ষের সময় একটা প্রেশার রিজ তৈরি হয়েছিল, সেটাকে ধুলোর মতো উড়িয়ে দিলো বোয়িং। নাকের গিয়ার চ্যাপ্টা হয়ে ঢুকে গেল সামনের পেটের ভেতর, ছিঁড়ে ফেললো হেল হোল-এর আবরণ। নিচু হলো বো, বরফ খুঁড়তে খুঁড়তে এগোলো, প্রতি মুহূর্তে ভেতর দিকে তুবড়ে মোটা অ্যালুমিনিয়াম শিট ককপিটে ঢুকে যাচ্ছে। অবশেষে নিজস্ব গতিবেগ হারিয়ে বিকলাঙ্গ বোয়িং স্থির হলো। বরফ ঢাকা তীর মাত্র ত্রিশ মিটার দূরে, ওখানে বড় আকারের পাথরের স্তূপ।

কয়েক মুহূর্ত মৃত্যুপুরীর নিস্তব্ধতা অটুট থাকলো। তারপর বরফ ফাটার জোরালো শব্দের সাথে শোনা গেল ধাতব গোঙানি। ধীরে ধীরে বরফের আবরণ ভেঙে খাঁড়ির পানিতে নেমে যাচ্ছে বোয়িংটা। সেই সাথে তুবড়ে ছোটো হয়ে যাচ্ছে আকারে।

খাঁড়ির দিকে প্লেনটার উড়ে যাওয়ার শব্দ আর্কিওলজিস্টরাও শুনতে পেলো। আশ্রয় থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে প্লেনটার ল্যাণ্ডিং লাইট দেখতে পেলো তারা। আলোকিত কেবিনের জানালাগুলো ধরা পড়লো তাদের চোখে। তারপরই কানে এলো পতনের শব্দ, সেই সাথে পায়ের তলায় অবিচ্ছিন্ন বরফের মেঝে কেঁপে উঠলো। খানিক পর আবার সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। চারদিকে গাঢ় হয়ে নামলো অন্ধকার। বাতাসের গোঙানি ছাড়া কিছু শোনা গেল না।

'গুড লর্ড!' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ডঃ মোরেল, 'খাঁড়িতে বিধ্বস্ত হয়েছে ওটা।'

'হরিবল!' জেনিথের গলায় অবিশ্বাস আর বিস্ময়। 'একজনও বাঁচবে না!'

'বোধহয় পানিতে ডুবে গেছে, সেজন্যেই কোনো আগুন দেখা গেল না,' মন্তব্য করলো পেনবার্নার।

উইনফিল্ড জিজ্ঞেস করলো, 'কি ধরনের প্লেন, কেউ দেখেছো?'

মাথা নাড়লো পেনবার্নার। 'চোখের পলকে বেরিয়ে গেল। তবে, বেশ বড়সড়। সম্ভবত একাধিক এঞ্জিন। বরফ জরিপের জন্যে এসে থাকতে পারে।'

'দুরন্ত আন্দাজ করো দেখি,' আহ্বান জানালেন ডঃ মোরেল।

ম্লান চেহারা নিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে জেনিথ। 'কথা বলে সময় নষ্ট করছি আমরা। ওদের সাহায্য দরকার।'

'ঠিক,' সায় দিলেন ডঃ মোরেল। 'এসো, আগে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচি।'

আশ্রয়ে ফিরে এসে প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো ওরা, সেই সাথে প্ল্যানটাও তৈরি করলো। জেনিথ বললো, 'কম্বল লাগবে, অতিরিক্ত সবগুলো গরম কাপড় সাথে নাও। আমি মেডিকেল সাপ্লাই নিচ্ছি।'

'মরিস,' ডঃ মোরেল নির্দেশ দিলেন, 'রেডিওতে ডেনবর্গ স্টেশনকে জানাও। থিউল-এর এয়ারফোর্স রেসকিউ ইউনিটকে খবর পাঠাবে ওরা।'

'বরফ খুঁড়ে আরোহীদের বের করতে হতে পারে, সাথে কিছু টুলস থাকা দরকার,' প্রস্তাব দিলো পেনবার্নার।

নিজের পারকা আর গ্লাভস চেক করে নিয়ে মাথা ঝাঁকালেন ডঃ মোরেল। 'আর কি দরকার হতে পারে ভেবে দেখো। একটা স্নোমো-

বাইলের সাথে স্লেড বেঁধে নিচ্ছি আমি।'

ঘুম ভাঙার পর পাঁচ মিনিটও পেরোয়নি, বিবেকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গভীর অন্ধকার রাতে হিম বরফের রাজ্যে বেরিয়ে পড়লো দলটা। একটা শেডের ভেতর রয়েছে স্নোমোবাইলগুলো, শেডের ভেতর তাপ-মাত্রা বাইরের চেয়ে বিশ ডিগ্রী বেশি রাখা হয়েছে হিটার জ্বেলে, তার-পরও প্রথম স্নোমোবাইলটা পাঁচবারের চেষ্টায় স্টার্ট নিলো, দ্বিতীয়টা নিলো বত্রিশ বারের মাথায়। ইতিমধ্যে জিনিস-পত্র নিয়ে আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসেছে অন্যান্যরা। ডঃ মোরেল ছাড়া সবার পরনে পা পর্যন্ত লম্বা জাম্পস্যুট। সবাইকে একটা করে হেভি-ডিউটি ফ্ল্যাশ লাইট দিলেন তিনি। রওনা হয়ে গেল দলটা। জেনিথের কোমর ধরে স্নোমো-বাইলে তুলে নিলেন ভদ্রলোক। দ্বিতীয়টায় উঠলো মরিস উইনফিল্ড আর জোসেফ পেনবার্নার।

খাঁড়ির ওপর বরফের আবরণ এবড়োখেবড়ো, ঝাঁকি খেতে খেতে এগোলো স্নোমোবাইল, প্রতি মুহূর্তে বিপদের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকলো আরোহীরা। বরফের পাতলা আবরণ ভেঙে যেতে পারে। প্রেশার রিজ-গুলো আগে থেকে চেনা কঠিন, ঢাল বেয়ে ওঠার পর টের পাওয়া যায়। ডঃ মোরেলের বিশালবপু এক হাতে বেড় দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে জেনিথ কর্নেলিয়াস, চোখ বন্ধ, মুখ গুঁজে দিয়েছে দলনেতার কাঁধে। মাঝে মধ্যে মুখ তুলে গতি কমাবার জন্যে চিৎকার করছে সে, কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে ফুলস্পীডে স্নোমোবাইল চালাচ্ছেন ডঃ মোরেল। ঘাড় ফিরিয়ে একবার পিছন দিকে তাকালো জেনিথ। পিছু পিছু আসছে ওরা।

দ্বিতীয় স্নোমোবাইল স্লেড টানছে না, কাজেই প্রথমটাকে পাশ কাটিয়ে গেল অনায়াসে, দেখতে দেখতে বরফের রাজ্যে হারিয়ে গেল

উইনফিল্ড আর পেনবার্নার।

বেশ খানিক পর স্নোমোবাইলের আলোর শেষ প্রান্তে বড়সড় একটা ধাতব আকৃতি মাথাচাড়া দিচ্ছে দেখে পেশীতে টান পড়লো ডঃ মোরেলের। হঠাৎ করে হ্যাণ্ডগ্রিপটা বাঁ দিকে ঘুরিয়ে আটকে দিলেন তিনি। সামনের স্কিগুলোর কিনারা বরফের ভেতর গেঁথে গেল, প্লেনের একটা বিচ্ছিন্ন ডানা এক মিটার দূরে থাকতে আরেক দিকে ঘুরে গেল স্নোমোবাইল। বাহনটাকে সিধে করার প্রাণান্ত চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু একবার কাত হতে শুরু করায় স্লেডটাকে আর সিধে করা গেল না, জিনিস-পত্র নিয়ে উল্টে পড়লো সেটা, হ্যাঁচকা টান খেয়ে আরো কাত হয়ে গেল স্নোমোবাইলও। তারপর কি ঘটলো দু'জনের কেউই বলতে পারবে না। কামানের গোলার মতো ছিটকে পড়লেন ডঃ মোরেল, তাঁর আর্তনাদ শুনতে পেলো জেনিথ। অন্ধকার শূন্যে সে-ও ছিটকে পড়েছে, কিন্তু কোথায় কোনো ধারণা নেই। স্লেডটা ধেয়ে এলো তার দিকে, কয়েক ইঞ্চির জন্যে ধাক্কা দিলো না। কয়েক মিটার দূরে দাঁড়িয়ে পড়লো সেটা। স্নোমোবাইল ওল্টাতে গিয়েও ওল্টায়নি, ছুটে এসে জেনিথের পাশে থামলো সেটা, এখনো কাত হয়ে রয়েছে। তারপর সেটা পড়লো। সরাসরি জেনিথের একটা পায়ের ওপর। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলো সে।

পিছনের দুর্ঘটনা সম্পর্কে সাথে সাথে কিছু টের পায়নি উইনফিল্ড আর পেনবার্নার। পিছনে ওদেরকে কতোদূর ফেলে এসেছে জানার কৌতূহল নিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো উইনফিল্ড। বহু পিছনে ওদের আলো নিচের দিকে মুখ করে স্থির হয়ে রয়েছে দেখে তাজ্জব বনে গেল সে। পেনবার্নারের কাঁধে হাত দিয়ে চিৎকার করে বললো, 'ওরা বোধহয় বিপদে পড়েছে।'

প্ল্যানটা ছিলো, প্লেনের চাকার দাগ ধরে অকুস্থলে পৌঁছুবে ওরা। সেই দাগ খোঁজার কাজে ব্যস্ত ছিলো পেনবার্নার। 'তাই নাকি!' বলেই বিরাট একটা বৃত্ত রচনা করে স্নোমোবাইল ঘোরাতে শুরু করলো সে। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার ফলে চোখ ব্যথা করছে তার, ফলে ভালো করে দেখতে পায়নি সামনেটা। প্লেনের চাকার রেখে যাওয়া গভীর গর্তটা যখন দেখতে পেলো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। দু'মিটার ফাঁকটার কিনারা থেকে শূন্যে উঠে গেল ওদের বাহন। দু'জন আরোহীর ভার থাকায় বাহনের নাকটা নুয়ে পড়লো নিচের দিকে, সংঘর্ষ ঘটলো গর্তের অপরপ্রান্তের দেয়ালের সাথে, শব্দ শুনে মনে হলো পিস্তলের গুলি ছোঁড়া হয়েছে। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, গর্তের কিনারা টপকে বরফের ওপর আছাড় খেয়ে স্থির হয়ে গেল দু'জনেই, যেন অযত্নে ফেলে রাখা কাপড়ের তৈরি একজোড়া পুতুল।

ত্রিশ সেকেণ্ড পর অশীতিপর বৃদ্ধের মতো নড়ে উঠলো পেনবার্নার। হাঁটু আর কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো সে। তারপর বসলো, কিন্তু আচ্ছন্ন ভাবটা কাটলো না। এখনো বুঝতে পারছে না এখানে কিভাবে এলো সে। হিস হিস শব্দ শুনে ঘাড় ফেরালো।

পিঠ বাঁকা করে বসে রয়েছে উইনফিল্ড, দু'হাতে পেট চেপে ধরে গোঙাচ্ছে।

প্রথম দস্তানাটা খুলে নাকে আঙুল বুলালো পেনবার্নার। না, ভাঙেনি। তবে ফুটো দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে, ফলে মুখ দিয়ে বাতাস টানতে হচ্ছে ওকে। অন্য কোনো হাড়ও ভাঙেনি, কারণ মোটা গরম কাপড়ে মোড়া ছিলো শরীরটা। হামাগুড়ি দিয়ে উইনফিল্ডের কাছে চলে এলো সে। 'কি ঘটেছে?' প্রশ্ন করেই বুঝলো বোকামি হয়ে গেল।

'প্লেনের চাকা বরফের গায়ে একটা গর্ত রেখে গেছে…।'

'জেনিথ আর ডঃ মোরেল…?'

'দুশো মিটার পিছনে রয়েছে ওরা,' বললো উইনফিল্ড। 'গর্তটাকে ঘুরে যেতে হবে আমাদের, ওদের বোধহয় সাহায্য দরকার।'

ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে কোনোরকমে দাঁড়ালো পেনবার্নার। এক পা এক পা করে গর্তের কিনারায় এসে থামলো সে। অদ্ভুত কাণ্ড, স্নোমোবাইলের হেডল্যাম্প এখনো জ্বলছে। ল্যাম্পের ম্লান আলোয় গর্তের ভেতর তলাটা দেখতে পাওয়া গেল। খাঁড়ির পানিতে অসংখ্য বুদবুদ, লাফ দিয়ে উঠে আসছে বরফের মেঝে ছাড়িয়ে ছ'ফুট ওপরে। তার পাশে এসে দাঁড়ালো উইনফিল্ড। একযোগে পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা।

'মানবতার সেবক!' ঝাঁঝের সাথে বললো পেনবার্নার। 'মানুষের প্রাণ বাঁচাতে ব্যাকুল! যার যা কাজ তাই তার করা উচিত, বুঝলে! আমরা আর্কিওলজি বুঝি, তাই নিয়ে থাকা উচিত ছিলো!'

'চুপ!' হঠাৎ তাগাদা দিলো উইনফিল্ড। 'শুনতে পাচ্ছো?' আবার কান খাড়া করলো সে। 'লে বাবা! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম বলতে পারো? এটাও কি দুর্ঘটনা ঘটাতে আসছে?'

'কি আসছে?' আকাশ থেকে পড়লো পেনবার্নার।

'শুনতে পাচ্ছো না? একটা হেলিকপ্টার! এদিকেই আসছে।'

হেসে উঠলো পেনবার্নার। 'তারমানে সাহায্য পাওয়া যাবে। সন্দেহ নেই, আরোহীদের উদ্ধার করতেই আসছে ওরা।'

একটা ঘোর আর বাস্তবতার মাঝখানে ভাসছে জেনিথ। সে বুঝতে পারছে না, সহজ-সরলভাবে চিন্তা করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে কেন।

মাথা তুলে ডঃ মোরেলের খোঁজ করলো সে। কয়েক মিটার দূরে অনড় পড়ে রয়েছেন তিনি। চিৎকার করে ডাকলো জেনিথ, কিন্তু তিনি নড়লেন না, যেন মারা গেছেন। হাল ছেড়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো সে, একটা পা সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে ফেলার সাথে সাথে তার ইচ্ছে হলো ঘুমিয়ে পড়ে।

জেনিথ জানে, উইনফিল্ড আর পেনবার্নার যে-কোনো মুহূর্তে ফিরে আসবে। কিন্তু সময় ধীরগতিতে বয়ে চললো। কারো দেখা নেই। ঠাণ্ডায় কাঁপছে সে। ভীষণ ভয় লাগছে। তারপর তন্দ্রা মতো এলো। এই সময় শব্দটা শুনতে পেলো সে। হঠাৎ করে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো কালো আকাশ। ঝুরঝুরে তুষার উড়লো তার চারপাশে। যান্ত্রিক শব্দটা থেমে গেল এক সময়। আলোয় ঘেরা অস্পষ্ট একটা মূর্তি এগিয়ে এলো তার দিকে।

মূর্তিটা ধীরে ধীরে ভারি পারকায় মোড়া একটা মানুষের আকৃতি নিলো। মানুষটা প্রথমে তাকে ঘিরে ঘুরলো একবার, যেন পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করলো। তারপর একটানে তার পায়ের ওপর থেকে তুলে ফেললো স্নোমোবাইলটা। আবার তার চারদিকে ঘুরলো মানুষটা, এবার তার মুখে আলো পড়ায় চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পেলো জেনিথ। এই বিপদেও বুকের ভেতরটা শিরশির করে উঠলো তার, এমন মায়াভরা ঘন কালো চোখ জীবনে দেখেনি সে। একবার দেখলে এই চেহারা ভোলা যায় না। কাঠিন্য, কোমলতা, আন্তরিক উদ্বেগ সব যেন খোলা বইয়ের মতো পড়া গেল মুখটায়। সে একটা মেয়ে দেখে আগন্তু-কের চোখ একটু সরু হলো। জেনিথ ভাবলো, দেবতা নাকি রাজপুত্র? কিন্তু এলো কোত্থেকে?

কি বলবে ভেবে না পেয়ে শুধু বললো সে, 'তোমাকে দেখে কি যে

খুশি লাগছে আমার।'

'লোকে মাসুদ রানা নামে ডাকে আমাকে,' হাসিখুশি কণ্ঠ থেকে জবাব এলো। 'খুব যদি ব্যস্ততা না থাকে, কাল রাতে আমার সাথে ডিনার খেতে আপত্তি আছে?'

—

সাত

রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো জেনিথ, সন্দেহ হলো শুনতে ভুল করেছে। 'কোথাও যাবার অবস্থা আমার বোধহয় নেই।'

পারকার হুড মাথার পিছনে সরিয়ে দিয়ে জেনিথের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো রানা, তার গোড়ালিতে হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখলো। 'হাড় ভাঙেনি, কোথাও ফুলেও নেই,' সহাস্যে বললো ও। 'ব্যথা?'

'ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গেছি, ব্যথা লাগলেও টের পাবো না।'

স্লেড থেকে ছিটকে পড়া একটা কম্বল তুলে নিয়ে জেনিথকে ঢাকলো রানা। 'তুমি প্লেনের প্যাসেঞ্জার নও। এখানে এলে কিভাবে?'

নিজেদের পরিচয় দিলো জেনিথ, প্লেনের শব্দ শোনার পর থেকে যা যা ঘটেছে সব বললো। সবশেষে একটা হাত তুলে উল্টে পড়া স্লেডটা দেখালো রানাকে।

হেলিকপ্টারের আলোয় দুর্ঘটনার ছবিটা চট করে দেখে নিলো রানা। এই প্রথম নজরে পড়লো, দশ মিটার দুরে আরেকজন পড়ে রয়েছে। প্লেনের বিচ্ছিন্ন ডানাটাও দেখতে পেলো। 'এক মিনিট।'

হেঁটে এসে ডঃ মোরেলের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো রানা। বিশাল-দেহী আর্কিওলজিস্ট নিয়মিত নিঃশ্বাস ফেলছেন। ব্যস্ত হাতে তাঁকে পরীক্ষা করলো ও। তীক্ষ্ণ চোখে ওকে লক্ষ্য করছে জেনিথ, জিজ্ঞেস করলো, 'উনি কি মারা গেছেন?'

'আরে না। মাথায় চোট পেয়েছেন, তা-ও সামান্য।'

উইনফিল্ডের পিছু পিছু খোঁড়াতে খোঁড়াতে এলো পেনবার্নার, ঠিক যেন একজোড়া তুষারদানব। নিঃশ্বাস বরফ হয়ে যাওয়ায় দু'জনের ফেস মাস্কই ঝাপসা হয়ে গেছে। নিজের মাস্কটা তুললো পেনবার্নার, রক্তাক্ত মুখ নিয়ে তাকালো রানার দিকে, আড়ষ্টভঙ্গিতে হাসলো সে। 'স্বাগতম, আগন্তুক। একেবারে যথাসময়ে পৌঁচেছেন।'

'আপনারা···?'

'ওদের কথাই বলছিলাম,' জেনিথ জানালো। 'আমরা একই দলে। ওরা সামনে ছিলো, তাই আমরা যে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছি ওরা জানে না···।'

'তোমরাও জানো না যে আমরাও একই দুর্ভাগ্যের শিকার,' হেসে উঠে বললো উইনফিল্ড।

'আপনারা প্লেনটা দেখেছেন?' পেনবার্নারকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'নামতে দেখেছি, তবে কাছে যাবার সুযোগ হয়নি।' ডঃ মোরেলের দিকে এগোলো পেনবার্নার, তার পিছু নিলো উইনফিল্ড। 'কি রকম চোট পেয়েছেন উনি? সিরিয়াস?' জেনিথের দিকে তাকালো সে।

'তুমি ?'

জবাব দিলো রানা, 'এক্স-রে করার পর নিশ্চিতভাবে জানা যাবে।'

'ওদের সাহায্য দরকার। আশা করি...।'

'হেলিকপ্টারে মেডিকেল টিম আছে, কিন্তু...।'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে, প্রায় ধমকের সুরে চিৎকার করে পেনবার্নার বললো, 'তাহলে ছাই আপনি অপেক্ষা করছেন কি মনে করে ? ডাকুন ওদের !' রানাকে পাশ কাটিয়ে নিজেই হেলিকপ্টারের দিকে এগোলো সে, কিন্তু লোহার মতো শক্ত একটা মুঠো তার কব্জি চেপে ধরলো।

'আপনার বন্ধুদের অপেক্ষা করতে হবে,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো রানা। 'প্লেনটা খাঁড়িতে ডুবে গেছে বলে সন্দেহ করছি আমরা। কেউ যদি বেঁচে থাকে, সবার আগে তার চিকিৎসা দরকার। আপনাদের ক্যাম্প এখান থেকে কতো দূরে ?'

'দক্ষিণ দিকে এক কিলোমিটার,' অভিযোগের সুরে জবাব দিলো পেনবার্নার।

'স্নোমোবাইল এখনো চালানো যাবে। সঙ্গীকে সাথে নিয়ে স্লেড-টা উদ্ধার করুন। আহতদের নিয়ে ফিরে যান ক্যাম্পে। সাবধানে যাবেন, কারণ ওদের শরীরের ভেতর কোথাও চোট লেগে থাকতে পারে। নিশ্চয়ই রেডিও আছে ?'

গম্ভীর পেনবার্নার মাথা ঝাঁকালো।

'থারটি-টু ফ্রিকোয়েন্সিতে কান রেখে তৈরি থাকবেন,' বললো রানা। 'প্লেনটা যদি প্যাসেঞ্জার ভরা কমার্শিয়াল জেটলাইনার হয়, নরক সাফ করার দায়িত্ব চাপবে আমাদের ঘাড়ে।'

'আমরা তৈরি থাকবো,' রানাকে আশ্বাস দিলো উইনফিল্ড।

হেঁটে জেনিথের কাছে চলে এলো রানা। মেয়েটার একটা হাত

ধরে মৃদু চাপ দিলো ও, বললো, 'দেখো, ডিনারের কথা আবার ভুলে যেয়ো না।' পারকা হুড মাথায় পরে ঝট করে ঘুরলো ও, দীর্ঘ পদক্ষেপে ফিরে চললো হেলিকপ্টারের দিকে। ওর গমন পথের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো জেনিথ কর্নেলিয়াস।

জ্ঞান ফেরার পর ভাঙা পায়ের ব্যথায় অস্থির হয়ে উঠলো চীফ স্টুয়ার্ড। শরীরে প্রচণ্ড একটা চাপ অনুভব করলো সে, তাকে পিছন দিকে ঠেলছে। চোখ মেলে চারদিকে অন্ধকার দেখলো সে, তবে অন্ধকারটা ধীরে ধীরে সয়ে এলো। ভাঙা উইণ্ডশীল্ড দিয়ে তুষার আর বরফের ধস ঢুকছে ভেতরে, ধীরে ধীরে তার নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে সে। একটা পা ভেঙেছে, তুষারের নিচে কিসের সাথে যেন আটকে আছে সেটা। তার মনে হলো, পা-টা পানিতে ডুবে আছে। পানি নয়, ভাবলো সে, তার নিজের রক্ত।

আসলে পানি। বরফের আবরণ ভেদ করে খাঁড়ির পানিতে তিন মিটার ডুবে গেছে প্লেনটা, কেবিনের মেঝেতে থই থই করছে পানি, অনেকগুলো সিটও ডুবে গেছে।

জিন ডেলাফর্জের কথা মনে পড়লো চীফ স্টুয়ার্ডের। অন্ধকারের ভেতর ডান দিকে ঘাড় ফেরালো সে। প্লেনের বো, স্টারবোর্ড সাইডে, ভেঙেচুরে ভেতর দিকে ডেবে গেছে প্রায় এঞ্জিনিয়ারের প্যানেল পর্যন্ত। বিধ্বস্ত টেলিস্কোপ আর তুষারের ভেতর থেকে ডেলাফর্জের শুধু একটা মোচড়ানো হাত বেরিয়ে থাকতে দেখলো সে।

অসুস্থ বোধ করায় চোখ ফিরিয়ে নিলো চীফ স্টুয়ার্ড। বিপদের সময় তার পাশে ছিলো লোকটা, তার মৃত্যু বড় একটা আঘাত হয়ে বাজলো বুকে। উপলব্ধি করলো, কেউ যদি উদ্ধার না করে ঠাণ্ডায় জমে

সে-ও মারা যাবে খানিক পর।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো চীফ স্টুয়ার্ড।

তোবড়ানো প্লেনটার মাথার ওপর চলে এলো ওদের হেলিকপ্টার। একটা ডানা নেই, অপরটা মোচড় খেয়ে ফিউজিলাজের সাথে সেঁটে আছে। লেজের দিকটাও এমনভাবে তুবড়েছে যে চেনা যায় না। অবশিষ্ট অংশটাকে দেখে মনে হলো সাদা চাদরের ওপর স্থির হয়ে আছে পেটমোটা একটা ছারপোকা।

'ফিউজিলাজ বরফ ভেঙে পানিতে ডুবে রয়েছে,' বললো রানা। 'আমি বলবো, এক তৃতীয়াংশ।'

'আগুন ধরেনি,' রানার পাশ থেকে বললো বেন নেলসন। প্লেনের ওপর পড়া হেলিকপ্টারের উজ্জ্বল আলোর প্রতিফলনে চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। 'নেহাতই ভাগ্য। গা কেমন চকচক করছে, দেখছো? যত্নের ছাপ। আমি বলবো, ওটা একটা বোয়িং সাত শো বি। প্রাণের কোনো লক্ষণ, রানা?'

'দেখছি না,' বললো রানা। 'ভালো ঠেকছে না, বেন।'

'আইডেনটিফিকেশন মার্কিং?'

'খোলের গায়ে তিনটে ফিতের মতো মোটা রেখা; হালকা নীল আর নীলচে বেগুনির মাঝখানে উজ্জ্বল সোনালি।'

'পরিচিত এয়ার লাইনের সাথে রঙগুলো মেলে না।'

'আরো নিচে নেমে চক্কর দাও,' বললো রানা। 'তুমি ল্যাণ্ডিঙের জন্যে জায়গা খোঁজো, আমি লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করি।'

দু'বার চক্কর দিতেই রানা বললো, 'স্যাটার্ন। স্যাটার্ন এয়ার।'

'জীবনে কখনো শুনিনি,' বললো নেলসন, বরফের ওপর স্থির হয়ে

আছে দৃষ্টি।

'শুধু ভি. আই. পি.-দের বহন করে। চার্টার করতে হয়।'

'কমার্শিয়াল ফ্লাইটের পথ ছেড়ে এখানে এটা এলো কেন?'

'বলার জন্যে কেউ বেঁচে থাকলে একটু পরই জানতে পারবো।' পিছনে বসা আটজন লোকের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালো ও। হেলিকপ্টারের গরম পেটে আরাম করে বসে আছে সবাই। আর্কটিক আবহাওয়ার উপযোগী নেভি-ব্লু পোশাক সবার পরনে। একজন সার্জেন, তিনজন মেডিকেল সহকারী। বাকি চারজন ড্যামেজ-কন্ট্রোল এক্সপার্ট। ওদের পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে মেডিকেল সাপ্লাইয়ের বাক্স, কম্বল, স্ট্রেচার আর আগুন নেভানোর উপকরণ ও যন্ত্রপাতি। প্রধান দরজার উল্টোদিকে একটা হিটিং ইউনিট রয়েছে, মোটা কেবল-এর সাথে সংযুক্ত, কেবলের অপর প্রান্ত মাথার ওপর ঝুলে থাকা উইঞ্চের সাথে জড়ানো। ওটার পাশেই রয়েছে ঘেরা কেবিনসহ একটা স্নোমোবাইল। রানার ঠিক পিছনে বসেছেন ডঃ মার্কস। সদালাপী, সদাহাস্যময় ভদ্রলোক মৃদু হেসে জানতে চাইলেন, 'কেমন বুঝছো হে, রানা?'

'নামার পর বুঝতে পারবো,' বললো রানা। 'প্লেনের চারধারে কিছুই নড়ছে না। তবে আগুন ধরেনি। ককপিট ডুবে আছে। ফিউজিলাজ তোবড়ালেও কোথাও ফুটো হয়নি বলে মনে হচ্ছে। মেইন কেবিনে প্রায় এক মিটার উঁচু পানি উঠেছে।'

'আহত লোক যদি ভিজে গিয়ে থাকে, ঈশ্বর তার সহায় হোন।' ডঃ মার্কস গম্ভীর হলেন। 'ফ্রিজিং ওয়াটারে আট মিনিটের বেশি বাঁচার কথা নয়।'

'ওরা যদি ইমার্জেন্সী একজিট খুলতে না পারে, প্লেনের গা কেটে

ভেতরে ঢুকতে হবে।'

লেফটেন্যান্ট জন ফিলিপ, ড্যামেজ-কন্ট্রোল টিমের লিডার, বললো, 'কাটিং ইকুইপমেন্ট থেকে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়া তেলে আগুন ধরে যেতে পারে। ভালো হয় আমরা যদি মেইন কেবিনের দরজা দিয়ে ঢুকি। স্ট্রেচার ঢোকানোর জন্যে চওড়া জায়গা লাগবে ডাক্তার মার্কসের।'

'আপনার কথায় যুক্তি আছে,' বললো রানা। 'তবে মেইন কেবি-নের দরজা খুলতে অনেক সময় লাগবে। আমাদের প্রথম কাজ যে-কোনো একটা ফাঁক দিয়ে হিটারের ভেন্ট পাইপ ভেতরে ঢোকানো।'

হেলিকপ্টার ল্যাণ্ড করলো সমতল বরফের ওপর, প্লেনের কাছ থেকে সামান্য দূরে। নামার জন্যে তৈরি হলো সবাই। রোটর ব্লেডের বাতাসে চারদিকে তুলোর মতো উড়ছে তুষার। লোডিং ডোর এক ঝটকায় খুলে লাফ দিয়ে নিচে নামলো রানা, নেমেই প্লেনের দিকে ছুটলো। মেডিকেল সাপ্লাই নামানোর কাজে সহায়তা করলেন ডঃ মার্কস। বাকি সবাই ধরাধরি করে স্নোমোবাইল আর হিটিং ইউনিট বের করছে।

এক ছুটে প্লেনের ফিউজিলাজটাকে একবার চক্কর দিয়ে এলো রানা। প্রতি মুহূর্তে সজাগ থাকতে হলো কোনো ফাটলে যেন পা গলে না যায়। জেট ফুয়েলের গন্ধে ভারি হয়ে আছে বাতাস। ককপিটের জানালা ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে আছে তুষারের একটা স্তূপ, সেটার ওপর চড়লো ও। হাত দিয়ে তুষার সরিয়ে ককপিটের দিকে একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করার চেষ্টা করলো। একটু পরই সম্ভব নয় বুঝতে পেরে নিচে নেমে এলো আবার। আলগা তুষার জমাট বেঁধে শক্ত বরফ হয়ে গেছে, হাত দিয়ে ভাঙতে কয়েক ঘণ্টা লাগবে।

হন হন করে অবশিষ্ট ডানার দিকে এগোলো ও। মূল অংশটা মোচড় খেয়ে সাপোর্টিং মাউন্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, ডগাটা লেজের দিকে তাক করা। পানিতে ডুবে থাকা ফিউজিলাজের পাশে লম্বা হয়ে রয়েছে গোটা ডানা, জানালাগুলোর এক হাত নিচে। আবরণহীন পানির ওপর ডানাটাকে সেতু হিসেবে ব্যবহার করলো রানা, একটা জানালার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ভেতরে উঁকি দিলো। হেলিকপ্টারের আলো প্লেক্সিগ্লাসে প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিলো ওর, দুই হাত দিয়ে চোখ দুটোকে আড়াল করতে হলো।

প্রথম কিছুই দেখলো না রানা। শুধু অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা। তারপর হঠাৎ, জানালার উল্টোদিকে কিম্ভূতকিমাকার একটা অবয়ব উদয় হলো, রানার মুখ থেকে মাত্র দেড় ইঞ্চি দূরে। নিজের অজান্তেই পিছিয়ে এলো ও। একটা নারীমুখ, একটা বন্ধ চোখের নিচে লালচে কাটা দাগ, রক্তে ভিজে গেছে শরীরের একটা দিক। প্রায় ভূত দেখার মতোই চমকে উঠলো রানা।

তারপর মুখের অক্ষত অংশটার ওপর চোখ পড়লো। উঁচু চোয়াল, লম্বা কালো চুল, ধারালো নাক, কালো চোখ। সুন্দরী যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটু চেনা চেনা লাগছে কি?

জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো ও, 'ইমার্জেন্সী হ্যাচ খুলতে পারবেন?'

সুন্দর একটা ভুরু সামান্য উঁচু হলো, কিন্তু অক্ষত চোখে কোনো ভাব ফুটলো না।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

ঠিক সেই মুহূর্তে লেঃ ফিলিপের লোকজন অক্সিলিয়ারি পাওয়ার ইউনিট চালু করলো, চারদিকে উজ্জ্বল আলোর বন্যা বইয়ে দিয়ে জ্বলে

উঠলো কয়েকটা ফ্লাডলাইট। হিটার ইউনিটে পাওয়ার সংযোগ দেয়া হলো, বরফের ওপর দিয়ে টেনে আনা হলো ফ্লেক্সিবল হোস।

'এদিকে, ডানার ওপর,' হাত নেড়ে লোকগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো রানা। 'জানালা ভাঙার জন্যে কিছু একটা আনো।' জানা-লার দিকে ফিরলো ও, কিন্তু ভদ্রমহিলা ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

হিটারের হোস নিয়ে ডানায় উঠলো লোকগুলো, চোখে-মুখে গরম বাতাস পেলো রানা। ওকে একপাশে সরে দাঁড়াতে বলে কোটের পকেট থেকে ব্যাটারিচালিত একটা যন্ত্র বের করলো জন ফিলিপ। সুইচ অন করতেই শেষ প্রান্তে একটা চাকা ঘুরতে শুরু করলো। 'অ্যালুমিনিয়াম আর প্লেক্সিগ্লাস মাখনের মতো কাটতে পারে।' শুধু কথায় নয়, আড়াই মিনিটের মধ্যে কাজটা করেও দেখালো সে।

কোমর বাঁকা করে ঝুঁকলো রানা, সদ্য ভাঙা জানালার ভেতর হাত গলিয়ে দিয়ে টর্চ জ্বাললো। প্লেনের ভেতর ভদ্রমহিলার ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও। খাঁড়ির ঠাণ্ডা পানিতে টর্চের আলো চকচক করছে। ছোটো ছোটো লাফ দিয়ে কাছাকাছি খালি সিটগুলোয় ওঠার চেষ্টা করছে মন্থরগতি ঢেউ। রানা আর ফিলিপ দু'জন মিলে জানালা দিয়ে হোসটা ঢোকালো, তারপর ছুটলো প্লেনের সামনের দিকে। ইতি-মধ্যে নেভির লোকজন পানির নিচে হাত ডুবিয়ে মেইন একজিট ডোর খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। যা ভয় করা হয়েছিল তাই, আটকে গেছে ওটা। ব্যস্ততার সাথে দরজার গায়ে ড্রিল মেশিন দিয়ে ফুটো তৈরি করা হলো, ফুটোয় ঢোকানো হলো স্টেনলেস স্টীলের হুক, প্রতিটি হুক স্নোমোবাইলের সাথে কেবল দিয়ে যুক্ত। স্নোমোবাইল চালু করে খোলা হলো দরজাটা।

প্লেনের ভেতর গাঢ় অন্ধকার। কেমন যেন একটা অশুভ পরিবেশ।

চেহারায় ইতস্তত ভাব নিয়ে পিছন দিকে তাকালো রানা। ডঃ মার্কস তাঁর দলবল নিয়ে ওর ঠিক পিছনেই রয়েছেন। লেঃ ফিলিপের লোক-জন পাওয়ার ইউনিটের কেবল খুলছে প্লেনের ভেতর আলোর ব্যবস্থা করার জন্যে। 'চলুন, ঢোকা যাক,' বললো ও।

খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো রানা। পানিতে পড়লো, ডুবে গেল হাঁটু পর্যন্ত। অনুভব করলো যেন এক হাজার সুঁই হঠাৎ করে বিঁধে গেছে পায়ে। বাল্কহেড ঘুরে মাঝখানের আল ধরে এগোলো ও, আলের দু'পাশে প্যাসেঞ্জার কেবিনের সারি সারি সিট। ভৌতিক নিস্তব্ধতা ওর হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়িয়ে দিলো। ঠিক ধরতে পারছে না, কিন্তু অনুভব করছে, ভয়ংকর কি যেন একটা ঘটে গেছে এখানে। পানি ঠেলে এগোচ্ছে, শুধু তারই শব্দ পাচ্ছে, আর কোনো আওয়াজ নেই।

তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো রানা, সবচেয়ে বীভৎস ভয়টা বিষাক্ত ফুলের পাপড়ির মতো উন্মুক্ত হতে শুরু করলো।

রানার দু'পাশে ওগুলো যেন সব ভূতের মুখ, ফ্যাকাসে আর সাদা। কেউ নড়ছে না, কারো চোখে পলক নেই, কেউ কথা বলছে না। যার যার সিটে স্ট্র্যাপ দিয়ে নিজেকে আটকে রেখেছে, রানার দিকে তাকিয়ে আছে চেহারায় লাশের ভাব নিয়ে।

হিমেল বাতাসের চেয়ে ঠাণ্ডা একটা শিরশিরে অনুভূতি হলো রানার ঘাড়ের পিছনে। বাইরের আলো জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে, দেয়ালগুলোয় কিম্ভূতকিমাকার ছায়া নড়াচড়া করছে। এক এক করে সিটগুলোর দিকে তাকালো ও, যেন আশা করছে চোখাচোখি হলে হঠাৎ কেউ হাত বাড়াবে বা কথা বলে উঠবে। কিন্তু না, পাতাল

সমাধিতে রাখা মমি-র মতো চুপচাপ বসে থাকলো সবাই।

আরোহীদের একজনের ওপর ঝুঁকে পড়লো রানা। তার লালচে সোনালি চুল মাথার ঠিক মাঝখানে দু'ভাগ করা। আলের কিনারায় একটা সিটে বসে আছে সে। তার চেহারায় ব্যথা, ভয় বা বিস্ময়ের কোনো চিহ্ন নেই। চোখ দুটো আধখোলা, যেন ঘুমে ঢলে পড়ার আগের মুহূর্তে রয়েছে। ঠোঁট জোড়া স্বাভাবিকভাবে জোড়া লাগানো। চোয়াল সামান্য একটু ঝুলে পড়া।

তার অসাড় একটা হাত ধরলো রানা। পালস্ পেলো না। হার্ট বন্ধ হয়ে গেছে।

'কিছু বুঝছো ?' জিজ্ঞেস করলেন ডঃ মার্কস, রানাকে পাশ কাটিয়ে আরেক আরোহীকে পরীক্ষা করছেন তিনি।

'মারা গেছেন ভদ্রলোক,' জবাব দিলো রানা।

'ইনিও।'

'মৃত্যুর কারণ ?'

'এখুনি বলতে পারছি না। আঘাতের কোনো চিহ্ন দেখছি না। মারা গেছে খুব বেশিক্ষণ হয়নি। প্রচণ্ড ব্যথা বা হাত-পা ছোঁড়ার কোনো লক্ষণ নেই। চামড়ার রঙ দেখে অ্যাসফিকসিয়েশন বলেও তো মনে হচ্ছে না।'

'সেটারই সম্ভাবনা বেশি,' বললো রানা। 'অক্সিজেন মাস্কগুলো এখনো ওভারহেড প্যানেলে রয়েছে।'

একের পর এক আরোহীদের পরীক্ষা করে চলেছেন ডঃ মার্কস। 'আরো ভালোভাবে পরীক্ষা করে বলতে পারবো।'

দোরগোড়ার মাথায় একটা আলো জ্বালার ব্যবস্থা সেরে ফেললো লেঃ ফিলিপ। বাইরের দিকে ফিরে একটা হাত ঝাঁকালো সে। প্লেনের

ভেতরটা দিনের মতো আলোকিত হয়ে উঠলো।

কেবিনের চারদিকে তাকালো রানা। চোখে পড়ার মতো ক্ষতি শুধু সিলিঙের হয়েছে, কয়েক জায়গায় তুবড়ে গেছে সেটা। প্রতিটি সিট খাড়া অবস্থায় রয়েছে, প্রত্যেক আরোহীর সিট বেল্ট বাঁধা। 'বরফজলে অর্ধেক ডুবে বসে ছিলো, নড়াচড়া না করে হাইপোথারমিয়া-য় মারা গেছে, এ অবিশ্বাস্য।' এক স্বর্ণকেশী বৃদ্ধাকে পরীক্ষা করছে ও। মহিলাকে দেখে মনে হলো স্রেফ যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি। তার খোলা হাতের তালুতে লাল একটা গোলাপ।

'বোঝাই যাচ্ছে প্লেন বরফ স্পর্শ করার আগেই মারা গেছে সবাই,' বললেন ডঃ মার্কস।

সার সার সিটের ওপর আবার চোখ বুলালো রানা। 'কিন্তু কেন?'

'টক্সিক ফিউম মৃত্যুর কারণ হতে পারে।'

'কোনো গন্ধ পাচ্ছেন?'

'না।'

'আমিও না।'

'আর কি হতে পারে?'

'খাদ্যে বিষ?'

ঝাড়া তিন সেকেণ্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডঃ মার্কস। 'তুমি পাইকারী হত্যাকাণ্ডের কথা বলছো।'

'মনে হচ্ছে না সেদিকেই যাচ্ছি আমরা?'

ভালো হতো যদি একজন সাক্ষী পাওয়া যেতো।

'আছে।'

চমকে উঠে সিটে বসা সাদা মুখগুলোর দিকে দ্রুত চোখ বুলালেন ডঃ মার্কস। 'নিঃশ্বাস ফেলছে এমন কাউকে দেখতে পেয়েছো তুমি?

কোথায় ?'

'দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার আগে,' বললো রানা, 'জানালা দিয়ে এক ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। কোনো সন্দেহ নেই তাঁকে আমি জীবিত দেখেছি। কিন্তু এখন কেন যে দেখছি না...'

ডঃ মার্কস কিছু বলার আগে পানি ঠেলে এগিয়ে এলো লেঃ ফিলিপ। ভয়ে আর বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে তার চোখ। 'ওহ্ গড। ওহ্ গড।' সিটে বসা আরোহীদের দিকে পেছন ফেরার জন্যে ঘন ঘন একদিক থেকে আরেক দিকে ঘুরে দাঁড়ালো সে। 'মানুষ এভাবে মারা যায়। সত্যিই কি লাশ ওগুলো, নাকি মমি ?'

'লাশ,' মৃদুকণ্ঠে বললো রানা। 'তবে একজন অন্তত বেঁচে আছে। হয় ককপিটে, নয়তো লুকিয়ে আছে পেছনের কোনো বাথরুমে।'

'তাহলে আমার চিকিৎসা দরকার তার,' ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ডঃ মার্কস।

'আপনি বরং এখানেই আরোহীদের পরীক্ষা করুন,' প্রস্তাব দিলো রানা। 'দেখুন সবাই মারা গেছে কিনা। ফিলিপ ককপিটে চলে যান, আমি বাথরুমগুলো দেখি।'

'এতো লাশ,' বললো লেঃ ফিলিপ, 'কি করে সরানো হবে ? কমাণ্ডার ম্যাকেঞ্জিকে জানানো দরকার না ?'

'যেখানে আছে সেখানেই থাকুক,' দৃঢ়কণ্ঠে, নির্দেশের সুরে বললো রানা। 'রেডিওর ধারেকাছে যাবেন না। ক্যাপটেনকে আমরা নিজেরা গিয়ে রিপোর্ট করবো। আপনার লোকজনদের সবাইকে বাইরে রাখুন, কেউ যেন প্লেনের ভেতর না ঢোকে। ভালো হয় দরজাটা সীল করে দিলে। আপনার মেডিকেল টিম সম্পর্কেও একই কথা, ডঃ মার্কস। জরুরী প্রয়োজন ছাড়া কেউ কিছু স্পর্শ করবেন না।'

'কিন্তু...,' প্রতিবাদের সুরে শুরু করলো লেঃ ফিলিপ।

'আমাদের বোধবুদ্ধির বাইরে একটা কিছু ঘটেছে এখানে,' তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো রানা, 'দুর্ঘটনার খবর এরইমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এয়ার-ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেটর আর রিপোর্টাররা ভিড় জমাবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ না করা পর্যন্ত কেউ আমরা কারো কাছে মুখ খুলবো না।'

আবার কিছু বলতে গেল লেঃ ফিলিপ, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো সে। 'ঠিক আছে, মিঃ রানা।'

'তাহলে চলুন দেখা যাক কেউ বেঁচে আছে কিনা।'

বিশ সেকেণ্ডের পথ বাথরুমগুলো, পানি ঠেলে পৌঁছুতে দু'মিনিট লাগলো রানার। এরইমধ্যে ওর পা অসাড় হয়ে গেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে গরম করে না নিলে ওগুলো যে ফ্রস্টবাইটের শিকার হবে তা জানার জন্যে ডঃ মার্কসের উপদেশ দরকার নেই ওর।

প্লেনের ধারণ ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করা হলে আরো বহু লোক মারা যেতো। অনেক সিট খালি থাকা সত্ত্বেও তিপ্পান্নটি লাশ গুণলো রানা। পিছনের বাল্কহেড ঘেঁষে সিটে বসা একজন মহিলা ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্টকে পরীক্ষা করলো ও। তার মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, পানিতে ঝুলে পড়েছে সোনালি চুল। পালস্ নেই।

একটা কমপার্টমেণ্টের ভেতর ঢুকলো রানা, এটার ভেতরই বাথ-রুমগুলো। তিনটে দরজার মাথায় 'খালি' চিহ্ন দেখে ভেতরে উঁকি দিলো ও। কেউ নেই ভেতরে। চার নম্বরটা রয়েছে 'খালি নয়' চিহ্ন, ভেতর থেকে বন্ধ। তারমানে ভেতরে কেউ আছে। সজোরে কয়েক-বার নক করলো ও, তারপর ডাকলো, 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?' ইংরেজিতে করলো প্রশ্নটা। 'ভাষা ঠিক আছে? আমরা আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্যে এসেছি। প্লিজ, দরজা খোলার চেষ্টা করুন।'

কবাটে কান ঠেকালো রানা। মনে হলো কেউ যেন ফুঁপিয়ে উঠলো নিচু গলায়। তারপরই শোনা গেল ফিসফিসে আওয়াজ, যেন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে দু'জন মানুষ।

গলা চড়ালো রানা, 'পিছিয়ে যান। দরজা ভাঙছি।'

ভেজা পা তুলে দরজার গায়ে লাথি মারলো রানা। খুব জোরে নয়, শুধু হুড়কো বা ছিটকিনি ভাঙতে চায়। কবাট ভেঙে পড়লে ভেতরে যারা আছে তারা আহত হতে পারে। দ্বিতীয় লাথিতে কাজ হলো।

বাথরুমের পিছনের একটা কোণে, টয়লেট প্ল্যাটফর্মের ওপর, দু'জন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে। একজন থরথর করে কাঁপছে, পরনে ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্টের ইউনিফর্ম, দ্বিতীয় ভদ্রমহিলাকে আঁকড়ে ধরে আছে সে। তার মাথাটা নিজের কাঁধে নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ভদ্রমহিলা। কোনো সন্দেহ নেই ভয় পেয়েছেন তিনিও, তবে তাঁর চেহারায় সন্দেহ আর কাঠিন্য ফুটে থাকতে দেখলো রানা। চিনতে পারলো ও, এঁকেই জানালায় দেখেছিল। তখন অবশ্য মাত্র একটা চোখ খোলা ছিলো, এখন দুটোই খোলা। ঘৃণা আর সাহস নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। তাঁর গলার সুরে মারমুখো ভাব লক্ষ্য করে অবাক না হয়ে পারলো না ও। 'কে আপনি? কি চান?' বিশুদ্ধ ইংরেজি, উচ্চারণ ভঙ্গি খানিকটা আমেরিকান বলে মনে হলো।

'আমার নাম মাসুদ রানা,' বললো রানা, লক্ষ্য করলো নামটা শোনামাত্র প্রায় আঁতকে উঠলেন ভদ্রমহিলা। সেই সাথে তাঁর পরিচয় জেনে ফেললো ও। ভাবলো, আচ্ছা, সেজন্যেই তাহলে চেনা চেনা লাগছিল। 'আমি একজন বাংলাদেশী। তবে এই মুহূর্তে আমার ঠিকানা যুক্তরাষ্ট্রের একটা জাহাজ—আইসব্রেকার শারলট। আপনাদের উদ্ধার করার জন্যে একটা টিম গঠন করা হয়েছে, আমি সেই টিমের সদস্য।'

'যা বললেন প্রমাণ করতে পারবেন?'

'দুঃখিত, ড্রাইভিং লাইসেন্সটা ফেলে এসেছি বাড়িতে।' দরজার গায়ে হেলান দিলো রানা। 'প্লিজ, ভয় পাবেন না,' সম্মানের সুরে নরম গলায় বললো আবার। 'আমরা সাহায্য করতে এসেছি, ক্ষতি করতে নয়।'

ভদ্রমহিলার কাঁধ থেকে মাথা তুলে ক্ষীণ একটু হাসলো ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্ট, তারপরই আবার কি মনে করে ফুঁপিয়ে উঠলো।

'ওরা সবাই মারা গেছে, খুন!'

'হ্যাঁ, জানি,' শান্তস্বরে বললো রানা, একটা হাত বাড়িয়ে দিলো। 'ধরুন। আপনাদের চিকিৎসা দরকার। আমাদের সাথে ডাক্তার আছেন। এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকলে…।'

'বুঝবো কিভাবে আপনি টেরোরিস্টদের একজন নন?' আগের মতোই কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রমহিলা। 'তারাই তো এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী। কেন আপনাকে আমরা বিশ্বাস করবো?'

'বিশ্বাস করবেন এই জন্যে আমি টেরোরিস্ট তো নই-ই, বরং উল্টোটা সত্যি। জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টিটেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনে আমি একটা দায়িত্ব পালন করি। বিশ্বাস করবেন এই জন্যে যে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আপনারা মারা যাবেন।'

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে রানাকে ভালো করে লক্ষ্য করলেন ভদ্রমহিলা। তারপর বললেন, 'হাতটা সরিয়ে নিন। আমি নিজেই বেরুতে পারবো। উদ্ধার করতে এসেছেন, সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

হাতটা না সরিয়ে ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্টকে ধরলো রানা। 'পেশী ঢিল করে দাও,' সহাস্যে বললো ও। 'নতুন জীবন ফিরে পেয়েছো, সেজন্যে ধন্যবাদ দাও ভাগ্য আর মাসুদ রানাকে। আর কথা দাও,

কাল আমার সাথে ডিনার খাবে।'

'আমার স্বামীও কি সাথে থাকতে পারে?' রানার হাসিখুশি চেহারা আর সকৌতুক আলাপ টনিকের মতো কাজ করলো, কয়েক সেকেণ্ডেই নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে ফ্লাইট অ্যাটেনড্যাণ্ট।

'নিশ্চয়ই পারে,' জবাব দিলো রানা। 'যদি বিলটা দিতে রাজি থাকে সে।'

'আমি হাঁটতে পারবো বলে মনে হয় না,' বলে রানার ঘাড় জড়িয়ে ধরলো মেয়েটা। হাসি গোপন করে তাকে দু'হাতের ওপর তুলে নিলো উদ্ধার কর্তা। ঘাড় ফিরিয়ে ভদ্রমহিলার দিকে তাকালো ও। 'দয়া করে ভুলেও পানিতে নামতে যাবেন না। এখুনি আপনার জন্যে ফিরে আসছি আমি।'

এই প্রথম উম্মে সালিহা উপলব্ধি করলেন, তিনি নিরাপদ। সেই সাথে দুঃস্বপ্নটার কথা ভেবে কান্না পেলো তাঁর।

চীফ স্টুয়ার্ড বুঝতে পারলো, সে মারা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা বা ব্যথা, কিছুই অনুভব করছে না। অচেনা কণ্ঠস্বর, আকস্মিক আলো, এ-সবের কোনো অর্থ খুঁজে পেলো না সে। নিজেকে তার বিচ্ছিন্ন, বিচ্যুত বলে মনে হলো। অলস মস্তিষ্কে চিন্তা শক্তি লোপ পেতে যাচ্ছে। যা কিছু ঘটছে সব যেন অতীত থেকে উঠে আসা অস্পষ্ট স্মৃতি, কবে যেন ঘটেছিল।

বিধ্বস্ত ককপিট হঠাৎ সাদা উজ্জ্বলতায় ভরে উঠলো। কোনো কোনো মানুষ দাবি করে মৃত্যুর পর পৃথিবীতে আবার ফিরে এসেছে তারা, তাহলে সে-ও কি তাই আসছে? শরীরবিহীন একটা কণ্ঠস্বর কাছ থেকে কথা বলে উঠলো, 'শক্ত হোন, সাহস করুন, সাহায্য এসে গেছে।'

চোখ মেলে অস্পষ্ট মূর্তিটাকে চেনার চেষ্টা করলো চীফ স্টুয়ার্ড।

'আপনি কি ঈশ্বর?'

মুহূর্তের জন্যে ভাবলেশহীন হয়ে গেল লেঃ ফিলিপের চেহারা। তারপর সকৌতুকে হাসলো সে। 'না। স্রেফ মরণশীল একজন মানুষ, ঘটনাচক্রে আপনাদের প্রতিবেশী।'

'আমি মারা যাইনি?'

'দুঃখিত, বয়স আন্দাজ করতে যদি ভুল না করে থাকি, আপনাকে আরো পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা করতে হবে।'

'আমি নড়তে পারছি না। পা দুটো যেন পেরেকের সাথে আটকে আছে। বোধ হয় ভেঙে গেছে···প্লিজ, বের করুন আমাকে।'

'ধৈর্য ধরুন, আপনাকে উদ্ধার করতেই এসেছি আমি।' চামড়ার দস্তানা পরা হাত দিয়ে ব্যস্ততার সাথে প্রায় এক ফুট তুষার আর বরফ সরিয়ে ফেললো লেঃ ফিলিপ, চীফ স্টুয়ার্ডের বুক আর পেট মুক্ত হলো, ছাড়া পেলো হাত দুটো। 'এবার আপনি নাক চুলকাতে পারবেন। শাবল আর যন্ত্রপাতি নিয়ে এখুনি ফিরবো আমি।'

মেইন কেবিনে ফিরে এসে ফিলিপ দেখলো, ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্টকে বুকে নিয়ে ভেতরে ঢুকছে রানাও। ডঃ মার্কসের হাতে মেয়েটাকে তুলে দিলো ও।

'ডঃ মার্কস,' বললো ফিলিপ। 'ককপিটে একজন বেঁচে আছে।'

'এই এলাম বলে।'

রানার দিকে তাকালো ফিলিপ, 'আপনার সাহায্য পেলে ভালো হয়···।'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'দু'মিনিট সময় দিন। বাথরুম থেকে একজন ভি. আই. পি.-কে নিয়ে আসি আগে।'

❋

হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হলেন উম্মে সালিহা, ঝুঁকে আয়নার দিকে তাকালেন। নিজের প্রতিবিম্ব দেখার জন্যে আলোর আভা যথেষ্টই রয়েছে বাথরুমে। যে-মুখটা তাঁর দিকে পাল্টা দৃষ্টি ফেললো, হঠাৎ দেখে তিনি চিনতে পারলেন না—শুকনো, নির্লিপ্ত চেহারা, চোখে কোনো ভাষা নেই। ভাগ্যাহত রাস্তার মেয়েদের একজন বলে মনে হলো, পুরুষের হাতে বেদম মারধর খেয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে।

র‍্যাক থেকে টেনে কয়েকটা পেপার টাওয়েল নামালেন তিনি, ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে মুখ থেকে রক্ত আর লিপস্টিক মুছলেন। মাসকারা আর আইশ্যাডো-ও চোখের চারপাশে লেপে-মুছে একাকার হয়ে গেছে, তাও পরিষ্কার করলেন। চুল মোটামুটি ঠিকঠাকই আছে, শুধু আলগা প্রান্তগুলো হাত দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় সরিয়ে দিলেন।

আয়নায় চোখ রেখে ভাবলেন, এখনো বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে চেহারা। রানাকে ফিরে আসতে দেখে জোর করে একটু হাসলেন তিনি, আশা করলেন নিজেকে অন্তত পরিবেশনযোগ্য করে তুলতে পেরেছেন।

দীর্ঘ এক সেকেণ্ড মহাসচিবের দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা, তারপর কৌতুক করার লোভ সামলাতে না পেরে সবিনয় কোমল সুরে জিজ্ঞেস করলো, 'মাফ করবেন, গর্জিয়াস ইয়াং লেডি, এদিকে কোনো বুড়ি ডাইনীকে দেখেছেন নাকি ?'

চোখে পানি বেরিয়ে এলেও উম্মে সালিহা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসলেন। 'ইউ আর আ নাইস ম্যান, মিঃ রানা। থ্যাঙ্ক ইউ।'

'আই ট্রাই, গড নোজ, আই ট্রাই।' কয়েকটা কম্বল এনেছে রানা, সেগুলো মহাসচিবের গায়ে জড়িয়ে দিলো। তারপর একটা হাত রাখলো তাঁর হাঁটুর নিচে, আরেকটা তাঁর কোমরের চারদিকে, অনা-

য়াস ভঙ্গিতে তুলে নিলো শরীরটা বাথরুম প্লাটফর্ম থেকে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আল ধরে এগোলো ও, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে।

রানা একবার হোঁচট খেতেই উম্মে সালিহা উদ্বেগের সাথে জানতে চাইলেন, 'আর ইউ অলরাইট ?'

'শুধু গরম এক কাপ কফির অভাব বোধ করছি, বাকি সব ঠিক আছে,' সহাস্যে জবাব দিলো রানা।

'বাড়ি ফিরে আপনাকে আমি কফি খাবার আমন্ত্রণ জানাবো,' প্রতিশ্রুতি দিলেন উম্মে সালিহা।

'বাড়ি কোথায় ?'

'আপাততঃ নিউ ইয়র্কে।'

'পরেরবার আমি যখন নিউ ইয়র্কে যাবো, আপনি আমার সাথে ডিনার খাবেন ?'

'দুর্লভ একটা সম্মান বলে মনে করবো, মিঃ রানা।'

'উল্টোটাও সত্যি, মিস সালিহা।'

ভুরু জোড়া একটু ওপরে তুললেন মহাসচিব। 'এই বিধ্বস্ত চেহারায় আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন ?'

'দেখামাত্র চিনতে পারিনি বলে নিজের ওপর এখনো আমার রাগ রয়েছে।'

'আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। আপনার পা নিশ্চয়ই অবশ হয়ে গেছে ?'

'লোককে বলতে পারবো ইউ. এন. সেক্রেটারী জেনারেলকে দু'হাতে বয়ে এনেছি, তার তুলনায় কষ্টটুকু কিছুই নয়।' অদ্ভুত, সত্যি অদ্ভুত, ভাবলো রানা। আজ কার মুখ দেখে ঘুম ভেঙেছিল ওর ? এমন সাফল্য রোজ রোজ জোটে না ভাগ্যে। একই দিনে তিন তিনটে সুন্দরী মেয়ে-

কে ডিনার খাবার প্রস্তাব দেয়ার সুযোগ ক'জন পায়। কোনো সন্দেহ নেই, এটা একটা রেকর্ড। সভ্যতা থেকে দু'হাজার মাইল দূরে, জনমানবহীন বরফের রাজ্যে, মাত্র ত্রিশ মিনিট সময়সীমার ভেতর এই সাফল্য—ভাবা যায় না।

পনেরো মিনিট পর। চীফ স্টুয়ার্ড আর ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্টের সাথে হেলিকপ্টারে আরাম করে বসে আছেন উম্মে সালিহা। ককপিটের সামনে দাঁড়িয়ে বেন নেলসনের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লো রানা, বেন নেলসন পাল্টা সংকেত দিলো। ঘুরতে শুরু করলো রোটর, তারপর তুষারের ঝড় তুলে আকাশে উঠে পড়লো 'কপ্টার। একশো আশি ডিগ্রী বাঁক নিয়ে ছুটে চললো আইসব্রেকার শারলক অভিমুখে। এতোক্ষণে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হিটিং ইউনিটের দিকে এগোলো রানা।

পানি ভরা বুট আর ভিজে ভারি হয়ে ওঠা মোজা খুলে ফেললো ও, পা দুটো ঝুলিয়ে রাখলো এগজস্টের ওপর। রক্ত চলাচল নতুন করে শুরু হতে ব্যথা অনুভব করলো, সহ্য করলো মুখ বুজে। খেয়াল করলো, পাশে এসে দাঁড়ালো লেঃ ফিলিপ।

বিধ্বস্ত প্লেনটাকে দেখছে ফিলিপ। 'জাতিসংঘের প্রতিনিধিদল?' অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞেস করলো সে। 'আসলেও কি তাই?'

'কয়েকজন ছিলেন সাধারণ পরিষদের সদস্য,' বললো রানা। 'বাকি সবাই জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সির ডিরেক্টর বা এইড। উম্মে সালিহা জানালেন, ফিল্ড সার্ভিস অর্গানাইজেশনের একটা ট্যুর থেকে ফিরছিলেন ওঁরা।'

'ওঁদের মেরে কার কি লাভ?'

মোজা জোড়া হিটার টিউবের ওপর শুকোতে দিলো রানা। 'কি

করে বলবো ?'

'মধ্যপ্রাচ্যের টেরোরিস্টরা দায়ী ?' ফিলিপ নাছোড়বান্দা।

'তারা বিষ খাইয়ে মানুষ মারতে শুরু করেছে, এটা আমার কাছে নতুন খবর।'

'আপনার পা কেমন ?'

'ঠিকই আছে। আপনার ?'

'নেভি ইস্যু ফাউল-ওয়েদার বুটজোড়াকে ধন্যবাদ। পা দুটো গরম টোস্টের মতো শুকনো। আমার ধারণা,' আবার প্রসঙ্গে ফিরে এলো ফিলিপ, 'জীবিত তিনজনের একজন দায়ী।'

মাথা নাড়লো রানা। 'সত্যি যদি প্রমাণ হয় যে বিষক্রিয়াতেই মারা গেছেন ওঁরা, তাহলে ধরে নিতে হবে প্লেনে তোলার আগে ফুড সার্ভিস কিচেন থেকে বিষ মেশানো হয়েছে খাবারে।'

'কেন, চীফ স্টুয়ার্ড বা ফ্লাইট অ্যাটেনড্যাণ্ট গ্যালিতে বসে কাজটা করতে পারে না ?'

'কারো চোখে ধরা না পড়ে পঞ্চাশ ষাটজন লোকের খাবারে বিষ মেশানো অত্যন্ত কঠিন।'

'খাবার না হয়ে, ড্রিঙ্কেও তো হতে পারে।'

'হ্যাঁ, হতে পারে—বিশেষ করে কফি আর চা-য়ে।'

মনে মনে ভারি খুশি হলো ফিলিপ, তার একটা ধারণা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে বলে। 'তাহলে বলুন তো দেখি, মিঃ রানা, তিনজনের মধ্যে কাকে আপনার সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হয় ?'

'তিনজনের একজনকেও নয়।'

'তারমানে কি আপনি বলতে চাইছেন জেনেশুনে বিষ খেয়ে আত্ম-হত্যা করেছে কালপ্রিট ?' তাজ্জব হয়ে জানতে চাইলো ফিলিপ।

'না, আমি চার নম্বর লোকটার কথা বলছি।'

'চার নম্বর!' হাঁ হয়ে গেল ফিলিপ। 'কিন্তু আমরা তো মাত্র তিন-জনকে জীবিত উদ্ধার করেছি!'

'প্লেন ক্র্যাশ করার পর। তার আগে চারজন ছিলো ওরা।'

'আপনি নিশ্চয়ই মেক্সিকান লোকটার কথা বলছেন না, ককপিটের সিটে যাকে দেখলাম?'

'হ্যাঁ, আমি তার কথাই বলছি।'

হতভম্ব হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো লেঃ ফিলিপ। 'এই উপসংহারে পৌঁছুনোর পক্ষে অকাট্য কোনো যুক্তি দেখাতে পারবেন আপনি, মিঃ রানা?'

'উঁচুদরের রহস্যকাহিনী পড়া নেই আপনার?' মুচকি হাসলো রানা। 'জানেন না, রহস্য বা হত্যাকাণ্ডের ঐতিহ্য হলো সবচেয়ে যাকে কম সন্দেহ করা যায়, সে-ই শেষ পর্যন্ত খুনী প্রমাণিত হয়?'

আট

'এমন জঘন্য তাস কে বাঁটলো?' চেহারায় অসন্তোষ নিয়ে প্রশ্ন করলেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। কার্ডের ওপর চোখ

বুলাচ্ছেন তিনি, কার্ডের কিনারা দিয়ে চুরি করে তাকাচ্ছেন অন্যান্য খেলোয়াড় সঙ্গীদের দিকে, চোখে চিকচিক করছে কৌতুক।

পোকার টেবিলে বসে পাঁচজন খেলছেন ওঁরা। কেউ ধূমপান করছেন না, তবে রাহাত খানের হাতে একটা চুরুট রয়েছে, এখনো ধরাননি। ইয়টটা বিল হ্যারিংটনের, তিনি মার্কিন সরকারের পলিটিকাল অ্যাফেয়ার্স দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী। পঁয়ত্রিশ মিটার ইয়ট নোঙর ফেলেছে পটোম্যাক নদীতে, সাউথ আইল্যাণ্ডের কাছাকাছি—আলেকজান্দ্রিয়া, ভার্জিনিয়ার ঠিক উল্টোদিকে।

অপর সঙ্গীদের মধ্যে একজন হলেন সোভিয়েত মিশন-এর ডেপুটি চীফ সের্গেই লুতরভ। দৈহিক গড়নে বিল হ্যারিংটনের ঠিক উল্টো তিনি, লম্বায় একটু কম কিন্তু চওড়ায় বিশাল। ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক সমাজে তাঁর হাসিখুশি চেহারা অত্যন্ত পরিচিত। রাহাত খান অসন্তোষ প্রকাশ করায় তিনিই প্রথম তাঁকে সমর্থন করলেন। 'আমাদের দেশে সাইবেরিয়া বলে চমৎকার একটা জায়গা আছে, খেলাটা যদি মস্কোয় হতো তাহলে ডিলারকে সেখানে পাঠানোর ব্যাপারে তদবির করতাম আমি।'

বিল হ্যারিংটন ডিলারের দিকে তাকালেন। 'পরের বার, জিমি, কার্ড ভালো করে ফেঁটে নিয়ো, বুঝলে হে। সের্গেই তোমাকে সাইবেরিয়ায় পাঠাতে চাইছে, আর রাহাত হয়তো চাইবে সামরিক আইনে তোমার বিচার করতে।'

কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে জিমি উইলফোর্স, মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ অ্যাসিস্ট্যান্ট, বললেন, 'এতোই যদি খারাপ হয় কার্ড, রেখে দিলেই তো পারো।' ভুরু কুঁচকে রাহাত খানের দিকে তাকালেন তিনি। 'তাছাড়া, তোমাদের তো অভিযোগ করা সাজে না

হে ! এখন পর্যন্ত এক সেণ্টও জিততে পারিনি—না আমি, না বিল। একটানা তুমি আর সের্গেই জিতছো। ম্যাক্সিম বোধহয় সমান সমান আছো, তাই না ?'

সোভিয়েত দূতাবাসের বিশেষ উপদেষ্টা ম্যাক্সিম ইউরোপভ মাথা ঝাঁকালেন।

খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করলেন রাহাত খান। 'আমাকে তো জিততেই হবে। ভেবে দেখো না, ছুনিয়ার আরেক প্রান্ত থেকে শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে বেড়াতে এসেছি। অন্তত প্লেন ভাড়াটা তুলতে হবে না ?'

'পঞ্চাশ সেন্টে শুরু করছি আমি,' বললেন বিল হ্যারিংটন।

'বাড়িয়ে এক ডলার করলাম ওটাকে,' বললেন সের্গেই লুতরভ।

'বোঝা গেল, রাশিয়ায় জিনিস-পত্রের দাম কেন বাড়ছে !' ব্যঙ্গের সুরে মন্তব্য করলেন জিমি উইলফোর্স।

রাহাত খান সের্গেই লুতরভের দিকে না তাকিয়েই তাঁকে একটা প্রশ্ন করলেন, 'মিশরে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে পারে কি পারে না, এর ওপর ভবিষ্যদ্বাণী করো তো, হে।'

'প্রেসিডেণ্ট হোসেন ইসমাইলকে ত্রিশ দিনের বেশি সময় দেবো না, এরই মধ্যে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবে মোস্তফা কামাল।'

'তুমি প্রলম্বিত যুদ্ধ দেখতে পাচ্ছো না ?'

'না, বিশেষ করে সামরিক বাহিনী যদি সমর্থন করে মোস্তফা কামালকে।'

'তুমি আছো, রাহাত ?' জিজ্ঞেস করলেন জিমি উইলফোর্স।

'শেষ পর্যন্ত।' পটে তিনটে চিপস্ ফেললেন রাহাত খান, প্রতিটি পঞ্চাশ সেন্টের।

'মোবারক পদত্যাগ করার পর যেদিন থেকে ইসমাইল ক্ষমতা পেয়েছেন, অল্প দিন হলেও, ইতিমধ্যে স্থিতিশীলতার একটা পর্যায় পর্যন্ত তুলে আনতে পেরেছেন মিশরকে,' বললেন বিল হ্যারিংটন। 'আমার ধারণা, তিনি টিকে যাবেন।'

'তুমি তো ইরানের শাহ্ সম্পর্কেও এই কথাই বলেছিলে, হে।' অভিযোগের সুরে বললেন ম্যাক্সিম ইউরোপভ।

'মানলাম, হারু পার্টির পক্ষে বাজি ধরেছিলাম আমরা,' বিল হ্যারিংটন তাস ফেলে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আমাকে দুটো তাস দাও।'

সের্গেই লুতরভ নিজের কার্ড তুলে নিয়ে বললেন, 'তোমাদের বিপুল এইড তলাবিহীন ঝুড়িতে ফেলা হচ্ছে কিনা, সেটাই হলো প্রশ্ন। মিশরীয় জনতা অভুক্ত থাকার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এমন উৎকট অভাবের কারণেই তো বস্তি আর গ্রামগুলোয় ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ছে আগুনের মতো। এটা-সেটা করে খোমেনিকে যেভাবে বেশি বাড়াবাড়ি করতে দাওনি, যদি ভেবে থাকো মোস্তফা কামালকেও কেটেছেঁটে সাইজে রাখতে পারবে তাহলে হয়তো ভুল করবে তোমরা।'

'আমার জানার কৌতূহল, মস্কোর ভূমিকা কি হবে?' প্রশ্ন করলেন রাহাত খান।

'আমরা অপেক্ষা করবো,' শান্তভাবে বললেন সের্গেই লুতরভ। 'আগুন না নেভা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো আমরা।'

নিজের কার্ডের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে বিল হ্যারিংটন বললেন, 'যাই ঘটুক না কেন, কেউ লাভবান হবে না।'

'কথাটা ঠিক, হারবো আমরা সবাই। তোমরা হয়তো মৌলবাদীদের দৃষ্টিতে মহা শয়তান, কিন্তু কমিউনিস্ট হিসেবে আমাদেরকেও ভালোবাসা হয় না। তোমাকে বলার দরকার করে না, সবচেয়ে কম ক্ষতি

হবে ইসরায়েলের। এমনকি তারা লাভবানও হতে পারে। মৌলবাদী-দের বিজয় হলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দুশো বছর পিছিয়ে যাবে মিশর। দুর্বল প্রতিপক্ষের কাছ থেকে কতো রকম সুযোগই না আদায় করা যায়।'

'তোমার বেট,' রাহাত খানকে বললেন জিমি উইলফোর্স।

'দু'ডলার।'

'চারে তুলে দিলাম,' বললেন সের্গেই লুতরভ।

জিমি উইলফোর্স হাতের কার্ড টেবিলে ফেলে দিলেন, 'আমি নেই।'

'আমিও চার,' বললেন রাহাত খান।

নক হলো দরজায়, ভেতরে ঢুকলো বোটের স্কিপার। 'মিঃ হ্যারিং-টন, আপনার একটা জরুরী ফোন।'

'এক্সকিউজ মি,' বলে চেয়ার ছাড়লেন বিল হ্যারিংটন। ইয়টে খেলতে বসে সবাই কয়েকটা শর্ত মেনে চলেন, তার মধ্যে একটা হলো, ভয়ানক জরুরী ফোন ছাড়া, সেটা উপস্থিত সবার জন্যে জরুরী হতে হবে, কেউ টেবিল ছেড়ে উঠতে পারবেন না।

'তোমার বেট, ম্যাক্সিম,' বললেন রাহাত খান।

'আরো চার ডলার।'

'আই কল।'

অসহায় ভঙ্গিতে কার্ড উল্টো করে টেবিলে মেলে দিলেন ম্যাক্সিম ইউরোপভ। শুধু একজোড়া চার রয়েছে তাঁর।

মুচকি হেসে একজোড়া ছয় দেখালেন রাহাত খান।

'ওহ্, গুড লর্ড!' হায় হায় করে উঠলেন জিমি উইলফোর্স। 'এক-জোড়া কিং নিয়ে অফ গেছি আমি!'

'তোমার লাঞ্চের টাকাগুলো গচ্চা খেলো, ম্যাক্সিম,' সহাস্যে বল-

লেন সের্গেই লুতরভ। রাহাত খানের দিকে তাকালেন তিনি। 'তাহলে দু'জনই পরস্পরকে ব্লাফ দিয়েছি। এই মুহূর্তে একটা তাগাদা অনুভব করছি, কে. জি. বি, চীফকে সাবধান করে দেয়া দরকার সে যেন ভুলেও তোমার সাহায্য না চায়।'

'সে সাবধান হবে না,' জিমি উইলফোর্স হেসে উঠে বললেন। 'কারণ উল্টোটাই সত্যি বলে জানে সে।'

রুমে ফিরে এসে টেবিলে আবার বসলেন বিল হ্যারিংটন। 'যেতে হয়েছিল বলে দুঃখিত। কিন্তু ব্যাপার হলো, এইমাত্র আমাকে জানানো হয়েছে, জাতিসংঘের চার্টার করা একটা প্লেন গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তর উপকূলে বিধ্বস্ত হয়েছে। লাশ উদ্ধার করা হয়েছে পঞ্চাশের ওপর। কেউ বেঁচে আছে কিনা এখনো জানা যায়নি।'

'কোনো সোভিয়েত প্রতিনিধি ছিলো?' প্রশ্ন করলেন ম্যাক্সিম ইউরোপভ।

'আরোহীদের তালিকা এখনো আসেনি।'

'টেরোরিস্টদের বোমা নাকি?'

'এখুনি বলা সম্ভব নয়, তবে প্রাথমিক আভাসে বলা হয়েছে ব্যাপারটা দুর্ঘটনা নয়।'

'ফ্লাইট কি ছিলো?' জিমি উইলফোর্স জিজ্ঞেস করলেন।

'লণ্ডন টু নিউ ইয়র্ক।'

'উত্তর গ্রীনল্যাণ্ড?' চিন্তিতভাবে পুনরাবৃত্তি করলেন জিমি উইলফোর্স। 'কোর্স ছেড়ে হাজার মাইল দূরে সরে গেল!'

'হাইজ্যাকিঙের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে,' বললেন ম্যাক্সিম ইউরোপভ।

'উদ্ধারকারী দল পৌঁচেছে,' ব্যাখ্যা করলেন বিল হ্যারিংটন। 'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আরো খবর পাওয়া যাবে।'

থমথম করছে রাহাত খানের চেহারা, এতোক্ষণে চুরুটটা ধরালেন তিনি। 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, ওই ফ্লাইটে উম্মে সালিহা আছেন। সামনের হপ্তায় সাধারণ পরিষদের অধিবেশন, ইউরোপ থেকে হেড-কোয়ার্টারে ফেরার কথা তাঁর।'

'রাহাত বোধহয় ঠিকই সন্দেহ করছে,' বললেন ম্যাক্সিম ইউরোপভ। 'আমাদেরও দু'জন প্রতিনিধি তাঁর পার্টির সাথে ভ্রমণ করছে।'

'এ স্রেফ পাগলামি,' বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে মাথা নাড়লেন বিল হ্যারিংটন। 'অর্থহীন পাগলামি। প্লেন ভর্তি জাতিসংঘ প্রতিনিধিকে মেরে কার কি লাভ?'

কেউই সাথে সাথে উত্তর দিলো না। দীর্ঘ একটা নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধতে শুরু করলো। সের্গেই লুতরভ তাকিয়ে আছেন টেবিলের মাঝখানে। অনেকক্ষণ পর শান্তস্বরে তিনি শুধু উচ্চারণ করলেন, 'মোস্তফা কামাল।'

সিনেটর বিল হ্যারিংটন রুশ ডিপ্লোম্যাটের চোখে সরাসরি তাকালেন। 'তুমি জানতে।'

'অনুমান।'

'তোমার ধারণা মোস্তফা কামাল উম্মে সালিহাকে খুন করার নির্দেশ দিয়েছে?'

'আমাদের ইন্টেলিজেন্স জানতে পারে, কায়রোর একটা মৌলবাদী উপদল উম্মে সালিহকে খুন করার প্ল্যান নিয়ে ভাবছে।'

'অথচ চুপচাপ দাঁড়িয়ে মজা দেখেছো, লাভের মধ্যে পঞ্চাশজন নিরীহ মানুষ মারা গেল!'

'হিসেবের গরমিল,' স্বীকার করলেন সের্গেই লুতরভ। 'কখন বা কোথায় খুন করার চেষ্টা করা হবে তা আমরা জানতে পারিনি। ধরে

নেয়া হয়েছিল, উম্মে সালিহা শুধু যদি মিশরে ফেরেন তাহলে বিপদ হবে তাঁর। না, মোস্তফা কামালের তরফ থেকে নয়, বিপদ হবে তার ফ্যানাটিক অনুসারীদের দ্বারা। সন্ত্রাসবাদী কোনো তৎপরতার সাথে কখনোই জড়ানো সম্ভব হয়নি মোস্তফা কামালকে। তার সম্পর্কে তোমাদের আর আমাদের রিপোর্টে কোনো পার্থক্য নেই। প্রতিভাবান এক ধর্মীয় নেতা, নিজেকে যে মুসলিম গান্ধী বলে মনে করে।'

'এই হলো কে. জি. বি. আর সি. আই. এ.-র দৌড়!' ক্ষোভের সাথে বললেন ম্যাক্সিম ইউরোপভ।

'হ্যাঁ, এসপিওনাজ এজেন্সি আকারে-আয়তনে খুব বেশি বড় হয়ে গেলে তাদের কাজ হয়ে পড়ে ছকবাঁধা। জনমতের ওপর ভিত্তি করে রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। যা ভাবা হয়েছিল, লোকটা তারচেয়ে অনেক বড় সাইকো কেস।'

জিমি উইলফোর্স সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন। 'দুঃখজনক ঘটনাটার জন্যে দায়ী হতে হবে মোস্তফা কামালকেই। তার সমর্থন ছাড়া অনু-সারীরা এতো বড় একটা ক্রাইম করতে পারে না।'

'তার মোটিভ আছে,' বললেন রাহাত খান। 'উম্মে সালিহা এমন একটা আকর্ষণ, তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা মিশরীয়দের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি তাঁর একার যোগ্যতায় গোটা মিশরকে সারা দুনি-য়ার চোখে দুর্লভ একটা সম্মানের আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। শুধু জনসাধারণের মধ্যে নয়, সামরিক বাহিনীতেও তাঁর জনপ্রিয়তা প্রেসি-ডেন্ট ইসমাইলের জনপ্রিয়তাকে ছাড়িয়ে গেছে। স্বাভাবিক কারণেই মোস্তফা কামাল তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে। উম্মে সালিহা মারা যাবার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চরমপন্থী মোল্লারা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবে।'

'কিন্তু ইসমাইলের পতন হবার পর?' ঠোঁটে ধারালো হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সের্গেই লুতরভ। 'হোয়াইট হাউস তখন কি করবে?'

বিল হ্যারিংটন আর জিমি উইলফোর্স দৃষ্টি বিনিময় করলেন। 'কেন, রাশিয়ানরা যা করবে আমরাও তাই করবো,' বললেন বিল হ্যারিংটন। 'আগুন না নেভা পর্যন্ত অপেক্ষা।'

'কিন্তু যদি চরমপন্থী মিশরীয় সরকার অন্যান্য আরব দেশগুলোকে সাথে নিয়ে ইসরায়েলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?' সের্গেই লুতরভের গলা তীক্ষ্ণ হলো।

'অবশ্যই ইসরায়েলকে আমরা সাহায্য করবো, অতীতে যেমন করেছি।'

'তোমরা কি মার্কিন সৈন্য পাঠাবে?'

'বোধহয় না।'

'আরব চরমপন্থী নেতারা সেটা জানে, কাজেই তারা হাতে ক্ষমতা পেলে নির্ভয়ে ইসরায়েলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

'সৈন্য পাঠাবো না তা ঠিক,' গম্ভীর সুরে বললেন বিল হ্যারিংটন, 'কিন্তু এবার আমরা নিউক্লিয়ার উইপন ব্যবহার করতে ইসরায়েলকে বাধাও দেবো না খুব সম্ভব ওদেরকে আমরা কায়রো, দামেস্ক আর বৈরুত দখল করতে দেবো।'

'তুমি বলতে চাইছো, ইসরায়েলিরা পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করতে চাইলে তোমাদের প্রেসিডেন্ট আপত্তি করবেন না?'

'অনেকটা তাই,' নির্লিপ্ত সুরে বললেন বিল হ্যারিংটন। জিমি উইলফোর্সের দিকে ফিরলেন তিনি। 'কার ডিল?'

'বোধহয় আমার,' বললেন রাহাত খান, ওদের আলাপ শুনলেও তাঁর চেহারা সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন। মন্তব্যটা তিনি মৃদু কণ্ঠে, শান্তভাবে, ধীরে ধীরে করলেন, 'আমার কাছে ব্যাপারটা উদ্বেগজনক বলে মনে

হলো।'

'মাঝে মধ্যে ভূমিকা বদলানোর দরকার পড়ে, নতুন কিছু একটা ঘটা উচিত,' অজুহাত খাড়া করার সুরে বললেন জিমি উইলফোর্স। 'আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দারুণ ফল পেয়েছি আমরা।—আমাদের তেলের রিজার্ভ এখন আশি বিলিয়ন ব্যারেল। প্রতি ব্যারেল যেহেতু পঞ্চাশ ডলারে উঠে যাচ্ছে আমাদের তেল কোম্পানীগুলো এখন বিশাল জায়গা জুড়ে তেল খোঁজার খরচ যোগাতে পারবে। তাছাড়া, মেক্সিকোর রিজার্ভ থেকেও প্রচুর তেল পাবো আমরা। মোদ্দা কথা হলো, তেলের জন্যে মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নির্ভর করার কোন দরকার নেই আমাদের। সোভিয়েত রাশিয়া যদি উপহার চায়, গোটা আরব জাহানই নিয়ে যেতে পারে তারা।'

'তুমি আমার মন্তব্যের ওপর কথা বলছিলে,' জিমি উইলফোর্সকে মনে করিয়ে দিলেন রাহাত খান। 'তুমি যা বললে, এখানে একজন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কর্মকর্তা উপস্থিত রয়েছে, সেজন্যে বলেছো। চরমপন্থা কোনো মঙ্গল ডেকে আনে না, কাজেই চরমপন্থীদের বাড়াবাড়ি সহ্য করা যায় না, এ-ব্যাপারে আমরা সবাই একমত হবো। কিন্তু তারা বাড়াবাড়ি করলে তোমরা সাধারণ নিরীহ মানুষের সর্বনাশ ঘটতে দেবে, তোমার মুখ থেকে শুনেও কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। কথাটা বলে আসলে তুমি বিশ্বস্তসূত্র থেকে জানতে চাইছো, ইসরায়েল পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করলে আরব সরকারগুলোও তা করবে কিনা। আরো সংক্ষেপে, তোমার অনুচ্চারিত প্রশ্নটা ছিলো, মুসলিম প্রধান দেশগুলোর মধ্যে কারো কাছে পারমাণবিক বোমা আছে কিনা।'

থমথমে নিস্তব্ধতা নেমে এলো টেবিলের চারধারে। বিল হ্যারিংটন

ও জিমি উইলফোর্স রাহাত খানের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন, তাঁরা এমনকি প্রতিবাদ করার চেষ্টাও করলেন না। সের্গেই লুতরভ আর ম্যাক্সিম ইউরোপভ তাকিয়ে আছেন মার্কিন প্রতিপক্ষদের দিকে।

'আছে কি নেই, আমি সে প্রশ্নে যাবো না,' বললেন রাহাত খান। 'টপ সিক্রেট। এ-প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বরং এসো আরো কোথায় ভুল করছো তোমরা, সেটা নিয়ে ছু'একটা কথা বলি। বলছো, মধ্যপ্রাচ্যের প্রয়োজন তোমাদের ফুরিয়েছে। তার বদলে ল্যাটিন আমেরিকার কাছ থেকে তেল পাবে। সৎ বন্ধু হিসেবে সাবধান করে দিচ্ছি, সে আশা করো না।'

'কেন? কেন?' সের্গেই লুতরভ ও জিমি উইলফোর্স, ছু'জন এক-যোগে জানতে চাইলেন।

'কেন, তা তোমরা আমার চেয়ে ভালো জানো,' বললেন রাহাত খান। 'শুধু একটা সংকেতের অপেক্ষা, মেক্সিকোয় যে-কোনো মুহূর্তে বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে। ম্যানুয়েল রিভেরা-কে কি মনে করো তোমরা?' ব্যাপারটা সবারই জানা আছে, কাজেই আর কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনি। কার্ড বাঁটতে শুরু করলেন।

সন্দেহ নেই, মিশরের জন্যে রোমহর্ষক একটা অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে ফ্যানাটিক মোস্তফা কামাল। একই কথা খাটে ম্যানুয়েল রিভেরা সম্পর্কে, মেক্সিকোয় রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়ার জন্যে মাথাচাড়া দিয়েছে অশুভ একটা শক্তি। আযটেক কালচারের ওপর ভিত্তি করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন করছে লোকটা। মোস্তফা কামালের মতোই, ম্যানুয়েল রিভেরার জনপ্রিয়তাও গ্রাম আর বস্তি এলাকায় ব্যাপক, তার ভাষণ শোনার জন্যে লক্ষ লক্ষ লোক ভিড় জমায়। অনাহারক্লিষ্ট গরীব মানুষদের সমর্থন নিয়ে রিভেরা আর তার মৌল-

বাদী দল যে-কোনো দিন সরকারকে উৎখাত করতে পারে।

তাস বাঁটতে বাঁটতে রাহাত খান ভাবলেন, হঠাৎ একসাথে এতো-গুলো পাগল কোত্থেকে উদয় হলো? ওদেরকে পরিচালিত করছে কে? কেউ না কেউ শক্তি যোগাচ্ছে তাদের, এ-কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক নয়? অথচ ইসলামী মৌলবাদ আর আযটেক কালচার, দুটোর সাথে কোনো মিল বা সম্পর্কই নেই।

তবু, তাঁর মনে হলো, কোথায় যেন কি একটা যোগাযোগ আছে। এ নিয়ে ভাবতে হবে আরও।

গভীর রাতের ভৌতিক নিস্তব্ধতার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড মূর্তি-গুলো, চোখহীন কোটর মেলে তাকিয়ে আছে দুর্গম অনুর্বর পাহাড় আর প্রান্তরের দিকে, যেন অপেক্ষা করছে তাদের পাষাণ শরীরে প্রাণ সঞ্চার করার জন্যে অজানা কোনো অস্তিত্বের উপস্থিতি ঘটবে। নগ্ন, আড়ষ্ট মূর্তিগুলো, এক একটা দোতলা বাড়ির সমান উঁচু, গম্ভীর মুখের চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে আছে গোল চাঁদের উজ্জ্বল আলোয়।

এক হাজার বছর আগে মূর্তিগুলো একটা মন্দিরের ছাদের অবলম্বন হিসেবে ছিলো। মন্দিরটা ছিলো পাঁচ ধাপে ভাগ করা একটা পিরামিডের মাথায়। কোয়েটজালকোটল পিরামিড আজও টিকে আছে, তবে কালের আঁচড়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে মন্দিরটা। জায়গাটা টুলার টলটেক শহরে। নিচু একটা পাহাড়শ্রেণীর পাশেই এই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, হারিয়ে যাওয়া সুখের দিনে এই শহরে বাস করতো যাট হাজার মানুষ।

খুব কম ট্যুরিস্টই আসে এদিকে, একবার এলে দ্বিতীয়বার কেউ আসতে চায় না জায়গাটার ভৌতিক পরিবেশ আর নির্জনতার জন্যে।

বিধ্বস্ত শহরের আনাচেকানাচে বেঢপ ছায়াগুলো মনে সন্দেহের উদ্রেক করে, গোঙানির শব্দটা বাতাসের কিনা ঠিক বোঝা যায় না। এ-সব কিছু অগ্রাহ্য করে নিঃসঙ্গ একজন মানুষ পিরামিডের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে চূড়ায় বসানো মূর্তিগুলোর দিকে। ভদ্রলোকের পরনে থ্রি-পীস স্যুট, হাতে একটা লেদার অ্যাটাচী কেস।

পাঁচটা টেরেসের প্রতিটিতে থেমে জিরিয়ে নিলেন তিনি, পাথুরে দেয়ালের গায়ে খোদাই করা শিল্পকর্ম দেখলেন। বিশাল সরীসৃপের হাঁ করা মুখ থেকে উঁকি দিচ্ছে মানুষের মুখ, ঈগলের ঠোঁটে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে মানুষের হৃৎপিণ্ড। আবার উঠতে শুরু করলেন ভদ্রলোক, পেরিয়ে এলেন মানুষের খুলি আর হাড় খোদাই করা একটা বেদি। এগুলো প্রাচীন প্রতীক চিহ্ন, ক্যারিবিয়ান জলদস্যুরা ব্যবহার করতো।

পিরামিডের মাথায় উঠে চারদিকে তাকালেন তিনি। ঘামছেন, হাঁপিয়ে গেছেন। না, নিঃসঙ্গ নন ভদ্রলোক। ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো ছুটো মনুষ্য মূর্তি, সার্চ করলো তাঁকে। তারপর তারা হাত-ইশারায় অ্যাটাচী কেসটা দেখালো। বিনীত ভঙ্গিতে সেটা খুললেন ভদ্রলোক। ভেতরের জিনিস-পত্র এলোমেলো করলো লোক ছু'জন, কোনো অস্ত্র না পেয়ে নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে মন্দির মঞ্চের কিনারা লক্ষ্য করে হাঁটা ধরলো।

পেশীতে ঢিল পড়লো পেড্রো ফেডানোর। অ্যাটাচী কেসের হাতলে লুকানো বোতামে চাপ দিলেন তিনি, ঢাকনির ভেতর আড়াল করা ছোট্ট টেপ রেকর্ডার-টা চালু হলো।

দীর্ঘ এক মিনিট পর মূর্তিগুলোর একটা ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো একজন লোক। মেঝে পর্যন্ত লম্বা সাদা কাপড়ের আলখেল্লা পরে আছে সে। লম্বা চুল ঘাড়ের কাছে বাঁধা। চোখ আর নাকের ওপর গোটা

কপাল জুড়ে বহুরঙা নকশা করা মখমলের গোল একটা চাকতি, চাকতির দু'ধার থেকে দুটো চওড়া ফিতে বেরিয়েছে, পেঁচিয়ে আছে কানের ওপর দিয়ে মাথার পিছনটাকে। মাথার সামনের অংশে রেশম আর পাখির পালক খাড়া করে বাঁধা। পা দুটো আলখেল্লার ভেতর, তবে চাঁদের আলোয় বাহুতে পরা বৃত্তাকার ব্যাণ্ড দুটো পরিষ্কার দেখা গেল, সোনার ওপর মণিমুক্তোখচিত।

তেমন লম্বা নয় সে, মসৃণ গোল ধাঁচের মুখাবয়ব ইণ্ডিয়ান পূর্বপুরুষের কথা মনে করিয়ে দেয়। কালো চোখ দিয়ে সামনে দাঁড়ানো ভদ্রলোককে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো সে। দু'জনের বয়সের মধ্যে বিস্তর ফারাক। পেড্রো ফেডানোর বয়স যদি পঞ্চান্ন হয়, লোকটার বয়স হবে সাতাশ। লোকটা বুকের ওপর হাত দুটো ভাঁজ করে বললো, 'আমি রিভেরা।'

'আমার নাম পেড্রো ফেডানো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট তাঁর বিশেষ দূত হিসেবে পাঠিয়েছেন আমাকে।' ফেডানো আশা করেছিলেন আরো বয়স্ক হবে রিভেরা।

নিচু একটা পাঁচিলের দিকে তাকালো ম্যানুয়েল রিভেরা। 'কথা বলার জন্যে ওখানে আমরা বসতে পারি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেলেন ফেডানো, পাঁচিলের মাথায় বসলেন। 'সাক্ষাৎদানের জন্যে অদ্ভুত একটা জায়গা বেছে নিয়েছেন আপনি।'

'হ্যাঁ, তার কারণও আছে—টুলা আমার উদ্দেশ্য পূরণ করবে।' কোনো কারণ নেই, হঠাৎ করে তার চেহারা আর গলার সুরে আক্রোশ ও ঘৃণা ফুটে উঠলো। 'তোমার প্রেসিডেণ্ট আমাদের সাথে প্রকাশ্যে আলোচনায় বসতে ভয় পায়। সে একটা কাপুরুষ, সে তার মেক্সিকো সিটির বন্ধুদের অসন্তুষ্ট করতে সাহস পায় না।'

টোপ এড়িয়ে যাবার অভিজ্ঞতা রয়েছে ফেডানোর। তিনি নরম সুরে বললেন, 'আপনি আমাকে সাক্ষাৎদানে রাজি হওয়ায় প্রেসিডেন্ট বলেছেন আমি যেন তাঁর কৃতজ্ঞতা আপনার কাছে পৌঁছে দিই।'

'আমি আশা করেছিলাম আপনার চেয়ে আরো উঁচু পদের কেউ আসবে।'

'আপনার শর্ত ছিলো কথা বলবেন শুধু একজন লোকের সাথে। স্বভাবতই আমরা ধরে নিই, আপনি চান না আমাদের সাথে কোনো দোভাষী থাকুক। আর, আপনি যেহেতু স্প্যানিশ বা ইংরেজি বলতে রাজি নন, অগত্যা আমাকেই পাঠানো হলো। কর্মকর্তা পর্যায়ে আমিই একমাত্র অফিসার যে প্রাচীন আযটেক ভাষা নাহুয়াট্‌ল্ জানে।'

'বলতে বেশ ভালোই পারেন।'

'এসকামপো শহর থেকে আমেরিকায় চলে গিয়েছিল আমাদের পরিবার। খুব যখন ছোটো আমি, তখন শিখেছি।'

'এসকামপো আমি চিনি। ছোট্ট একটা গ্রাম, না খেতে পেয়ে মারা যেতে বসেছে লোকগুলো।'

'আপনি দাবি করেন, মেক্সিকো থেকে দারিদ্র্য চিরতরে হটিয়ে দেবেন। আমাদের প্রেসিডেন্ট আপনার প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী।'

'সে কি সেজন্যেই আপনাকে পাঠিয়েছে?'

মাথা ঝাঁকালেন ফেডানো। 'তিনি যোগাযোগের একটা মাধ্যম খুলতে চান।'

গম্ভীর একটুকরো হাসি ফুটে উঠলো ম্যানুয়েল রিভেরার মুখে। 'আপনার প্রেসিডেন্ট বড় ধূর্ত। আমার দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যেহেতু ভেঙে পড়েছে, কাজেই তিনি জানেন আমার আন্দোলনের

তোড়ে নির্বাচিত সরকার উৎখাত হয়ে যাবে। আমার ক্ষমতায় আসার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে, তাই আগেভাগে সুসম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আবার ওদিকে সরকারের সাথেও হাত মেলানো হচ্ছে। সাপ আর ব্যাঙ, দু'জনের গালেই চুমো খেতে জানে আমেরিকা। মেক্সিকোয় আপনাদের স্বার্থ আছে, সেটা থেকে বঞ্চিত হতে চান না, এই তো ?'

'প্রেসিডেন্টের মনের কথা পড়া আমার সাধ্যের অতীত।'

'সে খুব তাড়াতাড়িই জানতে পারবে যে মেক্সিকোর নির্যাতিত মানুষ শাসকশ্রেণী আর ধনীদের অনুগ্রহ নিয়ে বেঁচে থাকতে রাজি নয় আর। দুর্নীতি আর রাজনৈতিক ধোঁকাবাজি ধৈর্যের শেষ সীমায় এনে ফেলেছে তাদেরকে। বস্তি এলাকার মানুষের দুর্দশা চোখে দেখা যায় না। গ্রামে সাধারণ মানুষের কোনো কাজ নেই। কিন্তু না, আর তারা সহ্য করবে না। তাদের চুপচাপ বসে থাকার দিন শেষ হয়েছে।'

'আপনি চান, আযটেক ধুলো থেকে আদর্শ একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করবেন ?'

'আমি শুধু মেক্সিকো বা শুধু ল্যাটিন আমেরিকার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না, আমি দুই আমেরিকা সম্পর্কে মাথা ঘামাচ্ছি। এই মেক্সিকো দেশটা আমাদের, আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য পুনর্জীবিত করতে চাই, কার কি বলার আছে ? আর আপনাদের ব্যাপারে আমার বলার কথা এইটুকুই যে, আপনারা আজ যে দেশটাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলছেন সেটা আপনাদের দেশ নয়, কোনো কালে ছিলোও না। দেশটার মালিক ইণ্ডিয়ানরা। তাদেরকে মেরে সাফ করে দিয়েছেন বলে এ-কথা ভাববেন না যে একদিন এই অন্যায়ের বিচার হবে না। আমরা জাগছি।'

'ঠিক কি বলতে চান আপনি?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করলেন ফেডানো।

'আপনাকে বলা আর কসাইখানায় বাঁধা একটা গরুকে বলা একই কথা। তবু শোনেন। এই মেক্সিকোয় আযটেক সভ্যতার পুনরুত্থান ঘটবেই, কেউ বাধা দিয়ে রুখতে পারবে না।'

'আযটেকরা ছিলো গোটা আমেরিকায় সবচেয়ে নির্মম কসাই। অতীত যুগের বর্বরদের আদর্শে আধুনিক একটা রাষ্ট্র পরিচালনা করা নেহাতই···,' গাধামি, বলতে যাচ্ছিলেন ফেডানো, তার বদলে বললেন, 'ছেলেমানুষি।'

'বেশি কথা বলবেন না। আপনার প্রেসিডেন্ট কি চায় আমার কাছে?'

'তিনি শুধু মেক্সিকোর শান্তি আর উন্নতি চান,' জবাব দিলেন ফেডানো। 'এবং একটা প্রতিশ্রুতি—আপনি কমিউনিজমের দিকে এগোবেন না বা টেরোরিজমের পথ ধরবেন না।'

'আমি মার্ক্সিস্ট নই। কমিউনিজমকে সে যতোটুকু ঘৃণা করে, আমি তারচেয়ে কম করি না। আমার অনুসারীদের মধ্যে সশস্ত্র গেরিলা একজনও নেই।'

'শুনে তিনি খুশি হবেন।'

'আমাদের নতুন আযটেক জাতি গৌরব ও মহত্ত্ব অর্জন করবে কালো টাকার মালিক, দুর্নীতিপরায়ণ অফিসার, বর্তমান মন্ত্রিসভার সদস্য আর সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের বলি দেয়ার পর।'

ফেডানোর মনে হলো তিনি শুনতে বা বুঝতে ভুল করেছেন। 'আপনি কি হাজার হাজার মানুষকে খুন করার কথা বলছেন?'

'খুন?' কর্কশ শব্দে হেসে উঠলো ম্যানুয়েল রিভেরা। 'আরে না,

মিঃ পেড্রো ফেডানো, না। আমি আমাদের দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দেয়ার কথা বলছি। কোয়েটজালকোট্‌ল, হুইটজিলোপোকট্‌লি, টেজ-ক্যাটলিপোকা—আপনি তো জানেনই, এরকম আরো অনেক দেবতা আছে আমাদের। অনেক যুগ পেরিয়ে গেছে, দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি উৎসর্গ করা হয় না। আমার দ্বারা সেই শুভ কাজটা এবার সম্পন্ন হবে, কথা দিচ্ছি।'

'না।' এই একটা শব্দ ছাড়া পেড্রো ফেডানো আর কিছু বলতে পারলেন না।

'আমাদের আযটেক রাষ্ট্রের নাম হবে টেনোকটিটলান্। আইনের অনুশাসন হবে ধর্মভিত্তিক। নাহুয়াট্‌ল্ হবে রাষ্ট্রীয় ভাষা। কঠোর ব্যব-স্থায় কমিয়ে আনা হবে জনসংখ্যা। বিদেশী পুঁজি বা শিল্প হবে রাষ্ট্রের সম্পত্তি। সীমান্তের ভেতর বাস করতে পারবে শুধু নেটিভরা। বাকি সবাইকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।'

স্তম্ভিত বিস্ময়ের সাথে তাকিয়ে থাকলেন পেড্রো ফেডানো। তাঁর চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

বিরতি না নিয়ে বলেই চলেছে ম্যানুয়েল রিভেরা, 'যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো পণ্য কেনা হবে না। আপনাদের কাছে এক ফোঁটা তেলও আমরা বিক্রি করবো না। বিশ্ব ব্যাংকে আমাদের সমুদয় দেনা পরিশোধযোগ্য নয় বলে ঘোষণা করা হবে। ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, নিউ মেক্সিকো আর আরিজোনায় আমাদের যেসব জায়গা আপনারা দখল করে রেখেছেন, সেগুলো ফেরত চাওয়া হবে। ফেরত পাবার স্বার্থে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে সীমান্ত পেরোবার জন্যে লং মার্চ করবো আমরা।'

'যদি ঠাট্টা না হয়,' ফেডানো বললেন, 'তাহলে বলবো নেহাতই

পাগলামি। এ-ধরনের উদ্ভট দাবির কথা শুনতে চাইবেন না আমাদের প্রেসিডেন্ট।'

'কি? আমি যা করবো বলে জানাচ্ছি, সে তা বিশ্বাস করবে না?'

'কোনো সুস্থ মানুষই করবে না।'

রেগে গিয়ে দিশেহারা বোধ করায় নিজের সীমার বাইরে পা দিয়ে ফেলেছেন পেড্রো ফেডানো।

ধীরে ধীরে পাঁচিল থেকে নেমে দাঁড়ালো ম্যানুয়েল রিভেরা, নত হয়ে আছে অলংকৃত মাথা, চোখ নিষ্পলক, বেসুরো গলায় বিড়বিড় করে বললো, 'তাহলে তো তাকে একটা মেসেজ পাঠাতে হয়, যাতে বিশ্বাস করে!'

সে তার মাথার ওপর তুললো হাত দুটো, গোটা বাহু গাঢ় আকাশের দিকে খাড়া হলো। যেন সংকেত পেয়ে পাথুরে মূর্তিগুলোর গভীর ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো চারজন মানুষ, মাথায় পট্টি ছাড়া গায়ে কোনো আবরণ নেই। চারদিক থেকে এগিয়ে এসে পেড্রো ফেডানো-কে ঘিরে ফেললো, ভয় আর অবিশ্বাসে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি। চারজন মিলে ধরলো তাঁকে, নিজেদের মধ্যে ধরাধরি করে নামিয়ে আনলো পাথুরে বেদিতে, যেখানে মানুষের খুলি আর হাড় খোদাই করা রয়েছে পাঁচিলের গায়ে। বেদির ওপর শোয়ানো হলো তাঁকে। হাত আর পা ধরে থাকলো চারজন।

কি ঘটতে যাচ্ছে উপলব্ধি করে আরো কয়েক সেকেণ্ড বোবা হয়ে থাকলেন পেড্রো ফেডানো। তারপর বাঁচার আকুতিতে চিৎকার করে উঠলেন, 'ওহ্ গড, নো! নো। নো! নো!'

আতংকিত আমেরিকানকে গ্রাহ্যই করলো না ম্যানুয়েল রিভেরা, বেদির একপ্রান্তে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলো সে। খানিক পর একবার

শুধু মাথা ঝাঁকালো।

লোকগুলো ফেডানোর কোট আর শার্ট খুলে নিলো। বেরিয়ে পড়লো নগ্ন বুক।

ম্যানুয়েল রিভেরার হাতে হঠাৎ করে উদয় হলো লম্বা একটা ছোরা। মাথার ওপর উঁচু করে ধরলো সেটা। চাঁদের আলোয় চকচক করে উঠলো কালো ফলা। এগিয়ে এলো সে।

আর্তনাদ করে উঠলেন পেড্রো ফেডানো, সেটাই তাঁর শেষ চিৎকার।

পরমুহূর্তে ছোরার ফলাটা গেঁথে গেল বুকে।

সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা উঁচু মূর্তিগুলো নির্লিপ্ত। হাজার বছর ধরে এ-ধরনের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা বহুবার দেখেছে তারা। কখনো প্রতিবাদ করেনি। করার সাধ্য নেই।

তখনো লাফাচ্ছে পেড্রো ফেডানোর হৃৎপিণ্ড, বুকের ভেতর থেকে সেটাকে যখন বের করা হলো।

নয়

চারপাশে লোকজন ও ব্যস্ততা থাকলেও হিম উত্তরের গভীর নিস্তব্ধতা রানার গোটা অস্তিত্বে যেন চেপে বসেছে। অবশেষে দিনের আলো ফুটলো, ধূসর-রঙের অদ্ভুত কুয়াশা ভেদ করে, এতো ম্লান যে সে আলোয় ছায়া পড়ে না। আরো একটু বেলা হতে কোমল কমলা-সাদা রঙ নিলো আকাশ, হিম কুয়াশা পোড়াতে শুরু করেছে সূর্য। খাঁড়ির ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা পাথুরে চূড়াগুলোকে তুষারের সাদা বোরখা ঢাকা নারীমূর্তি মনে হলো।

অকুস্থলের চারদিকে এখন অন্য রকম চেহারা। প্রথমে পৌঁচেছে পাঁচটা এয়ারফোর্স হেলিকপ্টার, সাথে করে এনেছে আর্মি স্পেশাল সার্ভিস ফোর্স। লোকগুলো সশস্ত্র, থমথমে কঠিন চেহারা, গোটা এলাকা তারা নিশ্ছিদ্রভাবে ঘিরে ফেললো। এক ঘণ্টা পর পৌঁছুলো ফেডারেল এভিয়েশন ইনভেস্টিগেটররা, বিধ্বস্ত প্লেনের বিচ্ছিন্ন অংশ কি কি সংগ্রহ করা হবে সব চিহ্নিত করে ফেললো তারা। তাদের পিছু পিছু এলো প্যাথোলজিস্টদের একটা দল, লাশগুলো হেলিকপ্টারে তুলে নিয়ে চলে গেল এয়ারফোর্স বেস, থিউল-এর মর্গে।

সবশেষে আইসব্রেকার শারলক নিয়ে পৌঁছুলেন নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স-এর প্রতিনিধি হিসেবে। জাহাজের ভেঁপু শুনে সবাই যে যার কাজ ফেলে ঘাড় ফিরিয়ে সাগরের দিকে তাকালো।

সাইরেন বাজিয়ে ধীরে ধীরে খাঁড়ির মুখে ঢুকলো শারলক। গথিক দুর্গের মতো লাগলো জাহাজটাকে। আইসপ্যাক ভেঙে অনায়াসে পথ করে নিলো সেটা, অকুস্থল থেকে মাত্র পঞ্চাশ মিটার দূরে থামলো। কমাণ্ডার জন ম্যাকেঞ্জি এঞ্জিন বন্ধ করলেন, সিঁড়ি বেয়ে বরফের ওপর নেমে এলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। নেমেই তিনি উপস্থিত উদ্ধার-কর্মীদের প্রয়োজনে জাহাজের সুবিধাদি ব্যবহার করার অনুরোধ জানালেন। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলো সবাই। কাজে বিরতি দিয়ে ছুটলো তারা জাহাজের দিকে।

রানার কাঁধে একটা হাত রেখে বরফের ওপর হাঁটতে শুরু করলেন অ্যাডমিরাল। তাঁর আরেক পাশে থাকলো বেন নেলসন। প্রথমেই তিনি ওদেরকে জানালেন, 'ভাগ্যকে ধন্যবাদ যে সিকিউরিটি ঠিকমতো বজায় রাখা গেছে। নিউজ ব্ল্যাকআউট এখনো কেউ পেনিট্রেট করতে পারেনি। কেনেডি এয়ারপোর্ট শুধু জানে ইউ. এন. ফ্লাইট পৌঁছুতে দেরি করছে। ধূর্ত কোনো রিপোর্টারের পক্ষে কিছু আঁচ করতে আরো এক ঘণ্টা সময় লাগবে।'

'এভাবে খোলা আকাশের নিচে না হেঁটে, কোথাও শেলটার নিলে হতো না?' অভিযোগের সুরে বললো নেলসন।

'তুমি তো সারারাত হেলিকপ্টার থেকে বেরই হওনি...।'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন, 'ঝগড়া করতে হবে না, এই নাও।' বলে পারকার ভেতর থেকে ব্র্যাণ্ডির একটা বোতল বের

করে রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। 'তোমাদের জন্যে এনেছি।'

বোতলটা নেলসনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে রানা বললো, 'আপনি এইমাত্র বেনকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিলেন।'

বোতলটা নিয়ে ঠাণ্ডায় হি হি করতে করতে নেলসন বললো, 'তার-চেয়ে আমি নরক পছন্দ করবো।' ছিপি খুলে কয়েক ঢোক ব্র্যাণ্ডি খেলো সে। বোতলটা রানাকে ফিরিয়ে দিলো।

'জাহাজে ওঁরা কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'মিস উম্মে সালিহা বিশ্রাম নিচ্ছেন। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, আমাকে হু'বার ডেকে তিনি দেখা করতে চেয়েছেন তোমার সাথে। নিউ ইয়র্কে ডিনার না কি যেন একটা ব্যাপারে।'

'ডিনার?' রানার চেহারায় কৌতুক।

'মজার ব্যাপার, ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্টের হাঁটুর চামড়ায় ওষুধ লাগা-নোর পর সে নাকি বলেছে, তোমার সাথে তারও একটা ডিনার ডেট ঠিক হয়ে আছে।'

ধোয়া তুলসী পাতার চেহারা নিয়ে রানা বললো, 'আমার ধারণা, ওদের নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে।'

রানার হাত থেকে বোতলটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিলো নেলসন, বললো, 'কেন যেন মনে হচ্ছে, এ গান আগেও আমি শুনেছি!'

'আর চীফ স্টুয়ার্ড?'

'তার অবস্থা বেশ খারাপই বলবো,' রানার প্রশ্নের জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'তবে ডাক্তাররা বলছেন, সেরে উঠবে। তার নাম বোনার। ওষুধের প্রভাবে ঘুমিয়ে পড়ার সময় বিড়বিড় করে কি বললো, ভুল বকছে কিনা বুঝলাম না—ফার্স্ট আর সেকেণ্ড অফি-

সারকে খুন করেছে পাইলট, তারপর উড়ন্ত প্লেন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে···।'

'বোধহয় ভুল বকছে না,' বললো রানা। 'পাইলটের লাশ এখনো পাইনি আমরা।' অ্যাডমিরালের দিকে তাকালো ও। 'রাশিয়ান সাবমেরিন নিয়ে কি করা হবে?'

'তোমরা যা ঠিক করেছো। আপাততঃ উদ্ধার কাজ বন্ধ থাক।'

'আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, অ্যাডমিরাল।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলো!' অবাক হলেন জর্জ হ্যামিলটন। অনুরোধ করা রানার স্বভাব নয়। 'কি ব্যাপার?'

'গর্তটার ভেতর রোমান যুগের কিছু জার দেখেছি আমরা,' বললো রানা। 'আমার ধারণা, খুঁজলে আরো হয়তো অনেক কিছু পাওয়া যাবে। ছুটিতেই যখন আছি, সময় কাটানোর জন্যে ওখানে একটু নেমে দেখতে চাই।'

'বেশ তো, ঠিক আছে—কমাণ্ডার ম্যাকেঞ্জিকে আমি বলে দেবো 'খন। সব রকম সাহায্য করবে সে। কিন্তু, রানা, পুরাকীর্তি সম্পর্কে তোমার এতো আগ্রহের কথা তো জানা ছিলো না আমার।'

ক্ষীণ একটু হাসলো রানা।

'ভালো কথা, আবার কখন দেখা হয় ঠিক নেই, ধন্যবাদটা দিয়ে রাখি—তোমরা দু'জন অনেক করেছো।'

'আমাদের চেয়ে বেশি করেছে সায়েন্টিফিক ইকুইপমেণ্টগুলো।'

'কিন্তু ধন্যবাদ জিনিসটা পাওনা হয় শুধু মানুষের,' ফোড়ন কাটলো নেলসন।

'ভালো কথা, রানা, তুমি জানো নিশ্চয়ই, রাহাত আমেরিকায়?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো রানা। 'বেড়াচ্ছেন।'

'বেড়াচ্ছে না ছাই, বিলের ইয়টে বসে সারাদিন তাস পিটছে।'

'আপনিও সেখানে যাচ্ছিলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে চলে আসতে হলো, তাই না?'

হেসে ফেললেন অ্যাডমিরাল। 'বুঝলে কিভাবে?'

জবাব না দিয়ে মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলো রানা, তারপর পারকার বোতাম লাগালো। 'যাই, একটু হেঁটে আসি।'

'মানে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো নেলসন। 'আমাদের সাথে জাহাজে ফিরছো না?'

'একটু পর। আর্কিওলজিস্টদের একটা খবর নেয়া দরকার।'

'খবর নেয়া হয়েছে, রানা,' বললেন জর্জ হ্যামিলটন। 'ডঃ মার্কস তার একজন সহকারীকে ওদের ক্যাম্পে পাঠিয়েছিল। ফিরে এসে রিপোর্ট করেছে সে। চামড়া ছড়ে যাওয়া ছাড়া গুরুতর কারো কিছু ঘটেনি।'

রানা বললো, 'দেখেই আসি না মাটি খুঁড়ে কি পেলো ওরা।'

'হ্যাঁ, যাও, গ্রীক দেবী-টেবিও পেয়ে যেতে পারো।'

'অসম্ভব কি!' হাসলো রানা।

কথা বলার সময় সাবধান, কিছু যেন ফাঁস না হয়—রানাকে সতর্ক করে দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন জর্জ হ্যামিলটন। রানাকে তিনি চেনেন, হুঁশিয়ার করার দরকার নেই। 'যাচ্ছো যাও, কিন্তু প্লেন আর আরোহীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে কি বলবে ওদেরকে?'

'আমরা এখানে একটা জিওলজিক্যাল সার্ভে প্রজেক্টে কাজ করছি,' বললো রানা। 'আরোহীরা ফিউজিলাজে আটকা পড়ে, হাইপথার-মিয়া-য় মারা গেছে।'

'ধন্যবাদ, রানা, মাই বয়!' হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'তাড়াতাড়ি

ফিরে এসো।' ঘুরে দাঁড়িয়ে জাহাজের দিকে হাঁটা ধরলেন তিনি।

'বরফের ফাটলে বা কোনো মেয়ের ফাঁদে যেন পা না পড়ে,' রানাকে সাবধান করে দিয়ে অ্যাডমিরালকে অনুসরণ করলো বেন নেলসন। হন হন করে হেঁটে অ্যাডমিরালের পাশে চলে এলো সে, বললো, 'তাজ্জব ব্যাপার। অ্যান্টিকস সম্পর্কে ওর আগ্রহ দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আগে কখনো তো ওকে এরকম করতে দেখিনি।'

খাঁড়ির ওপর দিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটছে রানা, দীর্ঘ পদক্ষেপে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে অ্যাডমিরাল বললেন, 'ওর সম্পর্কে সব কথা কি আমরা জানি, বেন?'

বরফের মাঠ শক্ত আর সমতল, খাঁড়ির ওপর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে রানা। উত্তর-পশ্চিম দিকে কালো মেঘ, সেদিকে একটা চোখ রেখে এগোচ্ছে ও। রোদে ঝলমলে প্রকৃতি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে চেহারা পাল্টে রুদ্রমূর্তি ধরতে পারে, শুরু হয়ে যেতে ঝড়-ঝঞ্ঝার তাণ্ডবনৃত্য, জানা আছে ওর। অন্ধকার হয়ে এলে দিক চেনার কোনো উপায় থাকে না, সেটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বরফের রাজ্যে পথ হারালে মৃত্যু অনিবার্য হয়ে দেখা দেবে।

দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে রানা। তীররেখা পেরিয়ে এলো। ধোঁয়ার একটা ক্ষীণ রেখা পথ দেখাচ্ছে ওকে। সন্দেহ নেই, আর্কিওলজিস্ট-দের আশ্রয় থেকে উঠছে ধোঁয়াটা।

আশ্রয় যখন আর মাত্র দশ মিনিটের পথ, এই সময় ঝড়ের কবলে পড়লো রানা। বিশ মিটার দূরে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলো, এখন পাঁচ মিটার দূরের বরফও পরিষ্কার নয়। জগিং করার ভঙ্গিতে ছুটলো ও, ব্যাকুলতার সাথে আশা করছে সরল একটা রেখা ধরেই সামনে

এগোচ্ছে সে। কোণাকোণি ছুটে এসে বাম কাঁধে আঘাত করছে তুষারকণা আর বাতাস, বাতাসের গায়ে সামান্য হেলান দিয়ে ছুটলো ও।

বাতাসের গতিবেগ বাড়লো। হেলান দিয়ে থাকা সত্ত্বেও ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে ওকে। সামনে এখন প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ও। মাথা নিচু করে পায়ের দিকে চোখ রেখেছে, প্রতিটি পদক্ষেপ গুণছে, হাত দুটো মাথার দু'পাশে ভাঁজ করা। জানে, কিছু দেখতে না পেয়ে হাঁটা মানে বৃত্তাকারে ঘোরা। হয়তো আর্কিওলজিস্টদের আশ্রয়কে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবে, টেরও পাবে না। সবশেষে, ক্লান্ত শরীর নেতিয়ে পড়বে বরফের ওপর।

বাতাস যতোই তীব্রগতি আর ঠাণ্ডা হোক, ভারি কাপড়গুলো গরম রাখছে শরীরটাকে। হার্টবিটের শব্দ শুনে বুঝতে পারছে, এখনো সে মাত্রাতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েনি।

আশ্রয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে মনে হতে দাঁড়িয়ে পড়লো রানা। এবার সাবধানে এগোলো। ত্রিশ পা এগিয়ে থামলো আবার। ডান দিকে ঘুরলো, এগোলো তিন মিটারের মতো। উল্টোদিক থেকে ধেয়ে আসা তুষার ঝড়ের ভেতর ফেলে আসা পায়ের চিহ্ন অস্পষ্টভাবে চিনতে পারলো ও। ঘুরলো, ফেলে আসা পথের সমান্তরাল রেখা ধরে এগোলো এবার, এভাবে ত্রিশ মিটার পরপর দিক বদলে, একটা নকশা তৈরি করে গোটা এলাকা চষে ফেলার উদ্দেশ্য।

পাঁচবারে পাঁচটা রেখা তৈরি করলো ও। আশ্রয়ের কোনো সন্ধান পেলো না। তৈরি করা রেখাগুলো ধরে ফিরে এলো মাঝখানে, অর্থাৎ তিন নম্বর রেখায়। এবার আড়াআড়িভাবে হাঁটা ধরলো ও। তিনটে নতুন রেখা তৈরি শেষ করতে যাচ্ছে, এই সময় তুষার স্তূপে হোঁচট

খেয়ে পড়ে যাবার উপক্রম করলো; হাতে ঠেকলো একটা ধাতব দেয়াল।

দেয়াল ধরে দু'বার দুটো কোণ ঘুরলো রানা, হাতে চলে এলো একটা রশি, রশিটা পৌঁছে দিলো একটা দরজায়। ঠেলা দিতেই খুলে গেল সেটা। উপলব্ধিটুকু উপভোগ করলো ও, তার প্রাণ সংশয় দেখা দিয়েছিল, তবে নিজেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে সে। ভেতরে ঢুকে হতাশ বোধ করলো রানা।

এখানে কেউ বসবাস করে না। মেঝেতে স্তূপ হয়ে আছে পাথর আর মাটি, চারদিকে গর্ত। হিমাংকের খুব একটা ওপরে হবে না তাপমাত্রা। তবে ঝড়ের হাত থেকে বাঁচা গেছে, কৃতজ্ঞচিত্তে ভাবলো ও।

আলো আসছে শুধু একটা কোলম্যান লণ্ঠন থেকে। প্রথমে ভাবলো, কাঠামোটার ভেতর কেউ নেই। তারপর গর্ত থেকে ধীরে ধীরে উঁচু হলো একজোড়া কাঁধ আর একটা মাথা। শরীরটা ঝুঁকে আছে, রানার দিকে পিছন ফিরে, গর্তের ভেতর একদৃষ্টে তাকিয়ে কি যেন গভীর মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করছে।

ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে গর্তের ভেতর উঁকি দিলো রানা। 'তুমি কি তৈরি ?'

চরকির মতো আধপাক ঘুরলো জেনিথ, যতোটা না চমকে উঠেছে তারচেয়ে বেশি হতভম্ব। 'কিসের জন্যে তৈরি ?'

'শহরে যাবার জন্যে ?'

এতোক্ষণে সচেতন হলো জেনিথ। লণ্ঠনটা গর্ত থেকে তুললো সে, ধীরে ধীরে সিধে হলো। রানার চোখে তাকিয়ে থাকলো দুই সেকেণ্ড। হিস হিস শব্দ করছে কোলম্যান। সময় পেয়ে তার কোমল লাল চুল দেখে মনে মনে প্রশংসা করলো রানা। 'মিঃ মাসুদ রানা, সত্যি

তো ?' দস্তানা খুলে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলো জেনিথ।

রানাও একটা হাতের দস্তানা খুললো। মৃদু চাপ দিয়ে করমর্দন করলো। 'সুন্দরী মেয়েরা আমাকে শুধু রানা বললে খুশি হই।'

অপ্রতিভ ছোট্ট খুকির মতো লাগলো নিজেকে, মেকআপ করা হয়নি বলে আরো অস্বস্তিবোধ করলো জেনিথ। তারপর লক্ষ্য করলো, কাপড়ে আর হাতে মাটি লেগে রয়েছে। পরিস্থিতি রীতিমতো সঙ্গীন হয়ে উঠলো চেহারা লালচে হয়ে উঠছে বুঝতে পেরে। 'কর্নেলিয়াস··· জেনিথ,' থেমে থেমে বললো সে। 'আমার সঙ্গীদের সাথে আলাপ করছিলাম, কাল রাতে যে সাহায্য তোমার কাছ থেকে পেয়েছি, অন্তত মৌখিক একটা ধন্যবাদ দিয়ে আসা উচিত। আমরা হয়তো যেতাম, নিজে চলে এসে ভালো করেছো। ডিনারের প্রস্তাবটা ঠাট্টা মনে করেছিলাম। সত্যি যে আসবে, ভাবিনি।'

'শুনতেই পাচ্ছো বাইরে কি ঘটছে,' বললো রানা, 'একটা তুষার ঝড়ও আমাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারেনি।'

'তুমি নির্ঘাৎ একটা উন্মাদ।'

'না, স্রেফ বোকা বলতে পারো এইজন্যে যে ভেবেছিলাম আর্কটিক ঝড় আমার সাথে পাল্লা দিয়ে পারবে না।'

দু'জনেই হেসে উঠলো একসাথে, সেই সাথে আড়ষ্ট ভাবটা দূর হয়ে গেল। গর্ত থেকে উঠতে গেল জেনিথ, তার একটা হাত ধরে সাহায্য করলো রানা। ব্যথা পেয়ে উফ্ করে উঠলো জেনিথ, সাথে সাথে তার হাত ছেড়ে দিলো রানা। 'পা এখনো ব্যথা করছে, তাই না ? হাঁটা-চলা করা উচিত হচ্ছে না।'

'একটু আড়ষ্ট হয়ে আছে, নীলচে হয়ে আছে কয়েক জায়গায়, তোমাকে দেখানো যাবে না। তবে মরবো না এখুনি।'

জেনিথের হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে কাঠামোর চারদিকে আলো ফেলে দেখলো রানা। 'কি পেয়েছো এখানে?'

'এসকিমোদের একটা গ্রাম, এক থেকে পাঁচশো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এখানে তারা বাস করতো।'

'নামকরণ হয়েছে?'

'সাইটের নাম রেখেছি মোরেল বে ভিলেজ। ডঃ জ্যাকুয়েস মোরেল, আমাদের দলনেতা। জায়গাটা তিনি পাঁচ বছর আগে আবিষ্কার করেন।'

'তিনজনের মধ্যে একজন, কাল রাতে যাদের দেখলাম?'

'প্রকাণ্ড মানুষটা, অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।'

'কেমন আছেন তিনি?'

'মাথায় বড় একটা কালচে দাগ থাকলেও কিরে-কসম খেয়ে বলছেন, কোনো ব্যথা নেই। ঘর থেকে বেরুবার সময় দেখে এসেছি, একটা হাঁস রোস্ট করতে বসেছেন।'

'হাঁস?' হেসে উঠলো রানা। 'তারমানে তোমাদের সাপ্লাই সিস্টেম প্রথম শ্রেণীর।'

'মিনার্ভা প্লেন, ভার্টিক্যাল লিফট। এক প্রাক্তন ছাত্র ইউনিভার্সিটি-কে ধার হিসেবে দিয়েছে। থিউল থেকে দু'হপ্তা পরপর আসে।'

'এমন কিছু পেয়েছো, যা পাবার কথা নয়?'

ঝট্ করে মুখ তুলে রানার দিকে তাকালো জেনিথ। 'কেন, এ-প্রশ্ন কেন করলে?'

'কৌতূহল।'

'মাটি খুঁড়ে আমরা প্রিহিস্টোরিক এস্কিমোদের হাতে তৈরি কয়েক শো শিল্পকর্ম পেয়েছি। লিভিং কোয়ার্টারে আছে সব, ইচ্ছে করলে

পরীক্ষা করতে পারো।'

'হাঁসের রোস্ট খেতে খেতে?'

'চমৎকারের বদলে আমি বরং শুধু ভালো বলবো। রান্নার ব্যাপারে ডঃ মোরেলের চেয়ে আমার নিজের ওপরেই বেশি আস্থা।'

'ভেবেছিলাম তোমাদের সবাইকে জাহাজের গ্যালিতে দাওয়াত দেবো, কিন্তু হঠাৎ ঝড় শুরু হওয়ায় আমার প্ল্যান ভেস্তে গেছে।'

'টেবিলে নতুন মুখ দেখতে পেলে আমরা সবাই ভারি খুশি হই।'

'অস্বাভাবিক কিছু আবিষ্কার করেছো তোমরা, তাই না?' হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলো রানা।

সন্দেহে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো চোখ জোড়া। 'কিভাবে বুঝলে?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলো জেনিথ।

'গ্রীক নাকি রোমান?'

'রোমান এমপায়ার, বাইজানটিয়াম।'

'বাইজানটিয়াম কি?' রানার চঞ্চল দৃষ্টি জেনিথের মুখে কি যেন খুঁজলো। 'কতো পুরনো?'

'একটা স্বর্ণমুদ্রা, চতুর্থ শতাব্দীর।'

পেশীতে ঢিল পড়লো রানার। বড় করে শ্বাস টানলো, ছাড়লো ধীরে ধীরে। জেনিথ ওর দিকে হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, চেহারায় অস্বস্তি।

সে বেসুরো গলায় বললো, 'কি ব্যাপার, কি বলতে চান?'

'যদি বলি,' ধীরে ধীরে শুরু করলো রানা, 'সাগর আর খাড়ির মাঝখানের একটা পথে রোমান আমলের অ্যামফোরাস ছড়িয়ে আছে?'

'অ্যামফোরাস!' সবিস্ময়ে পুনরাবৃত্তি করলো জেনিথ।

'আণ্ডারওয়াটার ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও টেপে জারগুলোর ফটো

তুলে নিয়েছি আমরা।'

'গড! ওহ্, ডিয়ার গড। তারমানে এসেছিল! ওরা এসেছিল!' জেনিথ যেন নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। 'সত্যি ওরা আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিল! ভাইকিংদের আগে রোমানরা পা রেখেছিল গ্রীনল্যাণ্ডে!'

'প্রমাণ দেখে তাই তো মনে হচ্ছে,' আস্তে করে জেনিথের কোমর পেঁচিয়ে ধরে তাকে দরজার দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চললো রানা। 'ঝড়ের মধ্যে এখানে আমরা আটকা পড়েছি, নাকি রশিটা তোমাদের লিভিং কোয়ার্টারের দিকে গেছে?'

মাথা ঝাঁকালো জেনিথ। 'গেছে।' ঘাড় ফিরিয়ে মেঝের গর্তগুলো আরেকবার দেখলো সে। 'পাইথেয়াস, গ্রীক নেভিগেটর, খ্রিস্টের জন্মের তিন শো পঞ্চাশ বছর আগে একটা মহতী অভিযান শেষ করেন। কিংবদন্তী আছে, তাঁরা উত্তর দিকে জাহাজ চালিয়ে আটলান্টিকে এসেছিলেন, সবশেষে পৌঁচেছিলেন আইসল্যাণ্ডে। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, আরো সাতশো বছর পর এতো উত্তর আর পশ্চিমে রোমানরা এসেছিল কিনা সে-সম্পর্কে কোনো রেকর্ড বা কিংবদন্তী নেই।'

'পাইথেয়াস ভাগ্যবান, গল্পটা বলার জন্যে তিনি দেশে ফিরতে পেরেছিলেন।'

'তোমার ধারণা, রোমান যারা এখানে এসেছিল তারা ফেরার পথে জাহাজডুবিতে মারা যায়?'

'না, আমার ধারণা, এখনো তারা এখানেই আছে।' জেনিথের দিকে চোখ নামিয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে হাসলো রানা। 'তুমি আর আমি, লাভলি লেডি, খুঁজে বের করবো ওদেরকে।'

'প্রমিজ ?'

'প্রমিজ।'

দশ

ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যে সেভেনথ এভিনিউয়ে থামলো ট্যাক্সিটা, পুরনো একজিকিউটিভ অফিস বিল্ডিঙের ঠিক সামনে। ডেলিভারিম্যান-এর ইউনিফর্ম পরা এক লোক পিছনের সিট থেকে নেমে ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বললো। ট্যাক্সির ভেতর ঝুঁকে লাল সিল্কে মোড়া একটা প্যাকেট বের করলো সে। ফুটপাত পেরিয়ে কয়েকটা ধাপ টপকালো, দোরগোড়া হয়ে ঢুকে পড়লো মেইলরুমের রিসেপশন অংশে। 'প্রেসিডেন্টের জন্যে,' ইংরেজিতে বললেও, তার বাচনভঙ্গি স্প্যানিশ।

পোস্টাল সার্ভিসের একজন সহকারী প্যাকেটের গায়ে সময় লিখে সই করলো। মুখ তুলে হাসলো সে। 'এখনো বৃষ্টি হচ্ছে ?'

'ঝিরঝিরে।' বলেই চলে গেল ডেলিভারিম্যান।

প্যাকেটটা নিয়ে ফ্লুরোস্কোপ-এর নিচে রাখলো পোস্টাল সহকারী। পিছিয়ে এসে স্ক্রীনের দিকে তাকালো সে, প্যাকেটের ভেতর কি আছে দেখতে পাচ্ছে।

একটা ব্রিফকেস। কিন্তু ছবিটা তাকে অবাক করে দিলো। ব্রিফ-কেসের ভেতর কোনো কাগজ বা ফাইল নেই, নির্দিষ্ট কাঠামো বা কিনারাসহ কোনো শক্ত জিনিস নেই। বিস্ফোরক ধরনের কিছু হলে চেনা যেতো, তা-ও নয়। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলো সে।

দু'মিনিটের মধ্যে কুকুরের চেইন হাতে করে একজন সিকিউরিটি অফিসার হাজির হলো। 'কি, মাতাহারির কোনো খোরাক?' সহাস্যে জানতে চাইলো এজেন্ট।

ইঙ্গিতে প্যাকেটটা দেখিয়ে দিলো পোস্টাল সহকারী। 'স্কোপে জিনিসটা কেমন যেন দেখাচ্ছে।'

মাতাহারি ট্রেনিং পাওয়া জার্মান কুকুর। মোটাসোটা, ছোটোখাটো; খয়েরি চোখ দুটো বিশাল। যে-কোনো বিস্ফোরকের গন্ধ চিনতে পারে সে। লোক দু'জন তাকিয়ে থাকলো, প্যাকেটটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে কুকুরটা। চেহারা বিকৃত করলো, গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো চাপা গর্জন।

অবাক হলো এজেন্ট লোকটা। 'কি ব্যাপার, মাতাহারি তো কখনো এরকম করে না!'

'ওটার ভেতর অদ্ভুত কিছু আছে।'

'কার নামে এসেছে?'

'প্রেসিডেন্টের।'

এগিয়ে গিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিলো এজেন্ট। 'এখানে আমাদের অ্যালিস টিসডেলকে দরকার।'

হোয়াইট হাউসের ফিজিকাল সিকিউরিটি-র চার্জে রয়েছে স্পেশাল এজেন্ট অ্যালিস টিসডেল। লাঞ্চ ফেলে ছুটে এলো সে। দেখলো

প্যাকেটটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে কুকুরটা। 'কিন্তু আমি তো কোনো ওয়্যারিং বা ডিটোনেশন ডিভাইস দেখছি না।'

'না, বোমা নয়,' পোস্টাল সহকারী বললো।

'ঠিক আছে, এসো খোলা যাক।'

সিল্ক আবরণ সাবধানে খোলা হলো। বেরিয়ে এলো কালো চামড়ার একটা কেস। কেসের গায়ে কোনো চিহ্ন নেই, এমনকি মডেল নম্বর বা প্রস্তুতকারকের নাম পর্যন্ত নেই। কমবিনেশন লকের বদলে চাবি। ঢোকানোর জন্যে দুটো ফুটো রয়েছে। ফুটোর পাশে ইস্পাতের বোতামে চাপ দিতেই ক্লিক করে একজোড়া শব্দ হলো। 'সত্য উন্মোচিত হবার মুহূর্ত উপস্থিত!' সতর্ক হাসি ফুটলো এজেন্টের মুখে। ঢাকনির দুই কোণে দুটো হাত রেখে ধীরে ধীরে ওপর দিকে তুললো সে। ঢাকনি তোলা হয়েছে, ভেতরে কি রয়েছে সবাই ওরা দেখতে পেলো।

'জেসাস!' পোস্টাল সহকারী আঁতকে উঠে পিছন ফিরলো। হোঁচট খেতে খেতে টয়লেটের দিকে ছুটলো সে, নাকে-মুখে হাত চাপা দিয়ে রেখেছে যাতে বমি না করে ফেলে।

'ওহ্, গড!' রুদ্ধশ্বাসে বললো টিসডেল। সশব্দে ঢাকনিটা বন্ধ করে দিলো সে। রক্তশূন্য চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এজেন্টের দিকে তাকালো। 'এখুনি এটাকে জর্জ ওয়াশিংটন হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও।'

'আসল জিনিস, নাকি এর মধ্যে কোনো চাতুরী আছে?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো এজেন্ট।

'আসল জিনিস,' গম্ভীর সুরে বললো টিসডেল।

হোয়াইট হাউসে তাঁর নিজের অফিসে রয়েছেন জিমি উইলফোর্স,

এবার নিয়ে তিনবার পড়া শেষ করলেন ফোল্ডারটা। এটা তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন ল্যাটিন আমেরিকা বিষয়ে প্রেসিডেন্টের সিনিয়র ডিরেক্টর-দের একজন।

জিমি উইলফোর্স ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছিলেন, প্রেসিডেন্ট বারবার অনুরোধ করায় হোয়াইট হাউসে তাঁর বিশেষ অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে হয়েছে ভদ্রলোককে। অনিচ্ছার সাথে দায়িত্বটা গ্রহণ করলেও, কাজ শুরু করার পর তিনি আবিষ্কার করেছেন যে হোয়াইট হাউসের আমলাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানোর দুলর্ভ একটা প্রতিভা এতোদিন সুপ্ত ছিলো তাঁর ভেতর।

তাঁর কফি-ব্রাউন রঙের চুল মাথার ঠিক মাঝখানে দু'ভাগ করা। চশমার কাঁচ গোল আর ছোটো, তারের ফ্রেম। হাতের কাজটি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো বিষয়ে মাথা ঘামাতে অভ্যস্ত নন তিনি। ভদ্রলোক পাইপ টানেন, তবে বন্ধুবর রাহাত খানের সাথে দেখা হলেই প্রতিজ্ঞা করেন, ধূমপান তাঁরা দু'জন একসাথে ছেড়ে দেবেন। যদিও ছাড়ার কোনো চেষ্টা দু'জনের কারো মধ্যেই দেখা যায় না।

ফোল্ডারে মেক্সিকান সংবাদপত্রের প্রচুর কাটিং রয়েছে। সেগুলোর ওপর আবার চোখ বুলাতে শুরু করলেন জিমি উইলফোর্স, পড়তে পড়তেই পাইপে আগুন ধরালেন। ফোল্ডারের বিষয় একটাই।

রিভেরা। ম্যানুয়েল রিভেরা।

মেক্সিকান সাংবাদিকরা তার সাক্ষাৎকার নিতে পারলেও, আমে-রিকান সাংবাদিক বা সরকারী প্রতিনিধির সাথে কথা বলতে রাজি হয়নি সে। দেহরক্ষীদের তৈরি পাঁচিল ভেদ করে কেউ তারা তার সামনে পৌঁছুতে পারেনি।

স্প্যানিশ ভাষাটা ভালোই জানা আছে জিমি উইলফোর্সের, কাজেই

লেখাগুলো পড়তে তাঁর অসুবিধে হলো না। এবার পড়ার সময় একটা প্যাড আর কলম টেনে নিলেন তিনি, নোট রাখবেন।

এক। ম্যানুয়েল রিভেরার দাবি, দরিদ্রস্য দরিদ্রদের মধ্যে থেকে উঠে এসেছে সে। মেক্সিকো সিটিতে যেখানে আবর্জনা ফেলা হয়, সেই আস্তাকুঁড়ের কিনারায় আস্তাকুঁড় দিয়ে তৈরি একটা ঝুপড়ির ভেতর জন্ম হয়েছে তার। জন্মতারিখ, মাস বা বছর, কিছুই মনে নেই। কিভাবে সে বেঁচে গেছে বলতে পারবে না, তবে একটু বড় হবার সাথে সাথে শিখেছে কিভাবে মাছি, আবর্জনা, নর্দমা, দুর্গন্ধ, শীত আর খিদে নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

দুই। স্বীকার করে, কোনোদিন স্কুলে যায়নি। ছেলেবেলা আর টলটেক/আযটেক ধর্মের স্বঘোষিত অবতার হওয়ার মাঝখানের সময়টা সম্পর্কে তার কোনো ইতিহাস জানা যায় না।

তিন। তার মধ্যে দিয়ে দশম শতাব্দীর ধর্মীয় গুরু ও টলটেকদের শাসক টপিল্টজিন পুনরায় ধরাধামে ফিরে এসেছেন বলে দাবি করে সে। কিংবদন্তীর দেবতা কুয়েটজালকোট্‌ল আর টপিল্টজিনকে এক বলে ধারণা করা হয়।

চার। প্রাচীন সংস্কৃতি আর ধর্মের সংমিশ্রণে রাজনৈতিক দর্শন প্রচার করে রিভেরা, যার মূল কথা হলো কোনো দল নয়, মাত্র এক-জন ধর্মীয় গুরু বা অবতার রাজ্য শাসন করবে। রিভেরার উচ্চাশা, মেক্সিকান জনসাধারণের সর্বজন শ্রদ্ধেয় পিতা হিসেবে নিজেকে প্রতি-ষ্ঠিত করবে সে। কিভাবে বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করবে জিজ্ঞেস করা হলে প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। ক্ষমতায় এলে কিভাবে সরকার গঠন করবে সে-সম্পর্কে আলোচনা করতে রাজি নয়।

পাঁচ। ভাষণে জাদু আছে। মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। দোভা-

ষীর সাহায্য নিয়ে শুধু প্রাচীন আযটেক ভাষায় কথা বলে সে। মধ্য মেক্সিকোয় এই ভাষা এখনো অনেকে ব্যবহার করে।

ছয়। বেশিরভাগ সমর্থক ফ্যানাটিক। বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতো গোটা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার জনপ্রিয়তা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের বিশ্বাস, জাতীয় নির্বাচনে রিভেরা আর তার দল শতকরা আশি ভাগ আসনে জয়লাভ করবে। অথচ নির্বাচনে অংশগ্রহণে রাজি নয় সে। তার বক্তব্য, তা যথার্থও বটে, যে নির্বাচনে হারলেও দুর্নীতিপরায়ণ সরকার ক্ষমতা ছাড়বে না। জনসাধারণকে সাথে নিয়ে সরকারকে উৎখাত করাই তার লক্ষ্য।

নিভে যাওয়া পাইপটা অ্যাশট্রেতে রেখে সিলিঙের দিকে তাকালেন জিমি উইলফোর্স। তারপর মন্তব্য লিখতে শুরু করলেন তিনি।

সামারি ঃ ম্যানুয়েল রিভেরা ইজ আইদার ইনক্রেডিবলি ইগনরেন্ট অর ইনক্রেডিবলি গিফটেড। ইগনরেন্ট ইফ হি ইজ হোয়াট হি সেইস হি ইজ। গিফটেড ইফ হি হ্যাজ আ মেথড টু হিজ ম্যাডনেস, এ গোল ওনলি হি ক্যান সী। ট্রাবল, ট্রাবল ট্রাবল।

লেখা শেষ হয়েছে, ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠলো টেলিফোন। রিসিভার তুললেন জিমি উইলফোর্স।

'এক নম্বরে প্রেসিডেন্ট, স্যার,' সেক্রেটারী ঘোষণা করলো।

বোতাম চাপ দিলেন উইলফোর্স। 'ইয়েস, মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

'পেড্রো ফেডানোর কোনো খবর পেলেন?'

'না, কোনো খবর নেই।'

প্রেসিডেন্টের প্রান্তে কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি। তারপর শোনা গেল, 'আমার সাথে তাঁর দেখা করার সময় দু'ঘণ্টা হলো পেরিয়ে গেছে। আমি উদ্বেগ বোধ করছি। তাঁর যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে,

এতোক্ষণে পাইলটের একটা খবর পাঠানোর কথা।'

'তিনি হোয়াইট হাউসের কোনো জেট নিয়ে মেক্সিকো সিটিতে যাননি,' ব্যাখ্যা করলেন জিমি উইলফোর্স। 'গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে একটা কমার্শিয়াল এয়ারলাইনারে গেছেন, কোচ ক্লাসে, ট্যুরিস্ট হিসেবে।'

'বুঝলাম,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'প্রেসিডেন্ট অগাস্টিন মোরেনো যদি জানতে পারেন ব্যক্তিগত একজন প্রতিনিধিকে তাঁর বিরোধীপক্ষের সাথে আলোচনা করতে পাঠিয়েছি, ব্যাপারটাকে তিনি অপমান বলে মনে করবেন, ফলে আগামী হপ্তার আরিজোনা কনফারেন্সটা ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে।'

'ইয়েস, মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

'ইউ. এন. চার্টার ক্র্যাশ সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়েছে আপনাকে?' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলালেন প্রেসিডেন্ট।

'না, স্যার,' জবাব দিলেন জিমি উইলফোর্স। 'আমি যে একমাত্র তথ্যটি জানি, উম্মে সালিহা বেঁচে গেছেন।'

'তিনি আর ক্রুদের দু'জন সদস্য। বাকি সবাই বিষক্রিয়ায় মারা গেছেন।'

'বিষ?' উইলফোর্সের গলায় অবিশ্বাস।

'ইনভেস্টিগেটররা তাই বলছে। তাদের বিশ্বাস, সবাইকে বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা করে প্যারাস্যুট নিয়ে আইসল্যাণ্ডে নেমে গেছে পাইলট।'

'তাহলে নিশ্চয়ই লোকটা ভুয়া হবে।'

'একটা লাশ না পাওয়া পর্যন্ত হ্যাঁ-না কিছুই বলা যাচ্ছে না।'

'গড, ইউ. এন. প্রতিনিধিদলকে মেরে কোন্ টেরোরিস্ট গ্রুপ কি

অর্জন করবে ?'

'এখনো কেউ কৃতিত্ব দাবি করেনি। সি. আই. এ. থেকে ওয়ারেন হোল্ডিং বলছেন, এটা যদি টেরোরিস্টদের কাজ হয়, তাহলে মনে করতে হবে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বদলেছে।'

'হতে পারে উম্মে সালিহাই টার্গেট ছিলেন। মোস্তফা কামাল বহু-বার বলেছে, তাকে সে দেখে নেবে।'

'সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

'প্রেস কিছু জানতে পেরেছে ?'

'এক ঘণ্টার মধ্যে গোটা দুনিয়া জানবে। চেপে রাখার কোনো কারণ আমি দেখছি না।'

'আপনি আমাকে বিশেষ কিছু করতে বলেন, মিঃ প্রেসিডেন্ট ?'

'শুধু এইটুকু, মিঃ উইলফোর্স, প্রেসিডেন্ট অগাস্টিন মোরেনো আর তাঁর দলের প্রতিক্রিয়া জানতে পারলে ভালো হয়। ইউ. এন. ফ্লাইটে মেক্সিকোর এগারোজন নাগরিক ছিলেন—ডেলিগেট ও এজেন্সি প্রতিনিধি। আমার নামে শোকবাণী পাঠান, সাহায্যের প্রস্তাব দিন। ও, হ্যাঁ, ভালো কথা, স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিল হ্যারিংটনকে সব জানাবেন।'

'ঠিক আছে।'

'আর, মিঃ পেড্রো ফেডানোর কাছ থেকে খবর পাওয়া মাত্র আমাকে জানাবেন।'

'ঠিক আছে, মিঃ প্রেসিডেন্ট।' রিসিভার রেখে দিয়ে ফোল্ডারটার দিকে আবার তাকালেন জিমি উইলফোর্স। ভাবলেন, ইউ. এন. হত্যা-কাণ্ডের সাথে ম্যানুয়েল রিভেরা কোনোভাবে জড়িত নয় তো ?

আসলে ঠিক কি অর্জন করতে চাইছে রিভেরা ? আযটেক

মেক্সিকো ? অতীতের পুনরুত্থান ? সেকেলে শাসনব্যবস্থা আধুনিক যুগে অচল, এটা বোঝার মতো জ্ঞান তার নেই তা বিশ্বাস করা যায় না। তাহলে ?

আসলে জিমি উইলফোর্স ডিটেকটিভ নন। তিনি বুঝতে পারছেন বটে অন্য একটা কিছু পরিচালিত করছে বা শক্তি যোগাচ্ছে রিভেরাকে, কিন্তু সেটা কি হতে পারে কোনো ধারণা করতে পারছেন না। তিনি শুধু রিভেরাকে একজন ভিলেন হিসেবে বিবেচনা করতে পারছেন।

দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকলো তাঁর সেক্রেটারী, ডেস্কের ওপর একটা ফাইল ফোল্ডার রাখলো। 'সি. আই. এ. থেকে যে রিপোর্টটা চেয়েছিলেন, স্যার। আর, তিন নম্বরে আপনার একটা কল অপেক্ষা করছে।'

'কে ?'

'অ্যালিস টিসডেল নামে এক ভদ্রলোক,' বললো মেয়েটা।

'হোয়াইট হাউস সিকিউরিটি। কি চায় বলেছে ?'

'জরুরী।'

ফোনের রিসিভার তুলে বোতামে চাপ দিলেন জিমি উইলফোর্স। 'হ্যাঁ !'

'অ্যালিস টিস··· ।'

'জানি, বলুন।'

'খুব ভালো হয় আপনি যদি জর্জ ওয়াশিংটন হাসপাতালের প্যাথোলজি ল্যাবে চলে আসেন, স্যার।'

'ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে ? কেন ?'

'আমি বরং ফোনে আর কিছু বলবো না, স্যার।'

'আমি অত্যন্ত ব্যস্ত, মিঃ টিসডেল। আপনাকে আরো খোলাসা করে বলতে হবে।'

ক্ষণিক নীরবতা। 'ব্যাপারটা আপনার ও মিঃ প্রেসিডেন্টের জন্যে উদ্বেগের বিষয়, স্যার। শুধু এইটুকু বলতে পারি।'

'কোনো আভাস দিতে পারেন না?'

প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে অ্যালিস টিসডেল বললো, 'আপনার অফিসের বাইরে আমার একজন লোক অপেক্ষা করছে, স্যার। সে আপনাকে ল্যাবে নিয়ে আসবে। ওয়েটিংরুমে দেখা হবে আমাদের।'

'আমার কথা শুনুন, টিসডেল···।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, আর কিছু বলা হলো না।

•

ল্যাবের ওয়েটিংরুমেই পাওয়া গেল অ্যালিস টিসডেলকে। 'এসেছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ,' আনুষ্ঠানিক সুরে বললো সে, করমর্দনের কোনো আগ্রহ দেখালো না।

'আমি এখানে কেন?' সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন জিমি উইলফোর্স।

'সনাক্ত করার জন্যে, স্যার।'

হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো উইলফোর্সের, ফিসফিস করে জানতে চাইলেন, 'কাকে?'

'দেখে নিয়ে আপনিই বলুন, স্যার।'

'লাশ দেখায় আমি অভ্যস্ত নই।'

'ঠিক লাশ নয়, স্যার। তবে শক্ত হতে হবে আপনাকে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন জিমি উইলফোর্স। 'ঠিক আছে, চলুন সেরে ফেলা যাক।'

করিডর পেরিয়ে একটা কামরায় ঢুকলো ওরা। কামরার মাঝখানে

একটাই স্টেনলেস স্টীলের টেবিল। সাদা, স্বচ্ছ একটা প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া রয়েছে লম্বা কি যেন। টেবিলের গা থেকে এক ইঞ্চির বেশি নয় জিনিসটার উচ্চতা। চেহারায় বিহ্বল ভাব নিয়ে টিসডেলের দিকে তাকালেন উইলফোর্স। 'কি সনাক্ত করতে হবে আমাকে?'

কথা না বলে প্লাস্টিক আবরণ সরিয়ে নিলো টিসডেল। তার হাতে হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেল সেটা।

টেবিলে পড়ে থাকা জিনিসটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন উইলফোর্স, চিনতে পারছেন না। প্রথমে মনে হলো, কাগজ কেটে মানুষের আকৃতি তৈরি করা হয়েছে। তারপর প্রচণ্ড ঘুসির মতো ধাক্কার সাথে উপলব্ধি করলেন। দু'পা পিছিয়ে দেয়ালে হেলান দিলেন তিনি, কোমর বাঁকা করে হাঁপাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটু পরই ফিরে এলো টিসডেল, হাতে ফোল্ডিং একটা চেয়ার ও তোয়ালে। প্রেসিডেন্টের বিশেষ অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে চেয়ারটায় বসতে সাহায্য করলো সে, হাতে ধরিয়ে দিলো তোয়ালেটা।

প্রায় দু'মিনিট চেয়ারে বসে থাকলেন জিমি উইলফোর্স। মুখে তোয়ালে চেপে ধরে শুকনো বমি করলেন। খানিকটা শান্ত হয়ে মুখ তুললেন তিনি। 'গুড লর্ড। ওটা তাহলে··· ?'

'চামড়া,' বললো টিসডেল। 'গা থেকে ছাড়ানো মানুষের চামড়া।'

টেবিলের দিকে জোর করে আবার তাকালেন উইলফোর্স। চুপসানো বেলুনের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। ছালটা কাটা হয়েছে মাথার পিছন থেকে গোড়ালি পর্যন্ত, শরীর থেকে চামড়া উঠে এসেছে ঠিক যেমন পশুদের আসে। লম্বা একটা চেরা দাগ রয়েছে বুকে, সেলাই দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে সেটা। চোখ নেই, তবে সবটুকু চামড়া আছে, হাত আর পায়েরও।

'বলতে পারেন, স্যার, কে হতে পারে?' শান্তভাবে জানতে চাইলো টিসডেল।

মুখ খুলতে গিয়েও খুললেন না জিমি উইলফোর্স। আবার অসুস্থ লাগলো নিজেকে। শুধু চুলগুলো তাঁর চেনা চেনা ঠেকছে। তবু তিনি জানেন। 'পেড্রো ফেডানো,' ফিসফিস করে বললেন তিনি।

কথা না বলে জিমি উইলফোর্সকে ধরে দাঁড় করালো টিসডেল, পাশের কামরায় নিয়ে এসে একটা সোফায় বসালো। এক মিনিট পর তাঁর হাতে গরম কফির একটা কাপ ধরিয়ে দিলো সে। 'খান, এখুনি আসছি আমি।'

একটা অ্যাটাচী কেস নিয়ে ফিরে এলো টিসডেল। নিচু টেবিলের ওপর রাখলো সেটা। 'চামড়াটা এটার ভেতরে করে আনা হয়েছে। ভাঁজ করা ছিলো। প্রথমে মনে করেছিলাম, কোনো সাইকো-র কাজ হবে। কিন্তু সার্চ করতে গিয়ে মিনি একটা টেপ রেকর্ডার পেয়ে গেলাম।'

'চালিয়েছেন?'

'কিছুই বুঝিনি। দু'জনের কথা রেকর্ড করা হয়েছে, যেন সাংকেতিক ভাষায় কথা বলছে তারা।'

'ফেডানোর সাথে আমার সম্পর্ক আপনি আবিষ্কার করলেন কিভাবে?'

'ছাড়ানো চামড়ার ভেতর ভদ্রলোকের আই. ডি. কার্ড ছিলো। তাঁর অফিসে গিয়ে সেক্রেটারীকে জেরা করি। সেখান থেকে জানতে পারি, এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা হবার আগে প্রেসিডেন্ট ও আপনার সাথে দু'ঘণ্টা কথা বলেছেন তিনি। কোথায় গিয়েছিলেন, সেক্রেটারী বলতে পারেনি। ধরে নিলাম, ক্লাসিফায়েড কোনো মিশনে গিয়ে-

ছিলেন। তারপর আপনার সাথে যোগাযোগ করি।'

'টেপ করা কথা কিছুই তুমি বোঝোনি?'

'একেবারে কিছু বুঝিনি তা নয়। চামড়া ছাড়ানোর সময় মিঃ ফেডানো যে চিৎকার করেন তা-ও টেপে আছে।'

চোখ বুজলেন জিমি উইলফোর্স, মন থেকে ছবিটা মুছে ফেলার চেষ্টা করলেন।

'তাঁর পরিবারকে জানাতে হবে,' বললো টিসডেল। 'স্ত্রী আছেন?'

'চার-চারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে একা হয়ে গেল বেচারি।' নিঃশব্দে কেঁদে ফেললেন উইলফোর্স।

এই প্রথম টিসডেলের পাথুরে চেহারা নরম হলো। 'আমি দুঃখিত, স্যার।'

তার কথা জিমি উইলফোর্স শুনতে পেলেন না। দুঃস্বপ্ন দেখার আতংক কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। এখন আর তাঁর বমি পাচ্ছে না। পেড্রো ফেডানো তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিলেন। তাঁর এই পরিণতি তিনি মেনে নিতে পারছেন না। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে তাঁর। এতো রাগ কখনো তাঁর হয়নি। হঠাৎ করে জিমি উইলফোর্স উপলব্ধি করলেন, তিনি দুর্বল নন। হোয়াইট হাউসের মুষ্টিমেয় যে-ক'জন লোক প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী, তিনি তাদেরই একজন। অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা তিনি ঘটাতে পারেন, অনেক স্বাভাবিক ঘটনা তিনি ঘটতে না দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। সিদ্ধান্ত নিলেন, এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তাঁর সবটুকু ক্ষমতা ব্যবহার করবেন। এমনকি দরকার হলে অন্যায়ভাবেও।

ম্যানুয়েল রিভেরাকে মরতে হবে।

*

মিশরীয় শহর আলেকজান্দ্রিয়া থেকে বিশ কিলোমিটার দক্ষিণে এটা একটা ব্যক্তি-মালিকানাধীন এয়ারপোর্ট। ছোট্ট একটা বীচক্রাফট এক্সিকিউটিভ জেট ল্যাণ্ড করলো। সবুজ একটা ভোলভো গাড়ির পাশে থামলো প্লেন, গাড়ির দরজায় ইংরেজিতে 'ট্যাক্সি' লেখা। এঞ্জিনের শব্দ থেমে যাবার সাথে সাথে ওপর দিকে উঠে খুলে গেল প্যাসেঞ্জার ডোর।

সাদা স্যুট পরা লোকটা নেমে এলো নিচে। গাঢ় নীল শার্টের সাথে ম্যাচ করা টাই পরেছে সে। ছ'ফুটের সামান্য কম হবে লম্বায়, একহারা গড়ন, এক মুহূর্ত থেমে টাক শুরু হওয়া চওড়া কপাল রুমাল দিয়ে মুছলো, একটা আঙুল দিয়ে সিধে করে নিলো লম্বা আর ঘন গোঁফ জোড়া। গাঢ় রঙের সানগ্লাসের আড়ালে রয়েছে চোখ দুটো, হাতে পরেছে সাদা লেদার গ্লাভস।

লণ্ডন থেকে একশো ছয় ফ্লাইটে যে পাইলট উঠেছিল, তার সাথে মোহাম্মদ আল দাউদের চেহারার কোনো মিল নেই।

শান্ত, দৃঢ় পদক্ষেপে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো সে। হুইলের পিছন থেকে সদ্য নেমে আসা ড্রাইভারকে বললো, 'গুড মর্নিং, এখলাস। ফেরার পর কোনো সমস্যা হয়েছে?'

'সব ঠিকঠাক আছে, আল দাউদ,' উত্তর দিয়ে গাড়ির পিছনের দরজা খুলে ধরলো সে, শোল্ডার হোলস্টারের পিস্তলাকৃতি শটগানটা গোপন করার কোনো চেষ্টা করলো না।

'কামালের কাছে নিয়ে চলো আমাকে।' গাড়িতে উঠে নির্দেশ দিলো দাউদ। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো এখলাস।

গাঢ় টিনটেড গাড়ির কাঁচ আর বডি বুলেটপ্রুফ। আরামদায়ক

নিচু একটা চেয়ারে বসেছে দাউদ, তার সামনে একটা ডেস্ক কেবিনেট, তাতে একগাদা ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে একজোড়া টেলিফোন, একটা রেডিও ট্র্যান্সমিটার ও টিভি মনিটর, একটা কমপিউটর। ভেতরে বার আর একজোড়া রাইফেলসহ র‍্যাক-ও রয়েছে।

পথে প্রতিটি মুহূর্ত টেলিফোনে ব্যস্ত থাকলো আল দাউদ। ডজন-খানেকের ওপর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে তার পুঁজি খাটছে। তার সম্পদের হিসেব একমাত্র সে-ই জানে। বুদ্ধিমত্তার চেয়ে নিষ্ঠুরতাই বরং তাকে ব্যবসায়িক সাফল্য এনে দিয়েছে। যদি কোনো সরকারী অফিসার বা প্রতিদ্বন্দ্বী তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, হঠাৎ করে একদিন নিখোঁজ হয়ে যায় লোকটা, তারপর তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

বিশ কিলোমিটার ছুটে এসে একটা গেটের সামনে থামলো সবুজ গাড়ি। ভেতরে ছোটো একটা ভিলা, পাহাড়ের গায়ে। ভিলা থেকে বালুময় সৈকত দেখা যায়।

কমপিউটরে লাভের হিসাব করছিল দাউদ, বোতাম টিপে সেটা বন্ধ করলো সে, দরজা খুলে নেমে দাঁড়ালো। বালি রঙের ইউনিফর্ম পরা চারজন গার্ড ঘিরে ধরলো তাকে, খুঁটিয়ে সার্চ করলো। তারপর তাকে একটা এক্স-রে ডিটেকটর-এর সামনে দিয়ে হাঁটতে বলা হলো। এ-ধরনের ডিটেকটর শুধু এয়ারপোর্টগুলোতেই দেখা যায়।

গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার পর সিঁড়ি বেয়ে ভিলায় উঠলো দাউদ। ধাপ বেয়ে ওঠার সময় কংক্রিটের ছোট একটা উঠনকে পাশ কাটালো সে। উঠনে বসে রয়েছে মোস্তফা কামালের দেহরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা। অলংকৃত খিলানটাকে পাশ কাটিয়ে এগোবার সময় আপনমনে

হাসলো দাউদ। খিলানের দরজা শুধুমাত্র সম্মানিত অতিথিদের জন্যে খোলা হয়। পাশের ছোট্ট একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হলো তাকে। অপমানবোধ করলেও, মন থেকে তাড়াতাড়ি মুছে ফেললো অনুভূতিটা। সে জানে, কোনো কোনো ব্যাপারে অত্যন্ত নীচ মানসিকতার পরিচয় দেয় মোস্তফা কামাল। যারা তার নোংরা কাজগুলো করে দেয়, তাদের প্রতি নির্লিপ্ত অবহেলাসূচক আচরণ করে সে, তাকে ঘিরে প্রিয় ফ্যানাটিকদের যে বৃত্তটা আছে সেখানে তাদের স্থান হয় না।

পথ দেখিয়ে তাকে একটা নগ্ন নির্জন কামরায় পাঠানো হলো। ভেতরে একটাই মাত্র কাঠের টুল। বদ্ধ বাতাস অত্যন্ত গরম লাগলো দাউদের। একদিকের দেয়াল জুড়ে কালো কার্পেট ঝুলছে। ঘরে কোনো জানালা নেই, আলো আসছে শুধু মাথার ওপর ভেন্টিলেটর থেকে। বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে গার্ড।

হাই তুললো দাউদ, হাতঘড়িটা এমনভাবে তুললো যেন সময় দেখছে। এরপর সানগ্লাস খুলে চোখ দুটো রগড়ালো সে। চোরা চোখে টিভি ক্যামেরার খুদে লেন্সটা দেখে ফেললো সে, ঝুলন্ত কার্পেটের সাথে ফিট করা রয়েছে।

প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো তাকে। এরপর কার্পেট সরিয়ে নিচু একটা খিলানের তলা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো মোস্তফা কামাল।

মিশরীয় মুসলমানদের আধ্যাত্মিক নেতা মোস্তফা কামালের বয়স বেশি নয়, ত্রিশের কাছাকাছি হবে। ছোটোখাটো আকৃতি, দাউদের দিকে তাকানোর জন্যে ওপর দিকে মুখ তুলতে হলো তাকে। তার চেহারায় মিশরীয় বৈশিষ্ট্য নেই বললেই চলে। চিবুক আর চোয়ালের

গঠনে কোমল ভাব রয়েছে, প্রায় গোল। সাদা সিল্কের পাগড়ি কপাল আর মাথাটাকে ঢেকে রেখেছে, ঝাঁটার হাড়সদৃশ্য শরীর ঢেকেছে সাদা ঢোলা-হাতা জামা। ছায়া থেকে আলোয় বেরিয়ে আসার সাথে সাথে তার চোখের রঙ কালো থেকে গাঢ় খয়েরিতে বদলে গেল।

দাঁড়ালো দাউদ। শ্রদ্ধা জানাবার ভঙ্গিতে মাথাটা মৃদু ঝাঁকালো। তাকিয়ে আছে সরাসরি মোস্তফা কামালের চোখে।

'ভালো তো, দোস্ত?' আবেগের সাথে বললো মোস্তফা কামাল। 'তোমাকে ফেরত পেয়ে আমি খুশি।'

'যেখানেই যাই, যতো দূরেই যাই,' বললো দাউদ, সে-ও কম খেলুড়ে নয়, 'আপনার কাছে ফিরে আসার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকি, জনাব। আপনার পাশে থাকার সুযোগ হলে নিজেকে আমার ধন্য মনে হয়।'

'প্লিজ, বসো!' অনুরোধ নয়, আদেশের মতো শোনালো কথাটা।

কাঠের টুলে বসলো দাউদ, এবার ওপর থেকে তার দিকে তাকাতে পারবে মোস্তফা কামাল। দাউদের মনে হলো, এটাও তাকে অপমান করার জন্যে। কোনো বিরতি ছাড়াই ভাষণ দেয়ার সুরে কথা বলতে শুরু করলো মোস্তফা কামাল, টুলটাকে ঘিরে পায়চারি করছে সে, ফলে টুলে বসা অবস্থায় প্রতি মুহূর্ত তার দিকে ঘুরতে হলো দাউদকে। 'প্রতি হপ্তায় নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে মেরুদণ্ড-হীন প্রেসিডেন্ট ইসমাইলকে। তার পতন ঠেকিয়ে রেখেছে সামরিক বাহিনীর বিশ্বস্ততা। সাড়ে তিন লক্ষ সৈনিকের ওপর এখনো তার কর্তৃত্ব আছে। তবে ডিফেন্স মিনিস্টার কায়সার আজিজের সাথে কথা হয়েছে আমার। সে আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছে, ইসলামিক রিপাবলিক গঠনে আমাদের আন্দোলনকে পুরোপুরি সমর্থন দেবে সে, যদি আমরা রক্তপাত না ঘটিয়ে জাতীয় রেফারেণ্ডাম অর্জন করতে

পারি।'

'লক্ষণ খারাপ, নাকি ভালো?' চেহারায় অজ্ঞতার ভাব ফুটিয়ে জানতে চাইলো দাউদ।

তার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকালো মোস্তফা কামাল। 'লোকটার হাত পাতা অভ্যেস। যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে লোভী হয়ে উঠেছে। মহা কাপুরুষ, আমেরিকান এইড ছাড়া দেশ চালানো সম্ভব নয় বলে তার ধারণা। আরো জেট প্লেন, হেলিকপ্টার গানশিপ আর ট্যাংক দরকার তার। ভয় পাচ্ছে, মিশরের পরিণতি ইরানের মতো না হয় আবার। হাঁদাটা বোঝাতে চেষ্টা করছে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করা গেলে বিদেশী সাহায্য যেমন আসছে তেমনি আসতে থাকবে। তা না হলে বিশ্ব ব্যাংকের লোন আর মার্কিন অনু-দান বন্ধ হয়ে যাবে।'

গাঢ় চোখ মেলে দাউদের দিকে তাকিয়ে থাকলো মোস্তফা কামাল, যেন অপেক্ষা করছে প্রতিবাদের সুরে কিছু বলবে দাউদ।

দাউদ কথা বললো না।

'কায়সার আজিজ আরো দাবি করছে, আমাকে কথা দিতে হবে উম্মে সালিহার ব্যাপারে আমি চোখ বন্ধ করে রাখবো। জাতিসংঘের মহাসচিব থাকবে সে, আধ-ন্যাংটো হয়ে দুনিয়াময় ঘুরে বেড়াবে, প্রেসি-ডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীদের সাথে বিছানায় শোবে, মৌলবাদের বিরুদ্ধে ভাষণ দিয়ে বেড়াবে, কিন্তু আমি কিছু না বলে, কিছু না করে, সব মুখ বুজে সহ্য করবো।'

'কিন্তু তাহলে যে আপনি আমাকে অর্ডার করলেন তাকে খুন করার জন্যে?' দাউদের চোখে কৌতূহল।

মোস্তফা কামাল হাসলো। রক্তমাংসের মুখ নয়, যেন একটা মুখোশ

হাসলো। 'জালিম সরকারকে উৎখাত করে দেশে ইসলামিক শাসন-ব্যবস্থা চালু করতে হলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে, দাউদ। কথা তো দিয়েইছি। কায়সার আজ্রিজ জানবে আমি আমার কথা রেখেছি। সেজন্যেই তো দায়িত্বটা দেয়া হয়েছিল তোমার মতো যোগ্য লোককে, যাতে কাকপক্ষীও টের না পায় যে কাজটা আমার নির্দেশে ঘটেছে।'

'কিন্তু কেন, জনাব?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইলো দাউদ। 'উম্মে সালিহাকে খুন করে কি লাভ হলো আমাদের?'

'লাভ এই যে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারণায় জাতিসংঘের মহাসচিবের পদটা ব্যবহার করছে উম্মে সালিহা। তার একার চেষ্টায় সারা দুনিয়ায় আমার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছে। তাছাড়া, মুসলিম একটা মেয়ে বেপর্দা চলাফেরা করবে, সেটা দেখেও চুপ করে থাকা মহাপাপ। ইসলামিক আইন অনুসারেই তার বিচার হওয়া দরকার। কারণ আরো আছে, দোস্ত দাউদ। দেশের লোক অনেকেই বিশ্বাস করে, সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা করার জন্যে উম্মে সালিহা অত্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তি বলে বিবেচিত হতে পারে। বিভিন্ন মহল থেকে আমাকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, আমি প্রেসিডেন্ট হয়ে উম্মে সালিহাকে যদি প্রধানমন্ত্রী করার প্রতিশ্রুতি দেই, তাহলে নাকি ইসমাইল সরকার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে নির্বাচন দেবে।'

'তারমানে উম্মে সালিহাকে আপনি ভয় পেতেন, সে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে ভেবে?'

'উঠতে পারে এইজন্যে যে আজও সে বেঁচে আছে,' পায়চারি থামিয়ে গর্জে উঠলো মোস্তফা কামাল। 'তুমি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছো, দাউদ। বাকি সবাইকে মারতে পারলেও, উম্মে সালিহার একটা চুলও তুমি ছিঁড়তে পারোনি।'

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল দাউদ। 'কি বলছেন, জনাব? উম্মে সালিহা বেঁচে আছে?'

রাগে থরথর করে কাঁপলেও, চোখ জোড়া শীতল হয়ে গেল মোস্তফা কামালের। 'এক ঘন্টাও হয়নি খবরটা পৌঁচেছে ওয়াশিংটনে। প্লেনটা বিধ্বস্ত হয়েছে গ্রীনল্যাণ্ডে। দু'জন ক্রু আর উম্মে সালিহা বাদে বাকি সবাই বিষ ক্রিয়ায় মারা গেছে।'

'বিষ ক্রিয়ায়?' হাঁ হয়ে গেল দাউদ।

'মার্কিন নিউজ মিডিয়ায় আমাদের বেতনভুক সোর্স আছে, রিপোর্ট-টা কনফার্ম করেছে তারা। কি ভাবছো, দাউদ? তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে, প্লেনটা সাগরে তলিয়ে যাবে।'

'তারা কি জানিয়েছে কিভাবে প্লেনটা গ্রীনল্যাণ্ডে পৌঁছুলো?'

প্লেন গ্রীনল্যাণ্ডে নামার কিছুক্ষণ আগে থেকে যা যা ঘটেছিল, প্রতিটি ঘটনার প্রায় নিখুঁত বর্ণনা দিলো মোস্তফা কামাল।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল দাউদ। ব্যর্থতায় অভ্যস্ত নয় সে। এতো পরিশ্রমের ফসল প্ল্যানটা বানচাল হয়ে গেছে ভাবতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে উঠলো তার।

'নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে যা ঘটেছে তার জন্যে আমাকে দায়ী করা হবে?' কর্কশস্বরে জিজ্ঞেস করলো মোস্তফা কামাল।

'ঘটনার সাথে আপনাকে বা আমাকে জড়ানো যায় এমন কোনো প্রমাণ আমি রেখে আসিনি,' দৃঢ়তার সাথে জানালো দাউদ।

'হয়তো: কিন্তু মানুষের মুখে হাতচাপা দেবে কিভাবে? ওয়েস্টার্ন নিউজ মিডিয়া এককভাবে আমাকে দায়ী করবে। এ থেকে রক্ষা পাবার একটাই পথ খোলা আছে আমার সামনে। তোমাকে অভিযুক্ত করা। অর্থাৎ তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তা কার্যকরী করলে আমার নির্দোষিতা

প্রমাণ হয়।'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো দাউদ। 'অত্যন্ত দুঃখজনক একটা অপচয় হবে সেটা। গোটা মধ্যপ্রাচ্যে আমিই এখনো সেরা খুনী।'

'পেমেন্টও পাও সবচেয়ে বেশি।'

'অসমাপ্ত কাজের জন্যে মজুরি নিতে অভ্যস্ত নই আমি, জনাব।'

'অসমাপ্ত কাজের জন্যে মজুরি দিতে আমিও কি অভ্যস্ত?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ঝট্ করে ঘুরলো মোস্তফা কামাল, দীর্ঘ পদক্ষেপে কালো কার্পেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, এক ঝটকায় সেটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাবে, কি মনে করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো দাউদের দিকে। 'প্রার্থনার জন্যে তৈরি হতে হবে আমাকে, দাউদ। তুমি যেতে পারো।'

'কিন্তু উম্মে সালিহা? কাজটা যে অসমাপ্ত রয়ে গেল!'

'তাকে সরানোর দায়িত্ব আমি আবু সুফিয়ানকে দিচ্ছি।'

'সুফিয়ান?' ক্ষীণ আড়ষ্ট হাসি নিয়ে তাকালো দাউদ। 'আবু সুফিয়ান তো একটা নির্বোধ।'

'তাকে বিশ্বাস করা যায়।'

'হ্যাঁ,' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো দাউদ। 'নর্দমা পরিষ্কার করার কাজে।'

কঠিন চোখে গনগনে আগুন নিয়ে মোস্তফা কামাল কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো দাউদের দিকে, তারপর বললো, 'উম্মে সালিহার কথা ভুলে যাও। মিশরে, আমার পাশে থাকছো তুমি। আমাদের আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে বিশ্বস্ত উপদেষ্টাদের সাথে আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আমার কথা চলছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে আবার আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা সুযোগ তুমি পেতে যাচ্ছো।'

টুল ছেড়ে দাঁড়ালো দাউদ। 'মেক্সিকান ডেলিগেট, প্লেন চালাতে চীফ স্টুয়ার্ডকে সাহায্য করেছে যে লোকটা। সে-ও কি বিষ ক্রিয়ায় মারা গেছে?'

মাথা নাড়লো মোস্তফা কামাল। 'রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্লেন বিধ্বস্ত হওয়ায় মারা গেছে সে।' পর্দার ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। আগের জায়গায় ঝুলে পড়লো কালো পর্দা।

ধীরে ধীরে টুলের ওপর আবার বসলো আল দাউদ। একটু একটু করে ব্যাপারটা উপলব্ধি করলো সে। তার রাগ হওয়ার কথা। কিন্তু রাগ নয়, তার বদলে ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠলো। 'তাহলে জল্লাদ আমরা দু'জন ছিলাম,' খালি ঘরে বিড়বিড় করে উঠলো সে। 'দ্বিতীয় জল্লাদ খাবারে বিষ মিশিয়েছে। বীফ ওয়েলিংটনে। ইয়া আল্লাহ, তোমার মহিমা বোঝে কার সাধ্য।'

এগারো

সোনার রেকর্ডিং পেপারে ছোট্ট একটা ঝাপসা দাগ, প্রথমে কেউ পাত্তাই দিলো না।

ছয় ঘণ্টা অনুসন্ধান চালিয়ে মানুষের তৈরি অনেক জিনিসই খাঁড়ির

তলায় দেখলো ওরা। তিন বছর আগে ডুবে যাওয়া একটা প্লেনের ভগ্নাংশ চেনা গেল। চেনা গেল ডুবন্ত একটা ফিশিং ট্রলার। ঝড়ের মুখে অনেক জেলে নৌকো খাঁড়িতে আশ্রয় নিতে আসে, তাদের ফেলা হরেক রকম জিনিস রয়েছে তলায়। প্রতিটি জিনিস সনাক্ত করা সম্ভব হলো ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে।

ঝাপসা দাগটা, যেমন আশা করা যায়, খাঁড়ির মেঝেতে নয়। জিনিসটা রয়েছে ছোটো একটা ইনলেট-এ, খাড়া পাহাড়প্রাচীর দিয়ে চারদিক থেকে ঘেরা। জিনিসটার মাত্র একটা অংশ স্বচ্ছ পানিতে বেরিয়ে আছে, বাকি সব বরফ-পাঁচিলের নিচে চাপা পড়েছে।

তাৎপর্যটা প্রথমে ধরতে পারলো রানা। রেকর্ডারের সামনে বসে আছে ও, ওকে ঘিরে রয়েছে বেন নেলসন, কমাণ্ডার জন ম্যাকেঞ্জি ও আর্কিওলজিস্টরা। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন তাঁর হেলিকপ্টার নিয়ে হেডকোয়ার্টারে ফিরে গেছেন। ট্র্যান্সমিটারে কথা বললো রানা। 'মাছটাকে ঘোরাও, বেয়ারিং ওয়ান-ফাইভ-জিরো ডিগ্রী।'

বরফ ঢাকা খাঁড়িতে এখনো স্থির হয়ে রয়েছে আইসব্রেকার শারলক। লেফটেন্যান্ট জন ফিলিপের নেতৃত্বে একদল লোক আইসপ্যাকের ওপর নেমে পড়েছে, রানার নির্দেশ মতো পানির এখানে সেখানে ডোবাচ্ছে সেনসিং ইউনিট। মাছ, অর্থাৎ সেনসিং ইউনিট, অত্যন্ত ধীরগতিতে ঘোরানো হয়, যাতে তিনশো ষাট ডিগ্রী আওতার ভেতর যা কিছু আছে সব রেকর্ড করা যায়। আইসপ্যাকের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে দলটা, জাহাজ থেকে কেব্‌ল্ ছাড়া হচ্ছে।

রানার নির্দেশ মতো কাজ করলো জন ফিলিপ। মাছের সোনার প্রোব দেড়শো ডিগ্রী ঘুরে গেল। 'হয়েছে?'

'একেবারে টার্গেটের ওপর,' জাহাজ থেকে জবাব দিলো রানা।

রেকর্ডিং পেপারে জিনিসটা এখন আগের চেয়ে স্পষ্ট। ফেল্ট পেন দিয়ে দাগটার চারদিকে একটা বৃত্ত আঁকলো ও। 'আমার ধারণা, একটা কিছু পেয়েছি আমরা।'

ডঃ মোরেল রানার কাঁধের ওপর হুমড়ি খেলেন। 'চেনার মতো স্পষ্ট নয় এখনো। আপনার কি মনে হচ্ছে?'

'পাহাড়ের মাথা থেকে অনেক জিনিস পড়েছে নিচে, সবগুলো বরফে প্রায় ঢাকা,' বললো রানা। 'এটারও তাই, তবে যে অংশটুকু বেরিয়ে আছে, আমার মনে হচ্ছে···ওটা একটা কাঠের তৈরি জাহাজ। ভালো করে দেখুন, চারকোণা একটা আকৃতি বেরিয়ে আছে, স্টার্ন-পোস্ট হতে পারে।'

রানার আরেক কাঁধের ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে জেনিথ। চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'হ্যাঁ, ঠিক, তাই! গড! ওহ্ গড! ওগুলো চতুর্থ শতাব্দীর বাণিজ্য জাহাজে দেখা যেতো!'

'উত্তেজিত হবেন না,' সাবধান করে দিলেন কমাণ্ডার জন ম্যাকেঞ্জি। 'অতো পুরনো আমলের না-ও হতে পারে!'

ডঃ মোরেল পরামর্শ দিলেন, 'আমরা একটা ক্যামেরা নামিয়ে স্পষ্ট ছবি পাবার চেষ্টা করতে পারি।'

বেন নেলসন সন্দেহ প্রকাশ করলো, 'বরফের ভেতর লুকানো অংশ-টার ছবি আপনি ক্যামেরা থেকে পাবেন না।'

'পুরুষ কর্মীর অভাব নেই আপনাদের,' বললো জেনিথ। 'নিচের বরফ ভাঙা কোনো সমস্যা নয়।'

ব্রিজের ইলেকট্রনিক কমপার্টমেন্টে চলে গেলেন ডঃ মোরেল, ফির-লেন আধ মিনিট পর। 'ধ্বংসাবশেষের ওপর জমাট বরফ তিন মিটার পুরু,' বললেন তিনি। 'ভাঙতে কমকরেও দু'দিন লাগবে।'

'তার আগে,' বললো রানা, 'জানতে হবে আসলে জিনিসটা কি।'

'বরফ না ভেঙে জানবে কিভাবে?' জেনিথের প্রশ্ন।

'একটাই উপায় আছে,' বললো রানা। 'নিচে নেমে দেখে আসা।'

'মাগো! বলেকি! ওখানে যা ঠাণ্ডা, নরকের আগুনও বোধহয় তারচেয়ে ভালো। কে নামবে?'

'কে আবার? নরকের অভিজ্ঞতা এখানে শুধু একজনেরই আছে।'

'কার?' সমস্বরে জানতে চাইলো সবাই।

উঠে দাঁড়ালো রানা। নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠেকালো। 'এই বান্দার।'

চেইন লাগানো করাত দিয়ে প্রথমে নিরেট আইসপ্যাকের বুকে এক মিটার গভীর একটা গর্ত করা হলো। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ানো হলো গর্তের পরিধি। অবশেষে স্লেজহ্যামারের আঘাতে গর্তের নিচের বরফ ভাঙা হলো, টুকরোগুলো তোলা হলো গ্র্যাপলিং হুকের সাহায্যে। এবার নিরাপদে ডুব দিতে পারবে রানা।

কাজ শেষ করে ক্যানভাস ঢাকা একটা তাঁবুতে ঢুকলো জন ফিলিপ। ভেতরে হিটিং সিস্টেম কাজ করছে। একপাশে ডাইভিং ইকুইপমেণ্ট দেখা গেল। সঙ্গী আর্কিওলজিস্টদের সাথে আলোচনা করছে জেনিথ। ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছে তারা। কাগজে ড্রইং আঁকছে রানা। আঁকার দায়িত্ব নিজে নিয়ে রানাকে ডাইভের জন্যে তৈরি হবার তাগাদা দিলো জেনিথ।

ভেতরে ঢুকে ফিলিপ বললো, 'গর্ত আপনার জন্যে তৈরি, মিঃ রানা।'

'আর পাঁচ মিনিট,' বললো বেন নেলসন। মার্ক ওয়ান-এর নেভি

ডাইভার মাস্কের ভালভ আর রেগুলেটর পরীক্ষা করছে সে।

স্পেশাল ড্রাই স্যুটটা পরে নিলো রানা। মাথায় পরলো হুড, কোমরে জড়ালো কুইক-রিলিজ ওয়েট বেল্ট। সেই সাথে প্রাচীন জাহাজের কাঠামো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জ্ঞানার্জন করছে ডঃ মোরেলের কাছ থেকে। 'কীল-এর জন্যে সাধারণত তারা ওক ব্যবহার করতো।'

'কাঠ চিনি, কিন্তু কোন্‌টা কোন্ গাছের বুঝি না।'

'তাহলে খোলটা পরীক্ষা করবেন। প্রাচীন খোলের বৈশিষ্ট্য হলো…।'

তাঁর কথার মাঝখানে কথা বললো নেলসন, 'রিজার্ভ এয়ার বটল লাগবে তোমার, রানা?'

ডঃ মোরেলের কথায় কান, উত্তরে শুধু মাথা নাড়লো রানা। ওর মাথায় মার্ক ওয়ান মাস্কটা পরিয়ে দিলো নেলসন, ওটার সাথে কমিউনিকেশন লাইন আছে।

নেভির একজন কর্মী এয়ার সাপ্লাই হোস ও কমিউনিকেশন লাইন চেক করছে, রানার কোমরে একটা ম্যানিলা লাইফলাইন বেঁধে দিলো নেলসন, তারপর হেডসেট মাইক্রোফোনে রানাকে জিজ্ঞেস করলো, 'পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছো?'

'পরিষ্কার, তবে আস্তে,' বললো রানা। 'আওয়াজ বাড়াও একটু।'

'অল সেট?'

ও. কে. সংকেত দিলো রানা। সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে এসে রানাকে আলিঙ্গন করলো জেনিথ কর্নেলিয়াস, মাস্কের ভেতর রানার চোখে চোখ রেখে বললো, 'গুড হান্টিং, অ্যাণ্ড বি কেয়ারফুল।'

উত্তরে চোখ মটকালো রানা। বেরিয়ে এলো তাঁবু থেকে। পিছনে

লাইন নিয়ে নেভির দু'জন কর্মী।

তাঁবু থেকে বেরুতে যাচ্ছে নেলসন, তার হাত চেপে ধরলো জেনিথ। 'ওর গলা আমরা সবাই শুনতে পাবো ?'

'পাবেন। স্পীকারের সাথে ওর যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছি,' বললো নেলসন। 'আপনি আর ডঃ মোরেল এখানেই থাকুন, কখন কি বলে রানা, শুনবেন। জরুরী কোনো মেসেজ থাকলে জানাবেন আমাকে, রানাকে পাঠিয়ে দেবো আমি।'

তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে নেলসন দেখলো, গর্ত থেকে পানিতে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেছে রানা। কেন জানি মনটা খারাপ হয়ে গেল তার।

পানির নিচে দৃষ্টিসীমা নাক বরাবর আশি মিটারের মতো। তিন মিটার লম্বা একটা দাড়িওয়ালা সীল চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। তার উদ্দেশ্যে একটা হাত লম্বা করে দিয়ে নাড়লো রানা, পালিয়ে গেল সীল।

খাড়ির তলায় পা ঠেকলো রানার। মুখ তুলে ওপর দিকে তাকালো। বরফের গর্ত ম্লান আভার মতো লাগলো। কম্পাস চেক করলো ও। ঝামেলা হবে ভেবে ডেপথ গজ আনেনি সাথে। 'কথা বলো আমার সাথে,' নেলসনের যান্ত্রিক গলা পেলো।

'তলায় পৌঁছে গেছি,' বললো রানা। 'সবগুলো সিস্টেম চমৎকার কাজ করছে।' সবুজ পানির ভেতর দিয়ে তাকালো ও। 'জিনিসটা আমার উত্তরে দশ মিটার দূরে। যাচ্ছি ওদিকে। লাইন ঢিল দাও।'

ধ্বংসাবশেষের পিছনটা ধীরে ধীরে ওর চোখের সামনে উন্মোচিত হলো। পুরু শেওলায় ঢাকা পড়ে রয়েছে পাশগুলো। গ্লাভস পরা হাত দিয়ে খানিকটা শেওলা সরালো, সবুজ মেঘ তৈরি হলো সামনে।

পানি আবার স্বচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো ওকে। প্রায় এক মিনিট পর বললো, 'জেনিথ আর ডঃ মোরেলকে জানাও, স্টার্ন রাডার ছাড়াই একটা খোল দেখতে পাচ্ছি আমি, তবে স্টিয়ারিং-এর জন্যে কোনো দাঁড় নেই।'

'জানাচ্ছি।'

একটা ছুরি বের করে খোলের নিচে, কীল-এর কাছে খোঁচা মারলো রানা। বেরিয়ে পড়লো নরম ধাতু। 'খোলের তলাটা সীসা দিয়ে মোড়া,' ঘোষণার সুরে বললো ও।

'লক্ষণ নাকি খুব ভালো,' জবাবে বললো নেলসন। 'ডঃ মোরেল জানতে চাইছেন স্টার্নপোস্টে কোনো কার্ভিং আছে কিনা।'

'হোল্ড অন।' খানিক পর আবার বললো রানা, 'স্টার্নপোস্টে ঢোকানো রয়েছে শক্ত কাঠের ফলকের মতো কি যেন একটা। অক্ষর-গুলো পড়তে পারছি না। একটা মুখও দেখছি।'

'মুখ?'

'মাথায় কোঁকড়ানো চুল, প্রচুর দাড়ি।'

'পড়ার চেষ্টা করো।'

'কি আশ্চর্য, গ্রীক আমি পড়বো কিভাবে!'

'গ্রীক, ল্যাটিন নয়?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো নেলসন।

'ল্যাটিন নয়, গ্রীক।'

'ঠিক জানো?'

'কি আশ্চর্য!'

'রাগ করো না, রাগ করো না! আর্কিওলজিস্টদের মাথা খারাপ করে দিয়েছো তুমি।' দু'মিনিট পর আবার নেলসনের গলা শুনতে পেলো রানা, 'ডঃ মোরেল বলছেন, তোমার মতিভ্রম ঘটেছে। তবে মরিস

উইনফিল্ড বলছেন, কলেজে তিনি ক্লাসিকাল গ্রীক পড়েছেন, জানতে চাইছেন তুমি অক্ষরগুলোর বর্ণনা দিতে পারবে কিনা।'

'প্রথম অক্ষরটা ইংরেজি এস-এর মতো, যেন আকাশের বিদ্যুৎ আঘাত হানতে যাচ্ছে। তারপর একটা এ, তবে সেটার ডান পা নেই। এরপর পি—সামান্য লেজ আছে। পি-র পর পঙ্গু আরেকটা এ, তারপর উল্টানো এল বা ফাঁসিকাঠ। এবার আই, এবং শেষ অক্ষর আরেকটা বিদ্যুৎ আকৃতির এস।'

তাঁবুতে বসে স্পীকারের মাধ্যমে রানার গলা শুনছে মরিস উইনফিল্ড, লিখে নিচ্ছে কাগজে। অক্ষরগুলো পাশাপাশি সাজানোর পর দাঁড়ালো :

লেখাটার দিকে কয়েক মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো উইনফিল্ড। কি যেন একটা ঠিক মিলছে না। স্মৃতির পাতা ওল্টাতে শুরু করলো সে। তারপর মনে পড়লো। অক্ষরগুলো ক্লাসিকাল, তবে ঈস্টার্ন গ্রীক। চিন্তিত ভাব বদলে গিয়ে তার চেহারায় অবিশ্বাস ফুটে উঠলো। কাগজের ওপর খস খস করে কিছু লিখলো সে, একটানে ছিঁড়ে জেনিথের দিকে সিধে করে ধরলো। আধুনিক ইংরেজি অক্ষরে লেখা শব্দটা হলো : SARAPIS

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো জেনিথ। 'এর কি বিশেষ কোনো অর্থ আছে?'

উত্তর দিলেন ডঃ মোরেল, 'আমার ধারণা, ওটা এক গ্রীক-ঈজিপশিয়ান দেবতার নাম।'

'ভূমধ্যসাগরের আশপাশে অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা উনি,' একমত হলো জোসেফ পেনবার্নার। 'আধুনিক বানানে সাধারণত লেখা হয়

এস-এর পর ই দিয়ে।'

'তাহলে আমাদের জাহাজ সেরাপিস,' বিড়বিড় করে উঠলো জেনিথ।

'কিন্তু জাহাজটা গ্রীক, রোমান, নাকি মিশরীয়?' জানতে চাইলেন জন ম্যাকেঞ্জি।

'আমাদের বিদ্যায় কুলোবে না,' ডঃ মোরেল বললেন। 'একজন মেরিন আর্কিওলজিস্ট বলতে পারবেন, বিশেষ করে প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় জাহাজ সম্পর্কে যদি তাঁর জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা থাকে।'

বরফের নিচে জাহাজটাকে ঘিরে সাঁতার কাটলো রানা। এক জায়গায় বরফ ভেতর দিকে ডেবে থাকতে দেখে পায়ের ফিন দিয়ে বারকয়েক আঘাত করলো ও। বরফের আবরণ আরো ভেতর দিকে ডেবে গেল। একটা হাত গলালো ও। কি যেন ঠেকলো হাতে। সম্ভবত খোলের একটা তক্তা। সেটা ধরে নিজের দিকে টানতে শুরু করলো ও।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর তক্তাটা বাঁকা হলো, কিন্তু ভাঙলো না। হাল ছেড়ে দেবে কিনা ভাবছে রানা, এই সময় তক্তাটাই পরাজয় স্বীকার করলো, ভাঙা অংশটা নিয়ে পিছন দিকে আছাড় খেলো ও। আদর্শ একজন আর্কিওলজিস্ট উপস্থিত থাকলে রানার চির শত্রুতে পরিণত হতেন। এ-ধরনের প্রাচীন শিল্পকর্ম ভাঙা আর সাতটা খুন করা প্রায় একই কথা।

পাথরে ধাক্কা খাওয়ায় কাঁধটা ব্যথা করছে রানার। ঠাণ্ডাও অসহ্য মনে হচ্ছে। নিচে আর বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। 'খোলের একটা জায়গা ভাঙতে পেরেছি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো ও। 'একটা ক্যামেরা পাঠাও।'

'উঠে এসো, দেয়া যাবে,' বললো নেলসন।

গর্তের মুখে উঠে এলো রানা। দেখলো, ক্যামেরা নিয়ে গর্তের কিনারায় শুয়ে রয়েছে নেলসন। আণ্ডারওয়াটার ভিডিও ক্যামেরা/রেকর্ডারটা ওর হাতে ধরিয়ে দিলো সে। 'তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরে এসো। যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছো।'

হাত নেড়ে আবার পানিতে ডুব দিলো রানা। নিচে নেমে এসে সাথে সাথে ফাঁকটা দিয়ে জাহাজের ভেতর ঢুকলো না ও। এক কি দু'মিনিট ইতস্তত করলো। কেন, তা নিজেও বলতে পারবে না। হতে পারে কংকালের একটা হাত ওকে অভ্যর্থনা জানাবে, এই আশংকায়। হতে পারে মনে ভয় রয়েছে ভেতরে তেমন কিছু হয়তো পাওয়া যাবে না, শেষ পর্যন্ত বোধহয় প্রমাণিত হবে জাহাজটা অতো পুরনো নয়।

অবশেষে মাথা নোয়ালো রানা। কাঁধ শক্ত করলো। তারপর ধীরে ধীরে ফিন নেড়ে ঢুকে পড়লো জাহাজটার ভেতর। অচেনা অন্ধকার একটা জগত আলিঙ্গন করলো ওকে।

জাহাজের ভেতর ঢোকার পর থামলো রানা, স্থির ঝুলে থাকলো, তারপর ধীরে ধীরে ভাঁজ করা হাঁটু নামিয়ে তল পাবার চেষ্টা করলো, বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শুনতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে এগজস্ট ভালভ থেকে বুদবুদ বেরোবার শব্দ। একটু একটু করে চারপাশের তরল জগত ঠাহর করতে পারলো ক্ষীণ আভায়।

জানে না কি পাবে বলে আশা করছে ও। বাল্কহেডের কয়েকটা শেলফে টেরা-কোটা জার, বড় আকারের কলসি, কাপ আর পিরিচ সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে। ভাঙা তক্তার ভেতর দিয়ে ঢোকার সময় হাতে ঠেকেছিল তামার পাত্র। কালের আঁচড়ে খোলের দেয়ালগুলো সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে।

প্রথমে ভাবলো, হাঁটু দুটো ডেকের শক্ত মেঝেতে রয়েছে। কিন্তু হাতড়াতে গিয়ে দেখলো টালি বিছানো চুলোর মেঝেতে হাত বুলাচ্ছে। মুখ তুলে ওপরে তাকালো ও, বুদবুদগুলো উঠে গিয়ে এক জায়গায় গতি হারাচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। পা লম্বা করে দিয়ে সিধে হলো রানা, মাথা আর কাঁধ উঠে এলো খাঁড়ির পানি ছেড়ে পরিষ্কার বাতাসে।

'জাহাজের ভেতর ঢুকেছি আমি,' বরফের ওপর রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষারত দলটাকে জানালো ও। 'ওপরের অর্ধেকটা শুকনো। ক্যামেরা সচল।'

'ঠিক আছে,' বললো নেলসন।

পরের ক'মিনিট গ্যালির ভেতর, পানির ওপর আর নিচটা, ভিডিও-রেকর্ডারে বন্দী করার কাজে ব্যস্ত থাকলো রানা, প্রতিটি নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে অনর্গল বলে গেল নেলসনকে। খোলা একটা আলমিরা দেখলো, ভেতরে দারুণ সুন্দর সব কাঁচের পাত্র। একটা হাতে নিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো—মুদ্রায় ভর্তি। দস্তানা পরা আঙুল দিয়ে ঘষে শ্যাওলা পরিষ্কার করলো একটা মুদ্রার। চকচক করে উঠলো মুদ্রাটা। একটু লালচে সোনালি।

রোমাঞ্চ আর বিস্ময়ে নেশা ধরে গেল রানার। তাড়াতাড়ি চারদিকে তাকালো, যেন আশা করছে নাবিকদের আত্মা বা ভূত-টুত দেখতে পাবে। অন্তত এক-আধটা কংকাল পানি ঠেলে এগিয়ে আসা বিচিত্র কিছু নয়, তাদের সংরক্ষিত গোপন জিনিসে হাত দিয়ে ফেলেছে রানা। কিন্তু না, ক্রুদের কাউকে দেখা গেল না। ও একা। এই একই ডেকে একদিন যারা হাঁটাচলা করেছে, খাবার রেঁধে খেয়েছে এখানে, তারা আজ থেকে ষোলো শো বছর আগে মারা গেছে।

আজ তারা কোথায় ? কি ঘটে থাকতে পারে তাদের ভাগ্যে ? এ-রকম আরো অনেক প্রশ্ন জাগলো রানার মনে। [illegible] ধরনের অভিযান সম্পর্কে যাদের কোনো ধারণাই ছিলো না, তারা এতো উত্তর হিমাঞ্চলে এলোই বা কেন ? মৃত্যুর কারণ যদি ধরে নেয়া হয় এক্সপোজার, তাহলে তাদের লাশগুলো গেল কোথায় ?

'তুমি বরং এবার উঠে এসো,' ওপর থেকে বললো নেলসন। 'নেমেছো তো আধঘণ্টা হয়ে এলো।'

'আর কিছুক্ষণ,' জবাব দিলো রানা। আধ ঘণ্টা, ভাবলো ও। যদিও মনে হচ্ছে, পাঁচ মিনিট। আঙুল গলে বেরিয়ে যাচ্ছে সময়। ঠাণ্ডা এতোক্ষণে ওর ব্রেনটাকে প্রভাবিত করছে। মুদ্রাটা কাঁচের পাত্রে রেখে আবার ঘুরে ফিরে দেখতে শুরু করলো চারদিকে।

মাথার ওপর মেইন ডেক, সেটাকে ছাড়ি[illegible] মিটার উঠে গেছে গ্যালির সিলিং। ছোটো আকারের খিলান আকৃতির জানালা, সাধারণত রোদ আর বাতাস চলাচলের কাজ করে, ফরওয়ার্ড বাল্কহেডের মাথার দিক থেকে তক্তা মেরে বন্ধ করা হয়েছে। খানিক চেষ্টা করে একটা তক্তা ভাঙতে পারলো রানা, ওপারে নিরেট বরফের দেয়াল।

মনে মনে একটা হিসেব করলো। গ্যালির সামনের দিকটায় পানির গভীরতা বেশি হবে। তারমানে জাহাজের বো আর মাঝখানের অংশটা নিশ্চয়ই পানিতে ডোবা নয়।

'আর কিছু পেলে ?' অধৈর্য হয়ে জানতে চাইলো নেলসন, কৌতূহলে মরে যাচ্ছে।

'যেমন ?'

'ক্রুদের অবশিষ্ট বা··· ?'

'দুঃখিত, কোথাও কোনো হাড় দেখছি না,' পানির নিচে ডুব দিলো

রানা, নিশ্চিত হবার জন্যে ডেকের ওপর চোখ বুলালো। ডেক খালি, কোথাও কিছু পড়ে নেই।

'তারা সম্ভবত আতংকিত হয়ে জাহাজ ত্যাগ করেছিল,' আন্দাজ করলো নেলসন।

'তারও কোনো প্রমাণ দেখছি না,' জানালো রানা। 'গ্যালির সব কিছু গুছানো রয়েছে। ব্যস্ততার ছাপ নেই।'

'জাহাজের বাকি অংশে যাওয়া যায়?'

'ফরওয়ার্ড বাল্কহেডে একটা হ্যাচ আছে। ওপারে কি আছে দেখবো।' ঝুঁকলো রানা, সরু আর নিচু ফাঁকটা গলে ধীরে ধীরে সামনে বাড়লো, সতর্কতার সাথে লাইফ-লাইন আর এয়ার হোসটা সাথে রাখছে। ঘোর অন্ধকার, ভয় লাগারই কথা। ওয়েট বেল্ট থেকে ডাইভ লাইটের হুক খুললো ও, আলো ফেলে দেখলো ছোটো একটা কমপার্টমেণ্টে রয়েছে। 'এটা বোধহয় একটা স্টোররুম। পানির গভীরতা কম এখানে, শুধু হাঁটু জোড়া ডুবেছে। যন্ত্রপাতি দেখতে পাচ্ছি—হ্যাঁ—কাঠ মিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি, অতিরিক্ত নোঙর, বড়সড় একটা দাঁড়ি-পাল্লা…।'

'দাঁড়িপাল্লা!'

'হ্যাঁ—হুক থেকে ঝুলছে একটা ব্যালেন্স স্কেল।'

'বুঝেছি।'

'আরো রয়েছে কয়েক ধরনের কুঠার, লিড ওয়েট, মাছ ধরার জাল। দাঁড়াও, আগে ফটো তোলা হোক।'

কাঠের মইটা ওপর দিকে উঠে গেছে মেইন ডেকের ফোকর গলে। ফটো তোলা শেষ হতে মইটা পরীক্ষা করলো রানা। কাঠে এখনো পচন ধরেনি দেখে অবাক হলো। ধাপ বেয়ে ধীরে ধীরে উঠলো ও।

ফোকরের ভেতর গলিয়ে দিলো মাথাটা। একটা বিধ্বস্ত ডেক কেবিন দেখতে পেলো। বরফের চাপে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।

নিচে নেমে এসে আরেকটা মই ব্যবহার করলো রানা। এটা উঠে গেছে কার্গো হোল্ডে। ওপরে উঠে এসে স্টারবোর্ড থেকে পোর্টের দিকে ডাইভ লাইটের আলো ফেললো ও। বিস্ময়ের ধাক্কায় পাথর হয়ে গেল সাথে সাথে।

জায়গাটা শুধু কার্গো হোল্ড নয়।

এটা একটা লুকানোর জায়গাও বটে।

চরম ঠাণ্ডা শুকনো কার্গো হোল্ডটাকে ক্রাইয়োজেনিক চেম্বারে পরিণত করেছে। জাহাজের বো-র দিকে মাঝখানে একটা লোহার তৈরি স্টোভ নিয়ে গোল হয়ে বসে আছে ওরা। আটজন মানুষ, প্রায় সম্পূর্ণ সংরক্ষিত অবস্থায়। বরফের আবরণ প্রত্যেককে ঢেকে রেখেছে, দেখে রানার মনে হলো, সবাই ওরা নিজেদেরকে প্লাস্টিক শিট দিয়ে মুড়ে রেখেছে।

মুখের চেহারা শান্ত, যেন শান্তিতে সময় কাটছিল। চোখ খোলা সবার, খোলা অবস্থায় স্থির হয়ে গেছে, যেন কোনো দোকানের জানালায় সাজানো ম্যানিকিন। সবাই বসে আছে, তবে প্রত্যেকের ভঙ্গি আলাদা। চারজন একটা টেবিলে বসে খাচ্ছে, এক হাতে প্লেট, আরেক হাতে ধরা কাপ মুখের কাছে তোলা। দু'জন খোলের গায়ে হেলান দিয়ে পাশাপাশি বসে আছে, গুটানো কাগজ বা পার্চমেন্ট খুলে কি যেন পড়ছে বলে মনে হলো। একজন একটা কাঠের তৈরি বাক্সের ওপর ঝুঁকে রয়েছে, শেষ ব্যক্তি নিচের দিকে ঝুঁকে কি যেন লিখছে।

রানার মনে হলো, যেন একটা টাইম মেশিনে ঢুকেছে ও। ভাবতে গিয়ে প্রচণ্ড বিস্ময়বোধ করলো, চোখের সামনে যাদের দেখতে পাচ্ছে

তারা এক সময় রোম সাম্রাজ্যের নাগরিক ছিলো। প্রাচীন নাবিক ওরা, যারা এমন সব বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়েছিল, পরবর্তী সভ্যতার আবর্জনার নিচে সে-সব বন্দর চাপা পড়ে গেছে, অতীত থেকে উঠে আসা ষাটটি প্রজন্ম আগেকার পূর্বপুরুষ।

আর্কটিক আবহাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি ছিলো না ওদের। কারো পরনে ভারি পোশাক নেই। কর্কশ কম্বল জড়িয়েছে সবাই গায়ে। রানার তুলনায় ওদেরকে ছোটোখাটো লাগলো। ছোট্ট একটা মানুষের টাক রয়েছে, শুধু মাথার দু'পাশে সাদা কিছু চুল। আরেকজনের মাথায় ঝাঁকড়া লাল চুল, মুখে চাপ দাড়ি। দাড়ি প্রায় সবারই কামানো। বরফের আবরণ থাকলেও, বয়স আন্দাজ করতে পারলো রানা। সবচেয়ে যে ছোটো তার বয়স আঠারোর মতো হবে, সবচেয়ে বয়স্ক লোকটা চল্লিশের ঘরে।

লিখতে বসে যে লোকটা মারা গেছে তার মাথায় চামড়ার একটা ক্যাপ রয়েছে, পায়ে লম্বা তুলো জড়ানো। একটা ফোল্ডিং টেবিলের ওপর ঝুঁকে রয়েছে সে, অমসৃণ টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে কয়েকটা মোম ট্যাবলেট। লোকটার ডান হাতে এখনো ধরা রয়েছে সূচীমুখ শলাকা অর্থাৎ কলম।

নাবিকদের দেখে মনে হলো না খাদ্যের অভাবে বা ঠাণ্ডায় ধীরে ধীরে মারা গেছে। মৃত্যু আসে হঠাৎ করে, অপ্রত্যাশিতভাবে।

কারণটা আন্দাজ করলো রানা। ঠাণ্ডা ঠেকাবার জন্যে সবগুলো হ্যাচ কভার নিশ্ছিদ্রভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। ভেন্টিলেশন-এর জন্যে একমাত্র যে হ্যাচটা খোলা ছিলো সেটা বরফ জমে বন্ধ হয়ে যায়। শেষবার রান্না করা খাবারটা এখনো স্টোভের ওপর পাত্রে রয়েছে। উত্তাপ বা ধোঁয়ার বাইরে বেরিয়ে যাবার কোনো পথ ছিলো না।

মারাত্মক কার্বন মনোক্সাইড জমা হতে থাকে বন্ধ কার্গো হোল্ডের ভেতর। কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই অজ্ঞান হয়ে পড়ে ওরা। যে যেখানে বসেছিল সেখানে বসেই মারা গেছে।

মোম ট্যাবলেটগুলো বরফের আবরণ ভেঙে টেবিল থেকে তুললো রানা। বরফ খুব সাবধানে ভাঙলো ও, যেন ভয় করছে লোকগুলো জেগে উঠবে। ড্রাই স্যুটের একটা পকেট খুলে ট্যাবলেটগুলো রেখে দিলো। ও যে কাঁপছে, রোমকূপ দিয়ে বেরিয়ে আসছে ঘাম, এসব খেয়ালই করলো না। করুণ দৃশ্যটা এমনভাবে টেনে রেখেছে ওকে, বারবার ডাকাডাকি করেও ওর কোনো সাড়া পেলো না নেলসন।

'এখনো তুমি আমাদের সাথে আছো?' পাঁচবারের বার জিজ্ঞেস করলো সে। 'জবাব দাও, ধেত্তেরি ছাই!'

দুর্বোধ্য কয়েকটা শব্দ অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলো রানা।

'আবার বলো। তোমার বিপদ হয়েছে?'

নেলসনের উদ্বেগে ব্যাকুল গলা শুনে অবশেষে ধ্যান ভাঙলো রানার। 'ডঃ মোরেলকে জানাও,' বললো ও। 'জাহাজের অ্যান্টিক মূল্য নির্ভেজাল। আর, ওঁদের তুমি এ-কথাও বলতে পারো যে ওঁরা যদি সাক্ষী চান, নাবিকদের হাজির করতে রাজি আছি আমি।'

বারো

মার্কিন সরকারের পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী বিল হ্যারিংটন একটা টেলিফোন পেলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট জিমি উইলফোর্স ফোন করেছেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর হ্যারিংটন বললেন, 'কমপিউটারাইজড স্ক্র্যাম্বলে কথা বলছি আমরা, জিমি। নিশ্চিন্ত মনে জানাও আমাকে।'

'উম্মে সালিহা। তাঁর একটা ডুপ্লিকেট পাওয়া গেছে।'

'তারমানে ওয়াল্টার রীড হাসপাতালে তাঁর মতো দেখতে অন্য একটা মেয়ে?'

'হ্যাঁ, কড়া পুলিশী প্রহরায়।'

'কে মেয়েটা, মানে উম্মে সালিহার ভূমিকায়?'

'অভিনেত্রী স্যালি জেনিসন, আবার কে। তার নাকে নাক না ঠেকালে তুমি বুঝতেই পারবে না যে সে আসল উম্মে সালিহা নয়, এতোই চমৎকার হয়েছে তার মেকআপ। ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে ডাক্তারদের দিয়ে একটা প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে, তাঁরা উম্মে সালিহার আশংকাজনক অবস্থা ব্যাখ্যা

করবেন।'

'আর উম্মে সালিহা? তিনি কি করছেন?' জানতে চাইলেন আণ্ডার সেক্রেটারী।

'গ্রীনল্যাণ্ড থেকে এয়ারফোর্সের যে প্লেনে ফিরে এসেছেন সেটা থেকে নামেননি তিনি,' প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী বললেন। 'আবার ফুয়েল নিয়ে ডেনভারের কাছে বাকলি ফিল্ডে চলে গেছে প্লেনটা। ওখান থেকে উম্মে সালিহাকে নিয়ে যাওয়া হবে ব্রেকেন-রিজ-এ।'

'কলোরাডো-র স্কি রিসর্ট-এ?'

'হ্যাঁ, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের বাড়িতে। বাড়িটা শহরের বাইরে, বেশিরভাগ সময় খালিই পড়ে থাকে। উম্মে সালিহা দু'এক জায়গায় সামান্য চোট পেয়েছেন, এখন অবশ্য ভালোই আছেন।'

'আমরা তাঁর দায়িত্ব নেয়ায় ভদ্রমহিলার প্রতিক্রিয়া?'

'বলা হয়েছে, আমরা শুধু নিরাপদে তাঁকে জাতিসংঘে পৌঁছে দিতে চাই, অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সেখানে তিনি ভাষণ দেবেন। না, আমাদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেননি। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে আভাস পাওয়া গেছে, ভাষণে মোস্তফা কামালের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য থাকবে। সে টেরোরিস্ট, তার মৌলবাদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক বা সঙ্গতি নেই, ইত্যাদি বিষয়ে প্রমাণ দেবেন। কিন্তু সমস্যা হলো, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পাঁচদিন পর। উম্মে সালিহাকে থামাবার জন্যে এই পাঁচদিন চেষ্টার কোনো ত্রুটি করবে না মোস্তফা কামাল।'

'মঞ্চে পা রাখার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কোথায় আছেন তিনি তা যেন কাকপক্ষীও টের না পায়।'

'মিশর সরকারের তরফ থেকে তোমার দপ্তর কিছু জানতে পারলো?' জিমি উইলফোর্স প্রশ্ন করলেন।

'উম্মে সালিহার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইসমাইল আমাদেরকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন,' জানালেন বিল হ্যারিংটন। 'দেশের অর্থনীতি নতুন করে ঢেলে সাজানোর কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত তিনি, বলা যায় চব্বিশ ঘণ্টা মীটিঙের মধ্যে আছেন। ভদ্রলোক আন্তরিক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আরেকটা কঠিন কাজ সারতে হচ্ছে তাঁকে। বিশ্বাস করতে পারেন এমন সব সামরিক অফিসারকে দায়িত্ব ভাগ করে দিচ্ছেন, এখন থেকে তাঁরাই সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে থাকবেন। প্রেসিডেন্টও বিশ্বাস করেন, দেশ জুড়ে উম্মে সালিহার জনপ্রিয়তাই ঠেকিয়ে রেখেছে মোস্তফা কামালকে, তাড়াহুড়ো করে সরকারকে উৎখাত করার সাহস পাচ্ছে না সে। ভাষণ দেয়ার আগেই যদি মোস্তফা কামালের পাঠানো অ্যাসাসিনের হাতে উম্মে সালিহা মারা যান, তাহলে ধরে নিতে পারো, মিশরের শাসক হিসেবে আমরা এক বদ্ধ উন্মাদকে দেখতে পাবো।'

'শান্ত হও,' আশ্বাস দিলেন জিমি উইলফোর্স। 'উম্মে সালিহা কোথায় আছেন, মোস্তফা কামাল বা তার পাঠানো খুনীরা জানতেই পারবে না।'

'প্রহরার ব্যবস্থা যথেষ্ট···।'

'সিক্রেট সার্ভিসের একদল এজেন্ট পাহারা দিচ্ছে, প্রেসিডেন্ট নিজে খোঁজ-খবর রাখছেন।'

বিল হ্যারিংটন বললেন, 'আরো নিশ্চিন্ত হতে পারতাম কাজটায় যদি এফ. বি. আই. সাহায্য করতো।'

'হোয়াইট হাউসের সিকিউরিটি স্টাফেরা সব দিক ভেবেই এই

ব্যবস্থা করেছে, বিল। তাছাড়া, প্রেসিডেন্ট চাইছেন না পাঁচমিশালী একটা আয়োজন করা হোক।'

'দেখো, জিমি, সাবধান—ব্যাপারটা লেজেগোবরে করে ফেলো না।'

'আরে, চিন্তা করো না তো! কথা দিলাম, উম্মে সালিহা নির্দিষ্ট দিনে সম্পূর্ণ বহাল তবিয়তে জাতিসংঘ সদর দফতরে পৌঁছুবেন।'

'সত্যি যেন পৌঁছান।'

'সূর্য যদি পশ্চিমে ওঠে, তবুও পৌঁছুবেন।'

ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলেন বিল হ্যারিংটন। কোনো কারণ নেই, তবু অস্বস্তিবোধ করছেন তিনি। মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, খারাপ কিছু যেন না ঘটে। তারপর ভাবলেন, হোয়াইট হাউস যা করছে নির্ঘাৎ সব দিক ভেবে-চিন্তেই করছে।

রাস্তার ওপারে একটা ফোর্ড কোম্পানীর ভ্যানে তিনজন লোক বসে আছে। ভ্যানের গায়ে লেখা—ক্যাপিটল প্লামবিং, টোয়েনটি ফোর আওয়ার ইমার্জেন্সী সার্ভিস। ভেতরে অত্যাধুনিক আড়িপাতা যন্ত্র গিজগিজ করছে।

তিনজনই ওরা সাবেক কাউণ্টার এসপিওনাজ এজেন্ট, চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে চুক্তিভিত্তিক স্বাধীন ব্যবসায় নেমেছে। এ-ধরনের এজে-ণ্টরা সাধারণত সরকারী ছাড়া অন্য কোনো কাজ গ্রহণ করে না। তবে এদের কথা আলাদা। এরা তিনজন অল্প দিনে অনেক টাকার মালিক হতে চায়। নীতি, দেশপ্রেম, বিবেক ইত্যাদি বিসর্জন দিয়েছে তারা। যে বেশি টাকা দেয় তার কাছেই এরা ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশন বিক্রি করে।

বিল হ্যারিংটনের জানালার রঙিন কাঁচের দিকে বিনোকিউলার তাক

করে তাদের একজন বললো, 'লিভিং রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন উনি।'

দ্বিতীয় লোকটা মোটাসোটা, কানে এয়ারফোন লাগিয়ে ঝুঁকে রয়েছে রেকর্ডিং মেশিনের দিকে, বললো, 'কথাবার্তা সব থেমে গেছে।'

তৃতীয় লোকটার বিশাল গোঁফ, সে একটা লেযার প্যারাবোলিক অপারেট করছে। জিনিসটা স্পর্শকাতর মাইক্রোফোন, ঘরের ভেতরের কণ্ঠস্বর রিসিভ করে জানালার কাঁচের কম্পন থেকে, তারপর সেটাকে ফাইবার অপটিক্স-এর মাধ্যমে ম্যাগনিফাই করে সাউণ্ড চ্যানেলে পাঠিয়ে দেয়।

'ইণ্টারেস্টিং কিছু?' প্রথমজন জানতে চাইলো।

মোটাসোটা দ্বিতীয়জন এয়ারফোন নামিয়ে কপালের ঘাম মুছলো: 'একটা ফিশিং বোট কেনার টাকা বোধহয় এবার পেয়ে গেলাম আমরা।'

'হুররে!'

গোঁফে তা দিয়ে তৃতীয় লোকটা জানতে চাইলো, 'তথ্যটার সম্ভাব্য ক্রেতা কে হতে পারে?'

'এক উন্মাদ ধনী, মোস্তফা কামালকে সাহায্য করতে চায়।'

হোয়াইট হাউস। মিশরের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সি. আই. এ. ডিরেক্টর ওয়ারেন হোল্ডিঙের সাথে আলোচনা করলেন প্রেসিডেণ্ট। হোসেন ইসমাইল এখনো ক্ষমতায় টিকে আছেন শুধুমাত্র এয়ারফোর্সের সমর্থন নিয়ে। ব্যাপক রদবদল সত্ত্বেও সেনাবাহিনীতে তাঁর ক্ষমতা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সামরিক নেতৃবৃন্দ যে-কোনো মুহূর্তে মোস্তফা কামালের পক্ষ অবলম্বন করতে পারেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কায়সার আজিজ পোর্ট সাঈদ-এ গোপনে মোস্তফা কামালের

সাথে বৈঠক করেছেন। সি. আই. এ. এজেন্টরা জানতে পেরেছে, ক্ষমতাশালী একটা পদ না পেলে মোস্তফা কামালকে সমর্থন দিতে রাজি হননি কায়সার আজিজ। মৌলবাদী মোল্লাদের অধীনে থাকার কোনো ইচ্ছে তাঁর নেই।

বৈঠকে কোনো সমঝোতা হয়নি, কারণ কাউকে ক্ষমতার ভাগ দেয়ার কোনো ইচ্ছে মোস্তফা কামালের নেই। তার নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করছেন কায়সার আজিজ। তিনি জানেন না, তবে সি. আই. এ. জানে যে কায়সার আজিজের প্রাইভেট প্লেনে বোমা ফিট করার একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল। ষড়যন্ত্রটা ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে। কায়সার আজিজকে ব্যাপারটা জানানোর জন্যে প্রেসিডেন্টের অনুমতি প্রার্থনা করলেন সি. আই. এ. ডিরেক্টর।

প্রেসিডেন্টের প্রশ্নের উত্তরে ওয়ারেন হোল্ডিং জানালেন, জাতিসংঘ প্লেন বিধ্বস্ত হওয়ার পিছনে মোস্তফা কামালের হাত থাকলেও তা প্রমাণ করা যাচ্ছে না। জানা গেছে, প্লেনটাকে গ্রীনল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দায়ী হলো ভুয়া পাইলট, মোহাম্মদ আল দাউদ। কিন্তু আরোহীদের খাবারে বিষ মেশানোর কাজটা তার কীর্তি নয়। এই কাজের জন্যে জিন ডিলাফর্জ নামে একজন মেক্সিকান প্রতিনিধিকে সন্দেহ করা হচ্ছে, প্লেন বিধ্বস্ত হবার সময় মারা গেছে সে। উম্মে সালিহা বাদে সে-ই একমাত্র আরোহী, যে প্লেনে ওঠার পর কোনো খাদ্য গ্রহণ করেনি। ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্ট যে মেয়েটা বেঁচে গেছে তার ভাষ্য অনুসারে, জিন ডিলাফর্জকে খাবার সাধা হয়েছিল, কিন্তু পেট ভালো নেই বলে এড়িয়ে যায় সে।

এ-প্রসঙ্গে ম্যানুয়েল রিভেরার কথা উঠলো। প্লেন বিধ্বস্ত হওয়ার সাথে অথবা আরোহীদের বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার সাথে মেক্সিকোর

টেরোরিস্টরা অবশ্যই জড়িত থাকতে পারে। পেড্রো ফেডানোকে তারা যদি খুন করতে পারে, জাতিসংঘ প্রতিনিধি দল ও মহাসচিবককে খুন করতে চাওয়ার মধ্যে অসম্ভব কিছু নেই। ধরে নেয়া যায়, প্লেনে আল দাউদের ব্যাক-আপ টিম হিসেবে কাজ করছিল জিন ডিলাফর্জ।

ওয়ারেন হোল্ডিং প্রেসিডেন্টকে জানালেন, তিনি আদেশ করামাত্র সি. আই. এ. তার সর্বশক্তি দিয়ে ম্যানুয়েল রিভেরাকে নিশ্চিহ্ন করার পদক্ষেপ নেবে।

প্রেসিডেন্ট বললেন, ঝুঁকিটা মারাত্মক। অতীতে এ-ধরনের খুন-খারাবির সাথে জড়িয়ে সি. আই. এ. নিজের ভাবমূর্তি যথেষ্ট কলংকিত করেছে। আরো সময় নিয়ে পরিস্থিতি কোন্ দিকে গড়ায় দেখার পক্ষপাতি তিনি।

ওয়ারেন হোল্ডিং অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, কিন্তু যদি মেক্সিকোর বৈধ সরকারকে উৎখাত করে রিভেরা ক্ষমতা দখল করে, তখন কি হবে? আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা কব্জা করার হুমকি দিয়েছে সে। মেক্সিকানরা যদি মিছিল করে সীমান্ত পেরোতে শুরু করে?

প্রেসিডেন্ট মৃদু গলায়, শান্তভাবে জানালেন, 'আমেরিকার মাটিতে কেউ অনুপ্রবেশ করলে তাকে গুলি করার নির্দেশ দেবো আমি। বিদেশী আগ্রাসন আমি সহ্য করবো না।'

আলোচনা আরেকদিকে ঘুরে গেল। আইসব্রেকার শারলক আপাততঃ রুশ সাবমেরিন উদ্ধারের কোনো চেষ্টা করছে না। নুমা এই মুহূর্তে প্রাচীন একটা রোমান জাহাজ উদ্ধারে ব্যস্ত। প্রসঙ্গক্রমে হাসলেন ওয়ারেন হোল্ডিং, বললেন তাদের একজন পুরনো বন্ধু এই মুহূর্তে আমেরিকায় ছুটি কাটাচ্ছেন। ঘটনাচক্রে তাঁর এক সাগরেদ রয়েছে শারলকে, নুমার অনারারী অফিসার হিসেবে।

মুচকি হেসে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'মায়ের কাছে মামা বাড়ির গল্পো করছো তুমি। রাহাতের সাথে এই কামরায় আজ সকালে আমার কথা হয়েছে। ভালো কথা, রোমান জাহাজটা থেকে কি পাবো বলে আশা করছি আমরা? প্রচুর স্বর্ণ মুদ্রা? অমূল্য শিল্পকর্ম?'

'অতি পুরনো কিছু থেকে সবাই তো আমরা গুপ্তধন আশা করি। দেখা যাক। তবে একটা ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, শুধু জাহাজ-টার অ্যান্টিক মূল্য কয়েক মিলিয়ন ডলার হতে পারে। রোমানরা যে এতো দক্ষিণে এসেছিল, এই তথ্য সত্যি হলে ইতিহাস নতুন করে লিখতে হতে পারে।'

দু'জনের কেউই জানেন না, বিষয়টা শুধু ইতিহাস আর গুপ্তধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ওদের সবার ঘুম হারাম করে দেবে।

তেরো

আর্কিওলজিস্টরা নির্দেশ আর পরামর্শ দিলো, আইসব্রেকার শারলকের ক্রুরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বরফ ভেঙে খাঁড়ির তলায় পড়ে থাকা প্রাচীন জাহাজ সেরাপিসের টপ ডেক পর্যন্ত পৌঁছুলো। ধীরে ধীরে

বরফ-মুক্ত হলো স্টার্নপোস্ট থেকে বো পর্যন্ত সবটুকু।

খাঁড়ির সবাই দেখার জন্যে ভিড় করেছে এক জায়গায়, কৌতূহল আর বিস্ময়ে প্রত্যেকে সম্মোহিত। শুধু রানা আর জেনিথকে কোথাও দেখা গেল না।

মোম ট্যাবলেট পরীক্ষার জন্যে শারলকে রয়ে গেছে ওরা।

প্রাচীন জাহাজটাকে সম্পূর্ণ বরফ-মুক্ত করার পর কার্গো হ্যাচ খুলে নিচে নামলো বেন নেলসন, মরিস উইনফিল্ড আর জোসেফ পেন-বার্নার। বরফের আবরণসহ মূর্তিগুলো ওদের দিকে তাকিয়ে আছে, মনে হলো গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিলে এখুনি সবাই জ্যান্ত হয়ে উঠবে। বো-র দিকে, এক কোণে, আরো দুটো মূর্তি রয়েছে, রানার চোখ এড়িয়ে গেছে ওগুলো। দুটোর মধ্যে একটা কুকুর, অপরটি ছোট্ট এক মেয়ে।

শারলকের ডেকে একটা নুমা হেলিকপ্টার নামলো। সবুজ সোয়েটার পরা দীর্ঘদেহী এক লোক নেমে এলেন প্যাসেঞ্জার কেবিন থেকে। চারদিকে তাকিয়ে রানার ওপর স্থির হলো ভদ্রলোকের দৃষ্টি, রানা হাত নাড়তে মৃদু হাসলেন তিনি। এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'ডঃ ওয়ার্ড?'

'আপনি মাসুদ রানা?'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বললো, 'ব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে আসতে পেরেছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ, ডঃ ওয়ার্ড।'

'ঠাট্টা করছেন! আপনার আমন্ত্রণ পেয়ে ক্যাঙ্গারুর মতো লাফিয়ে উঠেছিলাম, তা জানেন? আপনি যা আবিষ্কার করেছেন, তার সাথে জড়াবার জন্যে যে-কোনো আর্কিওলজিস্ট তার একটা চোখ হারাতেও

পিছপা হবে না। আমার তর সইছে না, কখন দেখাবেন?'

'দশ মিনিটের মধ্যে অন্ধকার হয়ে যাবে। আপনি বরং কাল সকালে দেখতে চাইলে ভালো হয়। তার আগে ডঃ মোরেল ব্রিফ করবেন আপনাকে। মেইন ডেক থেকে যেগুলো উদ্ধার করা হয়েছে, সে-সব আজই দেখানো যেতে পারে।'

ডঃ পিটার ওয়ার্ড আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মেরিন আর্কিওলজিস্ট, রানার আমন্ত্রণ পেয়ে এথেন্স থেকে রেকিয়াভিক-এ চলে আসেন প্লেনে চড়ে, সেখান থেকে বেন নেলসন তাঁকে হেলিকপ্টারে তুলে নেয়। হ্যাচ গলে শারলকের পেটে নেমে এলো ওরা। 'খোলের ভেতর কি কি পেয়েছেন, বলবেন, মিঃ রানা?'

'ক্রুদের দেহ ছাড়া কার্গো হোল্ডে আর কিছু পাইনি।'

'কিন্তু মেসেজে আপনি জানিয়েছেন, জাহাজটা প্রায় অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে।'

'হ্যাঁ, তা সত্যি। কিছু কিছু মেরামতের কাজ শেষ করতে পারলে, বৈঠা ঠেলে ওটাকে নিউ ইয়র্ক বন্দরে নিয়ে যেতে পারবেন।'

'ডঃ মোরেল কি ওটার সময়কাল নির্ধারণ করতে পেরেছেন?'

'মুদ্রাগুলো তিনশো নব্বই খ্রিস্টাব্দের। এমনকি জাহাজটার নামও জানি আমরা। সেরাপিস। স্টার্নপোস্টে গ্রীক ভাষায় খোদাই করা আছে।'

'সম্পূর্ণ সংরক্ষিত চতুর্থ শতাব্দীর বাইজেন্টাইন বাণিজ্য জাহাজ,' বিড়বিড় করে বললেন ডঃ ওয়ার্ড। 'যুগান্তকারী আবিষ্কার। হ্যাঁ, যুগান্তকারী। ছুঁয়ে দেখার জন্যে হাত দুটো নিশপিশ করছে আমার।'

অফিসার্স ওয়ার্ডরুমে চলে এলো ওরা। টেবিলে বসে মোম ট্যাবলেটে পাওয়া অক্ষরগুলো একটা কাগজে কপি করছে জেনিথ কর্নে-

লিয়াস। ওদের পরিচয় করিয়ে দিলো রানা। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো জেনিথ, হাতটা বাড়িয়ে দিলো ডঃ ওয়ার্ডের দিকে। বললো; 'দিস ইজ অ্যান অনার, ডঃ ওয়ার্ড। আমি মাটিতে কাজ করলেও, পানির নিচে আপনার কৃতিত্ব সম্পর্কে সব খবরই আমার জানা আছে, আমি আসলে আপনার একজন ভক্ত।'

'সম্মানটুকু আমার,' বিনীত সুরে বললেন ডঃ ওয়ার্ড।

'কি খাবেন বলুন,' জিজ্ঞেস করলো জেনিথ।

'এক গ্যালন গরম চকলেট আর পাঁচ কেজি সুপ হলেই চলবে।'

হেসে ফেলে স্টুয়ার্ডকে ডাকলো জেনিথ।

'আমরা একটা ধাঁধায় পড়েছি,' ডঃ ওয়ার্ডকে বললো রানা। 'আপনার ল্যাটিন কেমন?'

'চালিয়ে নিই। কিন্তু আপনি বললেন, জাহাজটা গ্রীক।'

'গ্রীকই,' রানার বদলে জবাব দিলো জেনিথ। 'তবে ক্যাপটেন মোম ট্যাবলেটে তাঁর লগ লিখেছেন ল্যাটিনে। ছ'টা ট্যাবলেটে অক্ষর পেয়েছি। সাত নম্বরটায় একটা ম্যাপ। জাহাজের ভেতর প্রথমবার ঢুকে এগুলো উদ্ধার করেছে রানা। অক্ষরগুলো কাগজে টুকেছি আমি।'

একটা চেয়ারে বসে একটা মোম ট্যাবলেট তুলে নিলেন ডঃ ওয়ার্ড। নেড়েচেড়ে দেখে রেখে দিলেন। তারপর চোখ বুলালেন জেনিথের লেখা কাগজটায়।

গরম চকলেট আর সুপ দিয়ে গেল স্টুয়ার্ড। অনুবাদ করায় এতোই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ডঃ ওয়ার্ড, যে তাঁর আর খিদে থাকলো না। যন্ত্রচালিত রোবটের মতো কাপটা মুখে তুললেন, চোখ স্থির হয়ে আছে হাতে লেখা কাগজটার ওপর। দশ মিনিট পর নিঃশব্দে চেয়ার ছাড়লেন তিনি, পায়চারি শুরু করলেন, বিড়বিড় করে ল্যাটিন শব্দ আও-

ড়াচ্ছেন, বিস্মিত দর্শকদের উপস্থিতি সম্পর্কে কোনো ধারণাই যেন নেই।

চুপচাপ বসে থাকলো রানা আর জেনিথ। এক চুল নড়লো না কেউ, শুধু চোখ দুটো অনুসরণ করলো ডঃ ওয়ার্ডকে। টেবিলে ফিরে এসে কাঁপা হাতে কাগজগুলো আবার পরীক্ষা করলেন ডঃ ওয়ার্ড। প্রত্যাশায় আর উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠলো পরিবেশ। আরো প্রায় পাঁচ মিনিট পর কাগজগুলো টেবিলে রেখে ধীরে ধীরে দেয়ালের দিকে তাকালেন ডঃ ওয়ার্ড, তাঁর চোখে আচ্ছন্ন দৃষ্টি।

'কি ব্যাপার, ডঃ ওয়ার্ড ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'কি ?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো জেনিথ। 'কি পেয়েছেন আপনি ?'

ডঃ ওয়ার্ডের গলা কোনো রকমে শুনতে পেলো ওরা। মাথা নিচু করলেন তিনি, ফিসফিস করে বললেন, 'সম্ভব। হ্যাঁ, সম্ভব। আপনারা সম্ভবত দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আর শিল্পকর্মের সংগ্রহ আবিষ্কার করেছেন...।'

'আরেকটু খুলে বলবেন, প্লিজ ?' শুকনো গলায় তাগাদা দিলো রানা।

বারকয়েক ঘন ঘন নেড়ে মাথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করলেন ডঃ ওয়ার্ড। 'গল্পটা...গল্প না বলে রূপকথা বললেই যেন বেশি মানায়। গোটা ব্যাপারটা এমনই অবিশ্বাস্য আর অদ্ভুত অথচ বাস্তব সত্য যে আমার ঠিক হজম হচ্ছে না।'

জেনিথ জানতে চাইলো, 'ট্যাবলেটগুলো কি বলছে, গ্রীক-রোমান একটা জাহাজ বাড়ির পানি ছেড়ে এতো দূরে কেন চলে এলো ?'

'গ্রীক-রোমান নয়, বাইজেন্টাইন,' ডঃ ওয়ার্ড সংশোধন করলেন। 'সেরাপিস যখন নোঙর তুলে রওনা হয়, তার আগেই সাম্রাজ্যের সিং-

হাসন কনস্ট্যানটাইন দ্য গ্রেটের দ্বারা রোম থেকে বসফরাসে স্থানান্তর করা হয়ে গেছে—বসফরাস, এক সময় যেখানে বাইজেন্টিয়াম শহর দাঁড়িয়ে ছিলো।'

'পরে যেটা কনস্টানটিনোপল হয়,' বললো রানা।

'তারপর ইস্তাম্বুল,' জেনিথের দিকে ফিরে বললেন ডঃ ওয়ার্ড। 'সরাসরি উত্তর দিচ্ছি না বলে দুঃখিত। তবে হ্যাঁ, ট্যাবলেটগুলো বলছে বটে কেন ও কিভাবে জাহাজটা এদিকে আসে। পুরোটা কাহিনী ব্যাখ্যা করতে হলে আগে আমাদের মঞ্চটা সাজাতে হবে, সেই মঞ্চে যে নাটকটা আমরা দেখবো তার সূচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব তিনশো তেইশ সাল, যে-বছর আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট ব্যাবিলনে মারা গেলেন। তাঁর সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিলেন জেনারেলরা। তাঁদের একজন, টলেমি, সাম্রাজ্য থেকে কেটে নিলেন মিশরকে, হলেন রাজা। তিনি আলেকজাণ্ডারের লাশও দখল করতে সমর্থ হলেন, সোনা আর স্ফটিক দিয়ে তৈরি কফিনে মুড়ে রাখলেন সেটা। পরে লাশটা তিনি একটা মন্দির তৈরি করে সমাধিস্থ করলেন, মন্দিরের চারদিকে গড়ে তুললেন আশ্চর্য সুন্দর একটা শহর, সে সৌন্দর্য এথেন্সকেও হার মানিয়ে দিলো। টলেমি শহরটার নাম রাখলেন আলেকজান্দ্রিয়া।'

'কিন্তু এ-সবের সাথে সেরাপিসের কি সম্পর্ক?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো জেনিথ।

'প্লিজ, আমাকে শেষ করতে দিন,' আবেদনের সুরে বললেন ডঃ ওয়ার্ড। 'ছিটেফোঁটা সংগ্রহ থেকে বিশাল একটা মিউজিয়াম আর লাইব্রেরী গড়ে তুললেন টলেমি। সংগ্রহের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে উঠলো। তাঁর উত্তরসুরিরা, ক্লিওপেট্রাসহ বাকি সবাই, এই মিউজিয়াম আর লাইব্রেরীতে নিজেদের সংগ্রহ জমা করে-

ছেন। মিউজিয়ামটা হয়ে উঠলো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালা। শুধু শিল্পকর্ম নয়, তৎকালীন ও অতীত যুগের বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কারিগরি বিদ্যা ইত্যাদির সমস্ত নিদর্শন এই লাইব্রেরী ও মিউজিয়ামে ঠাঁই পেলো। জ্ঞানের এই বিশাল ভাণ্ডার কিন্তু মাত্র তিন শো একানব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকলো।

'সে-বছর, সম্রাট থিয়োডোসিয়াস ও আলেকজান্দ্রিয়ার গির্জাপতি থিয়োফিলস সিদ্ধান্ত নিলেন, সদ্য প্রবর্তিত খ্রিস্টান নীতি ও আদর্শের সাথে মেলে না এমন সমস্ত শিল্পকর্ম ও সাহিত্য পৌত্তলিকতা দোষে দুষ্ট বলে মনে করতে হবে, এবং তা অবশ্যই ধ্বংস করে ফেলতে হবে। লাইব্রেরী ও মিউজিয়ামে ছিলো পাথর ও ধাতব মূর্তি, মার্বেল ও ব্রোঞ্জের তৈরি শিল্পকর্ম, সোনা আর আইভরির তৈরি খেলনা, অবিশ্বাস্য নৈপুণ্যের সাথে তৈরি পেইন্টিং, ভেড়ার চামড়া বা প্যাপিরাস কাগজে লেখা অসংখ্য বই, বহু জ্ঞানী-গুণীর সংরক্ষিত লাশ, এমন কি সম্রাট আলেকজাণ্ডারের লাশও ছিলো—ঠিক হলো, সব ধ্বংস করে ফেলা হবে। হয় ভেঙেচুরে ধুলোর সাথে মিলিয়ে ফেলা হবে নয়তো পুড়িয়ে ছাই করা হবে।'

'ঠিক কি ধরনের হবে সংখ্যায়?'

'শুধু বই ছিলো কয়েক লাখ।'

হতাশায় মাথা নাড়লো জেনিথ। 'কী ভয়ানক ক্ষতি!'

'শুধু বাইবেল আর চার্চের যাবতীয় লেখা বাদ দিয়ে,' বলে চললেন ডঃ ওয়ার্ড, 'লাইব্রেরী আর মিউজিয়ামের বাকি সব সংগ্রহ পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়।'

'কয়েক শো বছর ধরে সংগ্রহ করা অসংখ্য মূল্যবান মাস্টারপীস হারিয়ে গেল!'

'হারিয়ে গেল,' সায় দিলেন ডঃ ওয়ার্ড। 'এতোকাল পর্যন্ত ঐতিহাসিকরা সেই বিশ্বাসই পোষণ করে এসেছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে যা পড়লাম তা যদি সত্যি হয়, সংগ্রহের সার অংশটুকু হারিয়ে যায়নি। সে-সব কোথাও লুকানো আছে।'

জেনিথ হতভম্ব। 'আজও সেগুলোর অস্তিত্ব আছে? তারমানে কি পুড়িয়ে ফেলার আগে সেরাপিসে তুলে পাচার করা হয়েছিল?'

'মোম ট্যাবলেটে সে-কথাই লেখা আছে।'

সন্দেহ প্রকাশ করলো রানা, 'সেরাপিস ছোট্ট জাহাজ, সংগ্রহের কতোটুকুই বা আনতে পারে! আপনি যে বিপুল সংখ্যার কথা বলছেন···।'

'প্রাচীন জাহাজ সম্পর্কে আপনার দেখছি ভালোই ধারণা আছে,' রানার দিকে সমীহের দৃষ্টিতে তাকালেন ডঃ ওয়ার্ড।

'জাহাজটা আমি দেখেছি,' বললো রানা। 'আচ্ছা, তার আগে জানা যাক, গ্রীনল্যাণ্ডে কি করতে এলো সেরাপিস।'

জেনিথের কপি করা একটা কাগজ তুলে নিলেন ডঃ ওয়ার্ড। 'চতুর্থ শতাব্দীর ল্যাটিন, আক্ষরিক অনুবাদ করতে গেলে আপনাদের বিরক্তি বাড়ানো হবে, বড় বেশি আড়ষ্ট আর আনুষ্ঠানিক। সহজ ইংরেজিতে ভাষান্তর করার চেষ্টা করছি। প্রথম এন্ট্রি—জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার অনুসারে—তেসরা এপ্রিল, তিন শো একানব্বই খ্রিস্টাব্দ।'

"আমি, কুকিয়াস রাফিনাস, সেরাপিসের ক্যাপটেন, গ্রীক জাহাজ ব্যবসায়ী মিসিয়াস-এর কর্মচারী, আলেকজান্দ্রিয়ার জুলিয়াস ভেনাটরের কার্গো পরিবহনে সম্মত হয়েছি। আলোচ্য সমুদ্র অভিযানটি দীর্ঘ এবং বিপদসংকুল হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, এবং ভেনাটর আমাদের গন্তব্য সম্পর্কে মুখ খুলতে রাজি নয়।

আমার মেয়ে, হাইপাতিয়া, এই অভিযানে আমার সঙ্গিনী হচ্ছে, তার মা দীর্ঘ বিচ্ছেদের কারণে অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে থাকবে। তবে ভেনাটর স্বাভাবিক ভাড়ার চেয়ে বিশ গুণ বেশি দিচ্ছে, ফলে নিসিয়াস লাভবান হবার সাথে সাথে আমি এবং আমার ক্রুরাও লাভবান হবো।

"জাহাজে কার্গো তোলা হলো রাতের অন্ধকারে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। কার্গো তোলার সময় ক্রুসহ আমাকে ডকে থাকার নির্দেশ দেয়া হলো। সেঞ্চুরিয়ান ডোমিটিয়াস সেভেরাসের অধীন চারজন সৈনিককে জাহাজে পাঠানো হলো, তারাও আমাদের সাথে অভিযানে সামিল হলো।

"গোটা ব্যাপারটা আমার একদম পছন্দ হলো না, কিন্তু ভেনাটর ভাড়ার টাকা অগ্রিম দিয়ে ফেলায় চুক্তি বাতিল করা আমার দ্বারা সম্ভব হলো না।"

'বুদ্ধিমান ও সৎ লোক,' বললো রানা। 'কার্গোটা কি, বুঝতে পারেনি কেন?'

'সে প্রসঙ্গে পরে লিখেছে সে। পরের কয়েক লাইন অভিযানের লগ। প্রথম বন্দরে থামার পর থেকে পড়ছি আমি।'

"আমাদের ঈশ্বর সেরাপিসকে ধন্যবাদ। একটানা চোদ্দ দিন নিরাপদে জাহাজ চালিয়ে কারথাগো নোভা-য় পৌঁচেছি আমরা, সেখানে আমরা পাঁচ দিন যাত্রাবিরতি করি, এবং স্বাভাবিক সময় যে পরিমাণ সাপ্লাই তুলি তারচেয়ে পাঁচগুণ বেশি তুলেছি জাহাজে। এখানে আমরা ভেনাটরের আর সব জাহাজের সাথে যোগ দিই। সেগুলো বেশিরভাগ এক একটা দুশো টনী, কোনো কোনোটার বহন ক্ষমতা তিনশো টনের ওপর। ভেনাটরের ফ্ল্যাগ-

শিপসহ সংখ্যায় আমরা ষোলোটা জাহাজ হলাম। ঝাঁকের মধ্যে আমাদের সেরাপিস সবচেয়ে ছোটো।"

'এক ঝাঁক জাহাজ!' চেঁচিয়ে উঠলো জেনিথ, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে তার। 'তারমানে সংগ্রহগুলো সত্যিই রক্ষা পেয়েছে!'

'সবটুকু না হলেও,' সহাস্যে বললেন ডঃ ওয়ার্ড, 'একেবারে কমও নয়। ধরুন, দুটো জাহাজে রসদ আর লোকজন ছিলো। বাকি চোদ্দটা জাহাজ মানে দু'হাজার আটশো টন, লাইব্রেরীর একতৃতীয়াংশ বই আর মিউজিয়ামের বেশ বড় একটা অংশের ঠাঁই হবার জন্যে যথেষ্ট।'

গ্যালি কাউন্টার থেকে কে কফি আনতে যাবে তাই নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল রানা আর জেনিথের মধ্যে। আশপাশে কোথাও কোনো স্টুয়ার্ডকে দেখা যাচ্ছে না, ওরাও কেউ গল্প ছেড়ে উঠতে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত রফা হলো, দু'জনেই যাবে। কফির কাপে চুমুক দিয়ে ডঃ ওয়ার্ড বললেন, 'লগের শেষ দিকে কার্গো সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছে রাফিনাস।' কপি করা দ্বিতীয় কাগজটা তুলে নিলেন তিনি। 'পরের মোম ট্যাবলেটে রাফিনাস ছোটোখাটো মেরামতের কথা লিখেছে, লিখেছে ডক এলাকার গুজব সম্পর্কে, কারথাগো নোভার বর্ণনা দিয়েছে, এখন যেটা স্পেনে, কার্টাজেনা নামে পরিচিত। কিন্তু আশ্চর্য, বন্দর ত্যাগ করার তারিখ সম্পর্কে কিছু লেখেনি সে। আসলে সবার চোখ এড়িয়ে, গোপনে এ-সব লিখতে হয়েছে তাকে। কি লিখেছে পড়ছি।'

"আজ আমরা মহা সাগরের দিকে জাহাজ ছাড়লাম। দ্রুতগতি জাহাজগুলো বাকিগুলোকে টেনে নিয়ে চললো। আর লিখতে পারছি না। সৈনিকরা আমার ওপর নজর রাখছে। ভেনাটরের কঠোর নির্দেশ, অভিযানের কোনো রেকর্ড রাখা যাবে না।"

'নিশ্চয়ই আরো কিছু আছে,' জেদের সুরে বললো জেনিথ। 'আমি জানি, এরপরও কপি করেছি আমি।'

'লিখেছে, হ্যাঁ, তবে নয় মাস পর,' আরেকটা কাগজ তুলে নিয়ে বললেন ডঃ ওয়ার্ড।

"ভীতিকর অভিযান সম্পর্কে এখন আমি স্বাধীনভাবে, নির্ভয়ে লিখতে পারি। ভেনাটর আর তার ক্রীতদাস বাহিনী, সেভেরাস আর তার সৈনিকদল, সবগুলো জাহাজের সব ক'জন ক্রু, অসভ্য-দের হাতে মারা পড়েছে, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে জাহাজগুলো। সেরাপিস বিপদ এড়িয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে, কারণ ভেনাটর সম্পর্কে আমার সন্দেহ আমাকে সতর্ক থাকতে সাহায্য করেছিল।

"জাহাজগুলোর কার্গো কি জিনিস, কোথা থেকে আনা হয়, পাহাড়ের কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে, এখন আমি সব জানি। এ-ধরনের গোপন ব্যাপার মরণশীল মানুষের কাছে গোপন রাখাই শ্রেয় বলে ভেবেছিল ভেনাটর। দেশে ফেরার পথে বিশ্বস্ত কয়েক-জন সৈনিক ও একটা জাহাজের কয়েকজন ক্রুকে বাদ দিয়ে ভেনা-টর আর সেভেরাস বাকি সবাইকে খুন করবে বলে সন্দেহ করে-ছিলাম আমি।

"আমি আমার মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে চিন্তিত হয়ে উঠি। আমার ক্রুদের সশস্ত্র থাকার নির্দেশ দিই, বলি তারা যেন প্রতিটি মুহূর্ত জাহাজের কাছাকাছি থাকে, যাতে বেঈমানীর আভাস পাওয়ামাত্র নোঙর তুলতে পারি। কিন্তু ভেনাটর বেঈ-মানী করার আগেই অসভ্যরা হামলা করে বসলো, কচুকাটা করলো ভেনাটরের ক্রীতদাস আর সেভেরাসের সৈনিকদের।

আমাদের প্রহরীরাও মারা পড়লো যুদ্ধে, তবে বিপদ ঘটার আগেই দড়িদড়া ছিঁড়ে গভীর পানিতে সেরাপিসকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারলাম আমরা। ছুটে এসে পানিতে লাফিয়ে পড়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করলো ভেনাটর। উদ্ধার পাবার জন্যে তার ব্যাকুলতা আমরা লক্ষ্য করলাম। কিন্তু আমার মেয়ে ও ক্রুদের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। জাহাজ ঘুরিয়ে তাকে উদ্ধার করার কোনো চেষ্টাই আমরা করলাম না। স্রোতের বিরুদ্ধে কাজটা করতে গেলে সবাইকে নিয়ে আত্মহত্যা করা হতো।"

'এরপর পিছন দিকে, কার্টাজেনা বন্দর ত্যাগ করার পর কি ঘটেছিল সে-প্রসঙ্গে ফিরে গেছে রাফিনাস।'

"হিসপানিয়া থেকে আমাদের গন্তব্য সেই অদ্ভুত জগতে পৌঁছুতে আটান্ন দিন লাগলো। পিঠে বাতাসের ধাক্কা সহ আবহাওয়া ছিলো অনুকূল। আমাদের ভাগ্যকে এই সহায়তাদানের বিনিময়ে দেবতা সেরাপিস উৎসর্গ দাবি করলেন। অচেনা রোগে মারা গেল আমাদের দু'জন ক্রু।

"প্রথমে আমরা বড় একটা দ্বীপে পা ফেললাম, সেখানকার অসভ্যরা সেদিয়ানদের মতো দেখতে, তবে গায়ের রঙ আরো অনেক কালো। তারা আমাদের সাথে বন্ধুর মতো ব্যবহার করলো, সাহায্য করলো জাহাজ মেরামতের কাজে, রসদ সংগ্রহেও সহযোগিতা করলো।

"আরো দ্বীপ দেখলাম আমরা। তবে ফ্ল্যাগশিপ থামলো না। একমাত্র ভেনাটর জানে জাহাজগুলো কোথায় যাচ্ছে। অবশেষে আমরা জনমানবশূন্য একটা সৈকত দেখতে পেলাম, জাহাজ নিয়ে

পৌঁছুলাম একটা নদীর চওড়া মুখে। আমাদের অনুকূলে বাতাস বইবে, এই অপেক্ষায় পাঁচ দিন পাঁচ রাত অপেক্ষা করলাম আমরা। তারপর পাল তুলে নদী বরাবর এগোলাম, মাঝে মধ্যে বৈঠা চালালাম, যতোক্ষণ না পৌঁছুলাম রোমের পাহাড়ে।"

'রোমের পাহাড়।' অন্যমনস্কভাবে বিড়বিড় করলো জেনিথ। 'ধাঁধা মনে হচ্ছে।'

'আসলে বোধহয় রোমের পাহাড়ের সাথে তুলনা করেছে রাফিনাস,' ধারণা করলো রানা।

'কঠিন ধাঁধা,' স্বীকার করলেন ডঃ ওয়ার্ড।

ওভারশিয়ার ল্যাটিনিয়াস মাসেরের অধীনস্থ ক্রীতদাসরা নদীর ওপর পাহাড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করলো। আটমাস পর জাহাজগুলো থেকে লুকানোর জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো কার্গো।"

'লুকানোর জায়গার বর্ণনা দিয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

একটা কপি তুলে নিয়ে মোম ট্যাবলেটের লেখার সাথে মেলালেন ডঃ ওয়ার্ড। 'একজোড়া শব্দ অস্পষ্ট। আন্দাজ করে নিয়ে পড়তে হবে।'

"এভাবে গোপন জিনিসের গোপনীয়তা ক্রীতদাসদের তৈরি করা সুড়ঙ্গের ভেতর সুরক্ষিত করা হলো। বেড়া থাকায় জায়গাটা দেখতে পাওয়া যায় না। কার্গোর প্রতিটি জিনিস পাহাড়ের ভেতর ঢোকানোর পর অসভ্য হামলাকারীরা ঝাঁপিয়ে পড়লো। সময়মতো সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছিল কিনা আমি বলতে পারবো না। সৈকত থেকে ঠেলে আমার জাহাজটাকে পানিতে নামানোর কাজে ব্যস্ত ছিলাম আমরা।"

'দূরত্ব জানাতে ব্যর্থ হয়েছে রাফিনাস,' বললো রানা। 'দিক নির্দেশও দেয়নি। কে জানে অসভ্যরা পাহাড় খুঁড়ে সংগ্রহগুলো নষ্ট করেছে

কিনা।'

'এতো হতাশ হয়ো না তো!' ধমকের সুরে বললো জেনিথ। 'ভেনাটর নিশ্চয়ই সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করেছিলেন। এই বিপুল সংগ্রহ এমনভাবে হারিয়ে যেতে পারে না যেন সেগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিলো না। অন্তত কিছু কিছু নিশ্চয়ই উদ্ধার করা যাবে।'

'জায়গাটা কোথায়, নির্ভর করছে তার ওপর,' বললো রানা। 'সেরা-পিস টাইপের জাহাজ, আটান্ন দিনে চার হাজার নটিক্যাল মাইল পাড়ি দিতে পারে।'

'যদি সোজা একটা রেখা ধরে এগোয়,' বললেন ডঃ ওয়ার্ড। 'কিন্তু রাফিনাস জানায়নি তারা তীর ঘেঁষে গিয়েছিল কিনা। শুধু লিখেছে আটান্ন দিন পর প্রথম একটা দ্বীপে পা ফেলে। তবে আমার ধারণা, সম্ভাব্য একটা জায়গা হতে পারে পশ্চিম অফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল। ফিফথ্ সেঞ্চুরি বি. সি.-তে একদল ফিনিশিয়ান ক্রু ঘড়ির কাঁটা ঘোরার আদলে আফ্রিকাকে চক্কর দিয়ে এসেছিল। রাফিনাসের সময়ে এলাকাটার বেশিরভাগই চার্ট করা হয়ে গেছে। স্ট্রেইটস অভ জিব্রাল-টার পেরোবার পর ভেনাটর তার জাহাজগুলোকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যায়, এটাই যেন যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।'

'কিন্তু রাফিনাস দ্বীপের কথা বলছে,' মনে করিয়ে দিলো রানা।

'মদেইরা হতে পারে, হতে পারে ক্যানারি বা কেপ ভার্দ দ্বীপপুঞ্জ,' চোখে চ্যালেঞ্জ নিয়ে রানার দিকে তাকালো জেনিথ।

'চিঁড়ে ভিজছে না,' হেসে উঠে বললো রানা। 'আফ্রিকার ডগা থেকে অর্ধেক দুনিয়া ঘুরে সেরাপিস গ্রীনল্যাণ্ডে চলে এলো, এর কি ব্যাখ্যা দেবে? তুমি আট হাজার মাইল দূরত্বের কথা বলছো।'

'মিঃ রানা ঠিক বলছেন,' নিজের ভুল ধরতে পারলেন ডঃ ওয়ার্ড।

'তাহলে উত্তরের জলপথ ধরেছিল ওরা,' বললো জেনিথ। 'দ্বীপ-

গুলো হতে পারে শেটল্যাণ্ড বা ফারো। তাই যদি হয়, যে পাহাড়টার কথা বলা হয়েছে সেটা নরওয়ের উপকূলে বা আইসল্যাণ্ডে কোথাও থাকতে পারে।'

'আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি না,' বললো রানা। 'এ থেকে হয়তো ওদের গ্রীনল্যাণ্ডে আটকা পড়ার একটা ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসবে।'

'এরপর কি বলছে রাফিনাস, অসভ্যদের হাত থেকে বাঁচার পর কি ঘটলো?'

চকলেটের কাপে চুমুক দিলেন ডঃ ওয়ার্ড। 'পড়ি।'

"খোলা সাগরে পৌঁছুলাম আমরা। জাহাজ চালানো কঠিন হয়ে উঠলো। নক্ষত্রগুলোকে অচেনা অবস্থানে দেখতে পেলাম আমরা। সূর্যও তার প্রকৃতি বদলেছে। দক্ষিণ দিক থেকে ধেয়ে এলো ভীষণ ঝড়। দশ দিনের দিন একজন ক্রু পানির তোড়ে ভেসে গেল। আগের মতোই উত্তর দিকে চলেছি আমরা। একত্রিশ দিন পর আমাদের দেবতা পথ দেখিয়ে নিরাপদ একটা বে-তে নিয়ে এলো আমাদের। এখানে আমরা মেরামতের কাজ সারলাম। তীর থেকে যতোটুকু যা রসদ পাওয়া যায় তোলা হলো। জাহাজে আমরা কিছু পাথর তুললাম, অতিরিক্ত ব্যালাস্ট হিসেবে। সৈকত থেকে খানিকটা সামনে খর্বকায় পাইন গাছের বন দেখলাম। লাঠির সামান্য খোঁচা দিতেই বালি থেকে মিষ্টি পানি বেরুলো।

"ছ'দিন নির্বিঘ্নে জাহাজ চালাবার পর আবার একটা ঝড় আঘাত হানলো। আমাদের পাল ছিঁড়ে গেল। ভেঙে গেল মাস্তুল। ভেসে গেল দাঁড়। নির্দয় বাতাসের ধাক্কায় অনেকগুলো দিন অসহায়ের মতো ভেসে চললাম আমরা। দিনের হিসাব

হারিয়ে ফেললাম। ঘুমানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রচণ্ড শীত অনুভব করছি, এমন আবহাওয়ার কথা কেউ আমরা কখনো শুনিনি। ডেকের ওপর বরফ জমে যাচ্ছে। জাহাজ স্থির রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ঠাণ্ডায় কাতর ও ক্লান্ত ক্রুদের নির্দেশ দিলাম পানি আর মদের জারগুলো জাহাজ থেকে ফেলে দাও।

"এই দীর্ঘ বে-তে ঢোকার কিছু সময় পর সৈকতে জাহাজ ভেড়াতে সমর্থ হলাম আমরা, তারপর দু'দিন দু'রাত মড়ার মতো ঘুমালাম।

"দেবতা সেরাপিস নিষ্ঠুর হলেন। শীত এসে গেল, বরফে আটকা পড়লো জাহাজ। সাহসে বুক বেঁধে গ্রীষ্মের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় থাকলো না। বে-র ওপারে অসভ্যদের গ্রাম, তারা আমাদের সাথে বিনিময় বাণিজ্যে রাজি হলো। আমরা খাবার সংগ্রহ করলাম। তারা আমাদের স্বর্ণমুদ্রা তুচ্ছ গহনা হিসেবে ব্যবহার করলো, ওগুলোর আসল মূল্য সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। তাদের কাছ থেকে শিখলাম দৈত্যাকার একটা মাছের তেল পুড়িয়ে কিভাবে গরম থাকতে হয়। আমাদের সবার পেট ভরা, আশা করি এই বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারবো।

"সময় পেলেই প্রতিদিন কিছু কিছু লিখছি। আজ আমি স্মরণ করবো সেরাপিসের হোল্ড থেকে ভেনাটর কি ধরনের কার্গো তার ক্রীতদাসদের দিয়ে বের করেছিল। গ্যালি থেকে লুকিয়ে সব আমি দেখেছিলাম। জিনিসটা ছিলো প্রকাণ্ড, সেটাকে বের করার সাথে সাথে সবাই হাঁটু গেড়ে সম্মান প্রদর্শন করে।"

'কি বোঝাতে চেয়েছে রাফিনাস ?' প্রশ্ন করলো জেনিথ।

'ধৈর্য ধরুন,' বললেন ডঃ ওয়ার্ড। 'শুনুন।'

"তিনশো বিশটা তামার টিউব, জিওলজিকাল চার্ট লিখে চিহ্নিত করা। তেষট্টিটা পর্দা। সোনা আর কাঁচ দিয়ে তৈরি কফিনের সাথে ছিলো ওগুলো। কফিনটা আলেকজাণ্ডারের। আমার হাঁটু কাঁপতে লাগলো। আমি তাঁর মুখ দেখতে পেলাম·· ।"

'খতম, আর কিছু লেখেনি রাফিনাস,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন ডঃ ওয়ার্ড। 'এমনকি বাক্যটিও শেষ করেনি সে। শেষ মোম ট্যাবলেটে একটা নক্সার সাহায্যে দেখানো হয়েছে তীর আর সৈকতের সাধারণ আকৃতি আর নদীর গতিবিধি।'

'আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের নিখোঁজ কফিন,' ফিসফিস করে বললো জেনিথ। 'তাহলে কি আজও তিনি কোনো এক পাহাড়ের ভেতর সুড়ঙ্গে শুয়ে আছেন ?'

'আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর মাঝখানে ?' প্রশ্নটা যোগ করলেন ডঃ ওয়ার্ড। 'আশা করতে দোষ কি।'

রানার প্রতিক্রিয়া অন্য রকম হলো। চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললো, 'আশা জিনিসটা শুধু দর্শকদের জন্যে। আমার ধারণা, চেষ্টা করলে ত্রিশ দিনের মধ্যে লাইব্রেরীটা খুঁজে বের করা সম্ভব   না, বিশ দিনের মধ্যেই পারা যাবে।'

ডঃ ওয়ার্ড আর জেনিথের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। রানা যেন রাজনৈতিক নেতা, নির্বাচনে দাঁড়িয়ে দ্রব্যমূল্য কমাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ওরা কেউ তার কথা বিশ্বাসই করলো না।

রানা বললো, 'অমন হাঁ করে তাকিয়ে থেকো না। এটাকে একটা কাজ হিসেবে দেখলে অসম্ভবের কিছু নেই। দেখি তো নক্সাটা।'

মোম ট্যাবলেট দেখে নক্সাটা বড় করে এঁকেছে জেনিথ, তার আঁকা-

টাই রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন ডঃ ওয়ার্ড। তেমন কিছু নেই ওতে, আঁকাবাঁকা কয়েকটা রেখা ছাড়া। 'এ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে বলে মনে করি না,' বললেন তিনি।

নক্সাটা দেখে মুখ তুললো রানা। 'এই-ই যথেষ্ট,' দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বললো ও। 'এটাই আমাদেরকে সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।'

ভোর চারটের সময় রানার ঘুম ভাঙানো হলো। বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে জরুরী বার্তা পাঠিয়েছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ডঃ জেনিথ কর্নেলিয়াস ও বেন নেলসনকে নিয়ে ওয়াশিংটনে পৌঁছুতে হবে রানাকে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানিয়েছেন, এ-ব্যাপারে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানেরও সম্মতি আছে। কিন্তু কারণটা কি, কিসে রাহাত খানের সম্মতি আছে, সে-সম্পর্কে কোনো আভাস দেননি অ্যাডমিরাল।

হেলিকপ্টারে করে এস্কিমোদের একটা গ্রামে পৌঁছুলো ওরা, সেখান থেকে নেভির একটা প্লেনে চড়ে চলে এলো আইসল্যাণ্ডে, ওখানে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল এয়ারফোর্সের বি-ফিফটিটু বম্বার, পৌঁছে দিলো ওয়াশিংটনে।

সারাটা পথ শুধু আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর কথা ভেবেছে রানা। ভেবেছে সেরাপিসের বরফে পরিণত ক্রুদের কথা। স্কিপার রাফিনাস, তার মেয়ে হাইপাতিয়া। অন্ধকার হোল্ডের অন্ধকার কোণে হাইপাতিয়া আর তার সঙ্গী কুকুরটাকে দেখতে পায়নি রানা, তবে ভিডিও ক্যামেরায় ঠিকই ধরা পড়েছিল। লম্বা চুলো এক কুকুরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট এক মেয়ে।

হাইপাতিয়াকে হয়তো শেষ পর্যন্ত একটা মিউজিয়ামে ঠাঁই পেতে হবে, যুগ যুগ ধরে কৌতূহলী মানুষ দেখবে তাকে। তারপর রানা নক্সাটার কথা ভেবেছে। মোমের গায়ে আঁকা, আবহাওয়ার কারণে সেটা বিকৃত অবস্থায় পেয়ে থাকতে পারে ওরা। ডঃ ওয়ার্ড আর জেনিথের সন্দেহই হয়তো ঠিক, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর সন্ধান কোনোদিন না-ও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু, মনের বল আগের মতোই অটুট আছে ওর। চেষ্টা করে দেখবে ও। খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের ভাণ্ডার। রীতিমতো একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করছে রানা। প্রতিদ্বন্দ্বী সময় আর প্রকৃতি।

মনটা খুঁত খুঁত করছে ওর। হঠাৎ ওয়াশিংটনে কেন ডেকে পাঠালেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। রাহাত খান জড়িত থাকায় এ-কথা মনে করার কারণ আছে, নতুন কোনো অ্যাসাইনমেন্ট গছাবার চেষ্টা করা হতে পারে। তা যদি হয়, বসকে বোঝাবার চেষ্টা করবে ও, লাইব্রেরীটা খুঁজে বের করা যে-কোনো অ্যাসাইনমেন্টের চেয়ে কম জরুরী নয়।

এনড্রু এয়ারফোর্স বেসে নামলো প্লেন। ওদের জন্যে একটা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে একজন ড্রাইভার। সে-ই জানালো, অ্যাডমিরাল তাঁর ক্লাবে অপেক্ষা করছেন।

ক্লাবের ছোট্ট একটা কামরা রিজার্ভ করেছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। জেনিথের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলো রানা।

'বসো, সবাই বসো,' জেনিথের সাথে করমর্দন শেষ করে বললেন অ্যাডমিরাল।

'আপনারা কথা বলুন, আমি একটু লেডিস রুম থেকে তাজা হয়ে আসি।'

'ডান দিকে প্রথম দরজাটা,' হাত ইশারায় দেখিয়ে দিলেন অ্যাড-

মিরাল। জেনিথ অদৃশ্য হবার সাথে সাথে রানা আর নেলসনকে কাছে সরে আসার ইঙ্গিত দিলেন তিনি, তিন মাথা এক হলো। 'প্রেসিডেন্ট, বুঝলে!' ফিসফিস করে বললেন তিনি। 'স্বয়ং মিঃ প্রেসিডেন্ট তোমাদের সাথে দেখা করে গুরুত্বটা বোঝাতে চেয়েছিলেন। নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে সি. আই. এ. চীফ তাঁকে নিরস্ত করেছেন।' কথা শেষ করে মাথা তুললেন তিনি, দু'জনের দিকে পালা করে এমনভাবে তাকালেন, যেন বলতে চাইছেন—কি, কেমন চমকে দিয়েছি!

কিন্তু ওরা কেউ চমকালো বলে মনে হলো না। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো বেন নেলসন, চেহারা দেখে বোঝা গেল না আদৌ কিছু ভাবছে কিনা। রানাকে চিন্তিত দেখালো, টেবিলের ওপর চোখ, তিন সেকেণ্ড পর মুখ তুলে ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'তারমানে কমাণ্ডার জন ম্যাকেঞ্জির চালাকি এটা। ডঃ ওয়ার্ডের অনুবাদ নেভি হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়েছেন তিনি, সেখান থেকে জানানো হয়েছে প্রেসিডেন্টকে, তাই না, অ্যাডমিরাল?'

চমকে দেয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হলেও গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন জর্জ হ্যামিলটন। 'তোমরা আইসল্যাণ্ডে পৌঁছুনোর আগেই অনুবাদের একটা কপি পড়েছি আমরা। আমরা মানে আমি আর রাহাত। প্রেসিডেন্ট তার আগেই পড়েছেন। বিলিভ ইট অর নট, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী অস্থির করে তুলেছে তাঁকে। আমরাও কম পাগল হইনি।' রানা লক্ষ্য করলো, দু'মিনিটের মধ্যে তিনবার হাতঘড়ি দেখলেন অ্যাডমিরাল।

'বস এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ওয়াশিংটন হোটেলে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তিনিই তোমাকে সব জানাবেন।' আবার হাতঘড়ি

দেখলেন তিনি। 'বেনকে নিয়ে যাচ্ছি আমি, নৌবাহিনীর সেক্রেটারীর সাথে জরুরী মীটিং আছে আমার, যাবার পথে ওকে আমি ব্রিফিং করবো। জেনিথকে হোটেলে তুলে দিয়ে তুমি তোমার বসের সাথে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দেখা করো।'

'সব জানাবেন মানে ?'

'এটাকে একটা টপ সিক্রেট অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে দেখা হচ্ছে,' তাড়াতাড়ি, অস্থিরতার সাথে বললেন অ্যাডমিরাল। 'যেহেতু তোমরা আবিষ্কার করেছো, কাজেই তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে দায়িত্বটা। অনুসন্ধানটাকে আন্তর্জাতিক একটা চেহারা দেয়ার জন্যেও টিমে তোমাকে রাখতে চেয়েছেন প্রেসিডেন্ট, প্রস্তাব পেয়ে রাহাত সানন্দে রাজি হয়েছে। মিস জেনিথকে রাজি করানো তোমার দায়িত্ব।'

'আর সোভিয়েট সাবমেরিন ?'

'রুশ সাবমেরিন সম্পর্কে নতুন একটা কথা ভেবেছি আমি। আধুনিক স্যালভেজ টেকনোলজি-তে পিছিয়ে আছে ওরা, সাবমেরিনটা কোথায় আছে জানলেও ওরা নিজেদের চেষ্টায় উদ্ধার করতে পারবে না, আমাদের সাহায্য চাইবে। কাজেই সাবমেরিনের অবস্থান জানিয়ে দিয়ে উদ্ধারের প্রস্তাব দেবো কিনা ভাবছি। তাতেও আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হবে।'

'এক মিনিট, অ্যাডমিরাল,' বললো রানা। 'আমার গাড়িটা যে দরকার।' মান্ধাতা আমলের একটা গাড়ি আছে রানার, ঝড়ো কাকের মতো দেখতে, আমেরিকায় এলে সখ করে মাঝেমধ্যে চড়ে। গাড়িটা অ্যাডমিরালের কলোরাডো গ্যারেজে রাখা হয়। গ্যারেজে আরো অনেক পুরনো আমলের গাড়ি আছে। অ্যাডমিরাল একজন সংগ্রাহক।

'গাড়ি দরকার ?' অ্যাডমিরালকে দেখে রানার মনে হলো ভদ্রলোক যেন বিষম সমস্যায় পড়ে গেলেন। 'ঠিক আছে, গ্যারেজে গিয়ে নিয়ে আসতে পারো। তবে আমার বাড়ির দিকে যেয়ো না। দরজায় পা রাখার সাথে সাথে গুলি খাবে।'

'মানে ?'

'টপ সিক্রেট !' অস্ফুটে বলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন জর্জ হ্যামিলটন, তাঁকে অনুসরণ করার আগে রানার দিকে ফিরে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো নেলসন।

জেনিথকে নিয়ে ডিনার খেলো রানা, তারপর তাকে একটা হোটেলে তুলে দিলো। সাধনা করতে হয়নি, প্রস্তাব শুনেই সাগ্রহে রাজি হয়ে গেছে জেনিথ। রানাকে বিদায় দেয়ার মুহূর্তে খুশিতে আলিঙ্গন করলো সে, আগেই ঠিক হয়েছে আবার কোথায় মিলিত হবে ওরা।

জেনিথের হোটেল থেকে বেরিয়ে নুমা হেডকোয়ার্টারে চলে এলো রানা। কমপিউটর সেকশনটা টপ ফ্লোরে, উঠে এসে এক কামরা থেকে আরেক কামরায় ঘুর ঘুর করতে লাগলো। প্রতিটি কামরায় ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট আর কমপিউটর হার্ডওয়্যার গিজগিজ করছে। পরিচিত অনেকের সাথে দেখা হলো, অন্যমনস্কতার ভান করে সবাইকে এড়িয়ে গেল রানা। তারপর যাকে খুঁজছে পেয়ে গেল তাকে। 'কি হে, জাদুকর, দিনকাল কেমন কাটছে ?'

একটা মিনি টেপ রেকর্ডার নাড়াচাড়া করছিল হেনরি মারলিন। ঝট্ করে মুখ তুলেই হাসলো সে। 'আরে রানা যে !' তারপর অবাক হলো সে। 'তুমি ওয়াশিংটনে। তা কিভাবে সম্ভব !' লালচে ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলালো, চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালি নামে এক কমপিউটর কারখানা থেকে হেনরি মারলিনকে ভাগিয়ে এনেছেন জর্জ হ্যামিলটন। আজ নুমার যে ডাটা কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে তা মারলিনের একক অবদান বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। দুনিয়ার সমুদ্র নিয়ে যতো গবেষণা বা বই লেখা হয়েছে, সেগুলোর সমস্ত তথ্য রয়েছে মারলিনের কাছে। বোতাম টিপে যে-কোনো তথ্য মুহূর্তেই সরবরাহ করতে পারে সে। গ্রীন হাউস এফেক্টের ফলে বাংলাদেশ তলিয়ে যেতে পারে বলে বাজারে যখন জোর গুজব, এই হেনরি মারলিনই তখন তথ্য-প্রমাণ ও গবেষণার ফলাফল দেখিয়ে রানাকে আশ্বাস দিয়েছিল, বিপদটা অতো বড় কিছু নয়, আর হঠাৎ করে কোনো বিপর্যয় ঘটার ভয়ও নেই।

'ওটা নিয়ে কি করছো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আছাড় মেরে ভেঙে ফেলবো কিনা ভাবছি,' রাগের সাথে বললো মারলিন, ঠকাস্ করে টেবিলে রেখে দিলো রেকর্ডারটা। 'নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু কি নষ্ট হয়েছে বুঝতে পারছি না।'

'গোটা কমপ্লেক্স তোমার হাতে গড়া, আর বলছো কি যে সামান্য একটা টেপ রেকর্ডার মেরামত করতে পারো না?'

'কাজটায় আমার মন নেই,' ম্লান গলায় বললো মারলিন। 'যদি কখনো উৎসাহ পাই, ওটাকে আমি বদলে একটা টকিং ল্যাম্প বানাবো।'

'উৎসাহ পাবে এমন একটা কাজ করতে চাও?' প্রসঙ্গটা তুললো রানা।

রানার দিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো মারলিন। 'কি ধরনের কাজ?'

'রিসার্চ।'

টেবিলের দেরাজ খুলে কাগজ-পত্র হাতড়াতে শুরু করলো মারলিন।

একটা কাগজ তুলে নিয়ে বিড়বিড় করে কি পড়লো বোঝা গেল না। 'সেরাপিস সম্পর্কে, তাই না ?' মুখ তুলে প্রশ্ন করলো সে।

'তুমি জানো ?'

'আমার হাতে এটা ডঃ ওয়ার্ডের অনুবাদ। কি করাতে চাও আমাকে দিয়ে ?'

'চাই নক্সাটা সাথে নিয়ে ওই কাগজটাই ভালো করে দেখো।'

অনুবাদ আর নক্সার ফটো কপি পাশাপাশি রেখে ঝুঁকে পড়লো মারলিন। 'তুমি জিওগ্রাফিকাল লোকেশন খুঁজছো ?'

'যদি সন্ধান দিতে পারো।'

'এতে খুব একটা কিছু নেই,' বললো মারলিন। 'কি এটা ?'

'একটা সাগরের তীররেখা ও একটা নদী।'

'কবে আঁকা হয়েছে ?'

'তিনশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে।'

'আমাকে বরং আটলান্টিসের রাস্তাগুলোর নাম কি জিজ্ঞেস করতে পারতে।'

'কেন, তোমার ইলেকট্রনিক খেলনাগুলো দিয়ে জাহাজটার কোর্স বের করাতে পারো না, ভেনাটরের ফ্লীট কার্টাজেনা ত্যাগ করার পর ? কিংবা জাহাজটা গ্রীনল্যাণ্ডে যেখানে অচল হয়ে পড়লো, সেই জায়গা থেকে পিছন দিকের কোর্সটা বের করতে পারো না ?'

'তুমি বুঝতে পারছো, নদীটার অস্তিত্ব আজ আর না-ও থাকতে পারে ?'

'ভেবেছি।'

'অ্যাডমিরালের অনুমতি লাগবে আমার।'

'কাল সকালে পেয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখতে পারি। সময়সীমা ?'

'সাফল্য না আসা পর্যন্ত চেষ্টা করে যাও,' বললো রানা। 'ওয়াশিংটনের বাইরে যেতে হচ্ছে আমাকে, কাল বাদে পরশু খবর নেবো কেমন এগোচ্ছে তোমার কাজ।'

আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী সম্পর্কে বুড়োর এতো আগ্রহ কেন ? শুধু মনে মনে নয়, সাহস করে প্রশ্নটা উচ্চারণও করে বসলো রানা। ব্যস, রীতিমতো একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন বি. সি. আই. চীফ রাহাত খান।

'ভালো করে ইতিহাস পড়া থাকলে বোকার মতো প্রশ্নটা করতে না,' ধমকের সুরে শুরু করলেন তিনি। 'ফারাওদের হারিয়ে যাওয়া সোনার খনির কথা পড়া আছে ? পান্নার খনি, যেটা ক্লিওপেট্রার বলে দাবি করা হয়। গোপন রহস্যে ভরা উপকথার সেই পান্ট নগরী—রূপো, সুর্মা আর অদ্ভুত সবুজাভ সোনার জন্যে বিখ্যাত—দুই তিন হাজার বছর আগে নগরীর অবস্থান জানা থাকলেও, আজ মানুষ তার ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে। তারপর ধরো, অফির রাজ্যের কথা। শুধু গুজব নয়, রাজ্যের বিপুল সম্পদ আর মহামূল্যবান দুর্লভ পাথর রেকর্ড করা ঐতিহাসিক সত্য—সেটারও অবস্থান নিয়ে নানাজনের নানা মত। কোথায় গেল রাজা সলোমনের খনিগুলো ? ব্যাবিলনের নেবুচাদনেজার ? সাবা-র রানী, শেবার ঐশ্বর্য আর রাজ্য আজ শুধু অতীত স্মৃতি। এককালে এসবের অস্তিত্ব ছিলো, মধ্যপ্রাচ্যের মাটির নিচে আজও সে-সব নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও লুকানো আছে। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীতে আর কি পাওয়া যাবে জানি না, তবে এ-সবের ম্যাপ বা নক্সা যে পাওয়া যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু, স্যার, পুরনোদিনের খনি বা সম্পদ যাই পাওয়া যাক, তাতে আমরা কিভাবে লাভবান হবো ?' জানে আবার হয়তো ধমক খেতে হবে, তবু খোঁচাটা দিতে ইতস্তত করলো না রানা।

'নিজেদের লাভবান হতেই হবে, এমন কোনো কথা আছে ?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন রাহাত খান। এই সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। উঠে গিয়ে রিসিভার তুললেন তিনি, হু'চার বার হুঁ-হ্যাঁ করে রেখে দিলেন আবার, ফিরে এসে রানার সামনে সোফায় বসলেন। 'স্ট্র্যাটিগ্রাফিক ট্র্যাপ কথাটা শুনেছো কখনো ? জানো বিষয়টা কি নিয়ে ?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়লো রানা। ভাবলো, বুড়ো আজ তাকে জ্ঞান-দান করেই ছাড়বে।

'আবিষ্কারের অপেক্ষায় ভয়ানক দুর্গম তেল খনি, তাকে বলা হয় স্ট্র্যাটিগ্রাফিক ট্র্যাপ। সাধারণ সাইজমিক এক্সপ্লোরেশনের সাহায্যে ওগুলো খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ কয়েক জায়গায় আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা গেছে প্রতিটি খনিতে বিপুল পরিমাণ তেল রয়েছে।

'এখানে বিটুমিনের কথা এসে যায়। হাইড্রোকার্বনের মতো টার বা অ্যাসফল্ট, পাঁচ হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়ায় ব্যবহার করা হতো—বাড়িঘরের ছাদে, রাস্তায়, এমনকি ক্ষতস্থানেও। আরো পরে, উত্তর আফ্রিকার উপকূলের কথা লিখে গেছে গ্রীকরা, গোটা উপকূলে তেলের স্রোত বইতো। রোমানরা সিনাই-এ একটা জায়গার সন্ধান পায়, নাম ছিলো পেট্রল মাউন্টেইন। বাইবেল পড়েছো ?' দ্রুত মাথা ঝাঁকালো রানা। 'তাতে দেখোনি, ঈশ্বর জ্যাকবকে নির্দেশ দিয়ে বলছেন, চকমকি পাথরে মুখ দিয়ে তেল চোষো। বাইবেলেই বর্ণনা দেয়া আছে, সিদ্দিম উপত্যকায় আঠালো পদার্থ ভরা বহু গভীর গর্ত আছে, আমরা ধরে নিতে পারি ওগুলো আসলে টার খনি।'

'এ-সব এলাকা ইতিমধ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি বা ড্রিল-ও করা হয়নি?'

'ড্রিল করা হয়েছে, তবে আজ পর্যন্ত তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। জিওলজিস্টরা দাবি করছে, শুধু প্যালেস্টাইনের মাটিতেই পাঁচশো মিলিয়ন ব্যারেল ক্রুড পেট্রোলিয়াম পাবার শতকরা নব্বই ভাগ সম্ভাবনা রয়েছে। দুঃখজনক যে পুরনো দিনের সাইট-গুলো হারিয়ে গেছে, চাপা পড়ে গেছে কয়েক শো বছরের ভূমিকম্পে।'

'তাহলে, স্যার, প্যালেস্টাইনীরা কিছু পায় কিনা সেটা দেখতে হবে?'

'একটা দেশে কি সম্পদ আছে তার ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ রাজনীতি,' গম্ভীর গলায় বললেন রাহাত খান। 'তেল পাওয়া গেলে ওদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে আমার ধারণা। তখন এমনকি আমেরিকাও ওদের কথা শুনবে। তেল জিনিসটা কার না দরকার?' চুরুট ধরিয়ে রানার দিকে মুখ তুললেন তিনি। 'আমি আগেই ধারণা করেছিলাম, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তুমি। তাই একজন বিশেষজ্ঞের সাথে তোমার দেখা করার ব্যবস্থা করেছি। কলোরাডো ইউনিভার্সিটিতে ক্লাসিকাল হিস্ট্রি পড়ান ভদ্রলোক, আমার পরিচিত, বলতে গেলে সারাটা জীবন আলেক-জান্দ্রিয়া লাইব্রেরী নিয়ে গবেষণা করছেন। লাইব্রেরীটা খুঁজে বের করার ব্যাপারে তিনি তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন। ভদ্রলোকের নাম ক্লাইভ ফোরম্যান।'

ভালোই হলো, ভাবলো রানা, কলোরাডোয় এমনিতেও ওকে যেতে হতো। 'আমি তাহলে··· ।'

'হ্যাঁ, যাবে। তবে সাবধানে থেকো। এইমাত্র যে ফোনটা পেলাম,

তোমার এজেন্সির একজন এজেন্ট করেছিল, সে একজন কে. জি. বি. এজেন্টকে ফলো করছে। কে. জি. বি. এজেন্ট লোকটা তোমাকে ফলো করছিল।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকলো রানা।

'কারণটা এখনো জানা যায়নি। সম্ভবত ওরা সন্দেহ করছে, ওদের হারানো সাবমেরিন তোমরা খুঁজে পেয়েছো। কিংবা হয়তো আলেক-জান্দ্রিয়া লাইব্রেরী সম্পর্কে আভাস পেয়েছে ওরা। হোটেল হিলটনে উঠবে তুমি, একটা মেসেজ পাবে, তাতে জানা যাবে কোথায় কখন দেখা হবে ডঃ ক্লাইভ ফোরম্যানের সাথে।'

'অ্যাডমিরাল বলছিলেন, তাঁর গ্যারেজে আমি যেতে পারি, কিন্তু বাড়িতে ঢুকলে আমাকে নাকি··· ।'

'কোনো প্রশ্ন না করে গুলি করা হবে, এই তো? হ্যাঁ, তিনি ঠিকই বলেছেন। কারণ ওখানে উম্মে সালিহাকে গোপনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এবার তুমি রওনা হতে পারো।'

চোদ্দ

মোস্তফা কামালের ভিলায় আজ অনেক মেহমান। তাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে মাত্র, এই সময় ডাইনিং হলে ঢুকলো সে। 'বন্ধুরা, আশা করি খানাটা উপভোগ করেছেন!' তার ভারি কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠলো।

মোহাম্মদ কাইউম, প্রখ্যাত মৌলানা ও মোস্তফা কামালের ছায়া হিসেবে পরিচিত, চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো। 'আপনার আতিথেয়-তার কোনো তুলনা হয় না, জনাব কামাল। তবে আমরা আপনার সম্মানজনক উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হয়েছি।'

'পেট ভরা থাকলে আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা আমার কাছে প্রকাশ করেন না, বেশিরভাগ দিন তাই আমাকে রোজা থাকতে হয়,' ক্ষীণ হাসির সাথে বললো মোস্তফা কামাল। পালা করে টেবিল ঘিরে দাঁড়ানো পাঁচজন লোকের দিকে তাকালো সে। তার প্রতি শ্রদ্ধায় আর ভক্তিতে মাথা নত করে আছে সবাই।

তাদের মধ্যে দু'জনের পোশাক একইরকম। কর্নেল নাগিব ইয়াজ-দানি, সামরিক বাহিনীতে মোস্তফা কামালের যারা সমর্থক সেই সব

অফিসারদের লিডার সে, পরে আছে ঢোলা আলখেল্লা, কাপড়ের বাড়তি অংশটুকু দুই কাঁধ থেকে উঠে এসে মুখ ঢেকে রেখেছে। কায়রো থেকে আসার সময় চেহারা গোপন করার দরকার ছিলো। তার মাথার সাদা পাগড়িটাও সাহায্য করেছে এ-কাজে। মোহাম্মদ কাইউমের পরনেও আলখেল্লা, তার পাগড়িটা সোনালি।

ফৈয়াজ সিদ্দিকী পরেছে ট্রাউজার আর স্পোর্টস শার্ট। সে একজন সাংবাদিক, মোস্তফা কামালের প্রধান প্রচারবিদ। মুশাররফ মালিক জেহাদ আহ্বানকারী কমিটির সামরিক উপদেষ্টা, তার পরনে ব্যাটল ফেটিগ। একা শুধু আল দাউদের পরনে সাফারি স্যুট।

'আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন, কেন আজ আমি হঠাৎ করে জরুরী মীটিং ডেকেছি,' টেবিলের মাথায় চেয়ারটা খালি পড়ে ছিলো, সেটায় বসলো মোস্তফা কামাল, তার ইঙ্গিতে বাকি সবাইও আসন গ্রহণ করলো। 'আপনারা তো জানেনই, আল্লাহ আমাকে বিশেষ সুনজরে দেখেন। তিনি স্বয়ং আমাকে একটা প্ল্যান দিয়েছেন—একটি মাত্র আঘাতে আমরা অযোগ্য ইসমাইল হোসেন আর তার দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রীসভার সদস্যদের উৎখাত করতে পারবো। প্লিজ, কফি খেতে শুরু করুন আপনারা।'

কেউ কফির কাপে চুমুক দিলো, কেউ দিতে যাচ্ছে, এই সময় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো মোস্তফা কামাল। তার সম্মানে আবার সবাই-কে দাঁড়াতে হলো। শান্ত পায়ে হেঁটে একটা দেয়ালের সামনে চলে এলো সে। হাত বাড়িয়ে চাপ দিলো বোতামে। বড় একটা রঙিন ম্যাপ সিলিং থেকে মেঝের দিকে নেমে এলো। চিনতে পারলো আল দাউদ, দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্র—উরুগুয়ের উপকূল শহর পান্টা ডেল এস্টে-কে লাল বৃত্ত এঁকে দেখানো হয়েছে। ম্যাপের বাকি অর্ধেকের

নিচে টেপ দিয়ে আটকানো একটা আধুনিক প্রমোদতরীর এনলার্জ করা ফটো।

টেবিলে ফিরে এসে মোস্তফা কামাল বসলো আবার, দেখাদেখি অন্যান্যরাও। প্রত্যাশায় ও উত্তেজনায় মনে মনে সবাই অস্থির হলেও, কেউ নড়লো না বা কথা বললো না। সবাই তাকিয়ে আছে মোস্তফা কামালের দিকে, আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত তাদের নেতা কি বলে শোনার আশায় উন্মুখ। মোস্তফা কামালের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আর ভক্তিতে কোনো খাদ নেই। শুধু আল দাউদ তার মনোভাব গোপন রাখলো। তার বাস্তব বুদ্ধি এতোই প্রখর যে পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি, আল্লাহর বিশেষ রহমত ইত্যাদি সে একদমই বিশ্বাস করে না।

'আজ থেকে ছ'দিন পর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পান্টা ডেল এস্টে শহরে,' আবার গমগম করে উঠলো মোস্তফা কামালের কণ্ঠস্বর। 'তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো যুগ যুগ ধরে অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার, আপনারা জানেন। এবার তারা একজোট হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মিশর বাদে, সব ধরনের বকেয়া ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকার করবে তারা। সেই সাথে একটা নিষেধাজ্ঞা জারি করে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে দেশ থেকে লভ্যাংশ নিয়ে যেতে বাধা দেবে। ঘোষণা দুটো জারি হলে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কয়েক শো ব্যাংক রাতারাতি লালবাতি জ্বালবে।

'পশ্চিমা ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধি আর উন্নত রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা রাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা বৈঠক করছে আসন্ন সর্বনাশ ঠেকানোর জন্যে। তাদেরকে সাহায্য করছে পুঁজিবাদীদের পা-চাটা কয়েকটা কুকুর, তাদের মধ্যে আমাদের প্রেসিডেন্ট হোসেন ইসমাইল একজন। ইসমাইল ঋণগ্রস্ত তৃতীয় বিশ্ব ও মুসলিম দেশগুলোকে বোঝাতে

চেষ্টা করছে, আরে ভাই, পাওনা টাকা শোধ না দিলে আল্লাহ নারাজ হবেন—টাকা শোধ দাও, তারপর আবার চড়া সুদে ঋণ নাও। হোসেন ইসমাইল একজন অন্তর্ঘাতক, তার ষড়যন্ত্র আমরা সফল হতে দিতে পারি না। মিশর পুঁজিবাদী ছুনিয়ার দালালী করবে, এ অসহ্য।'

'আমি বলি কি, অত্যাচারীকে খুন করে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা হোক,' আক্রোশে কেঁপে গেল মুশাররফ মালিকের গলা। তার বয়স কম, কৌশলজ্ঞানের ভারি অভাব। নবিশ বিপ্লবীদের দ্বারা অসময়ে একটা অভ্যুত্থান ঘটাতে গিয়ে এরইমধ্যে সত্তরজনের প্রাণহানি ঘটিয়েছে সে। তার সদা চঞ্চল দৃষ্টি টেবিলের চারদিক থেকে ঘুরে এলো। 'ইসমাইলের প্লেন উরুগুয়ের পথে আকাশে ওঠার সাথে সাথে একটা গ্রাউণ্ড-টু-এয়ার মিসাইল ছুঁড়ে দিই, খেল খতম।'

'তাতে শুধু প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে ক্ষমতা দখলের সুযোগ করে দেয়া হবে, কারণ দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে যে প্রস্তুতি দরকার তা এখনো শেষ করিনি আমরা,' বিরোধিতা করলো ফৈয়াজ সিদ্দিকী। সে একজন জনপ্রিয় লেখকও বটে, বয়স পঞ্চান্ন, টেবিলে যারা উপস্থিত তাদের মধ্যে একমাত্র তাকেই শ্রদ্ধা করে আল দাউদ।

কর্নেল নাগিব ইয়াজদানীর দিকে তাকালো মোস্তফা কামাল। 'কথাটা কি ঠিক, নাগিব?'

মাথা ঝাঁকালো কর্নেল। 'ফৈয়াজ ঠিক বলেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কায়সার আজিজ জনগণের ম্যাণ্ডেট গ্রহণের শর্ত দিয়ে আসলে আপনাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছে। সে যে উচ্চাভিলাষী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার স্বপ্ন, সেনাবাহিনীর সমর্থন নিয়ে প্রেসিডেন্ট হওয়া।'

ফৈয়াজ সিদ্দিকী বললো, 'আমার কাছে তথ্যও আছে। কায়সার

আজিজের ঘনিষ্ঠ একজন অফিসার গোপনে আমাদের আন্দোলনে শরিক হয়েছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, জনসাধারণের সমর্থন পাবার জন্যে চমৎকার একটা বুদ্ধি বের করেছে কায়সার আজিজ। উম্মে সালিহার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাবে সে।'

'কিভাবে ?'

'উম্মে সালিহার পাণিপ্রার্থী হয়ে, তাকে বিয়ে করে।'

ঠোঁট টিপে হাসলো মোস্তফা কামাল। 'প্রতিরক্ষামন্ত্রী বালির দুর্গ গড়তে চাইছে। বিয়ের আসরে উম্মে সালিহাকে পাবে না সে।'

'কথাটা কি নিশ্চয় করে বলা যায় ?' জিজ্ঞেস করলো আল দাউদ।

'হ্যাঁ, যায়,' আধবোজা চোখে, মৃদুকণ্ঠে বললো মোস্তফা কামাল, তার চেহারায় তৃপ্তির একটা ভাব ফুটে উঠলো। 'আল্লাহ ইচ্ছে করেছেন, কাল সূর্য ওঠার আগেই উম্মে সালিহাকে তিনি দুনিয়ার বুক থেকে তুলে নেবেন।'

'হে শ্রদ্ধেয় নেতা, হে মহা বুজর্গ পীর, দয়া করে সব কথা আমাদেরকে খুলে বলুন।' ব্যাকুল কণ্ঠে অনুরোধ জানালো মোস্তফা কামালের ছায়া অর্থাৎ মৌলানা কাইউম।

ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করলো মোস্তফা কামাল। বিশ্বস্ত মেক্সিকো সূত্র থেকে জানতে পেরেছে সে, ট্যুরিস্টদের অপ্রত্যাশিত ভিড় হওয়ায় পান্টা ডেল এস্‌টে-তে অভিজাত কোনো হোটেল খালি নেই। জায়গার অভাবে শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে রাজি নয় উরুগুয়ে সরকার, তাই বন্দরে নোঙর করা একটা জাহাজ ভাড়া করেছে তারা। ব্রিটিশ প্রমোদতরী লেডি মেরিয়েটায় অবস্থান করবে প্রেসিডেন্ট হোসেন ইসমাইল ও তার সহকারীরা। তার সাথে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট অগাস্টিন মোরেনো ও স্টাফরাও থাকবে

জাহাজে। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পর মোস্তফা কামাল চোখ বুজে ধ্যানমগ্ন হবার ভান করলো, তারপর থেমে থেমে বললো, 'পরম করুণাময় আল্লাহ স্বয়ং আমার কাছে এসেছেন। তিনি এসে আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন জাহাজটা কব্জা করি।'

'সকল প্রশংসা আল্লাহর।' হুংকার ছাড়লো ফৈয়াজ সিদ্দিকী।

বাকি সবাই চেহারায় অবিশ্বাস নিয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। তারপর তারা, সবাই প্রায় একযোগে, চোখে প্রত্যাশা নিয়ে মোস্তফা কামালের দিকে তাকালো, তবে কেউ কোনো প্রশ্ন উচ্চারণ করলো না।

'তোমাদের হাবভাব দেখে বুঝতে পারছি, শিষ্য এবং বন্ধুরা, আমার দিব্যদৃষ্টি সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ আছে।'

'সন্দেহ নেই বা কোনোকালে ছিলো না,' বললো মোহাম্মদ কাইউম। 'কারণ আমরা জানি আপনি সদা সত্য কথা বলেন। তবে আমরা ভাবছি, আল্লাহর নির্দেশ আপনি বুঝতে ভুল করেননি তো?'

'না, আদেশটা স্পষ্ট ছিলো, শুনতে আমার ভুল হয়নি। প্রেসিডেন্ট ইসমাইল সহ জাহাজটাকে অবশ্যই দখল করতে হবে।'

'কি উদ্দেশ্যে?' প্রশ্ন করলো মৌলানা কাইউম।

'দৃশ্যপট থেকে ইসমাইলকে সরিয়ে রাখার জন্যে, যাতে সে কায়রোয় ফিরতে না পারে, আর সেই সুযোগে আল্লাহর প্রিয় ইসলামিক ফোর্স ক্ষমতা দখল করবে।'

কর্নেল নাগিব ইয়াজদানী বললো, 'কিন্তু নিশ্চিতভাবে আমি জানি যে নিজে ছাড়া আর কেউ ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করলে কায়সার আজিজ তার সেনাবাহিনী নিয়ে বাধা দেবে।'

'মানুষের ঢল আর স্রোতকে ঠেকাবে কিভাবে কায়সার আজিজ?'

জিজ্ঞেস করলো মোস্তফা কামাল। 'নাগরিক অসন্তোষ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ঋণ শোধ করতে হচ্ছে, এই অজুহাতে সব রকম সাব সিডি দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে সরকার, ফলে সাধারণ মানুষ সুদখোর ঋণ-দাতাদের ওপর ভয়ানক খেপে আছে। ঋণদাতা সংস্থাগুলোর নিন্দা না করে নিজেদের গলায় ফাঁস পরেছে ইসমাইল আর কায়সার আজিজ। সবাই জানে, মিশরকে এখন শুধু নির্ভেজাল ইসলামী আইন রক্ষা করতে পারে।'

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়লো মুশাররফ মালিক, মুঠো করা হাত তুললো মাথার ওপর, বজ্রকণ্ঠে বললো, 'আমাকে শুধু হুকুম করুন, হে ইসলামের খেদমতগার! আপনার এক কথায় বিশ লাখ মানুষকে আমি রাস্তায় মিছিল করাবো। আপনি শুধু তাদেরকে নেতৃত্ব দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিন, হে আল্লাহর পেয়ারা দোস্ত!'

সারা মুখে পবিত্র হাসি নিয়ে চুপ করে থাকলো মোস্তফা কামাল। ধর্মীয় ভাবাবেগে একটু একটু কাঁপছে সে। তারপর সে বললো, 'জনতা নেতৃত্ব দেবে। আমি তো গরীবের বন্ধু। জনতা নেতৃত্ব দেবে, আমি তাদের অনুসরণ করবো।'

'আল্লাহ আমার গুনা মাফ করুন!' প্রায় কেঁদে ফেললো মৌলানা কাইউম। 'তাঁর নেক বান্দা জনাব মোস্তফা কামালকে আমি ভুল বুঝেছিলাম!'

'তুমি মৌলানা একটা কাপুরুষ!' মুশাররফ মালিক চেঁচিয়ে বললো।

'মোহাম্মদ কাইউম তোমার চেয়ে জ্ঞানী,' শান্তভাবে বললো ফৈয়াজ সিদ্দিকী। 'তিনি জানেন, ঢিল একবার ছোঁড়া হয়ে গেলে আর কিছু করার থাকে না। আল্লাহর নির্দেশ যখন এসেছে, সেটা নিখুঁতভাবে

পালন করতে হলে নানা দিক খতিয়ে চিন্তা করার দরকার আছে।'

কর্নেল নাগিব ইয়াজদানী কথা বললো, 'টেরোরিস্টদের মতো পাইকারী হত্যাকাণ্ড ঘটালে আমাদের আন্দোলনের জন্যে তা মঙ্গল ডেকে আনবে না।'

'কর্নেল, তুমি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করতে চাও?' সরাসরি প্রশ্ন করলো মোস্তফা কামাল, চেহারা দেখে মনে হলো ভারি বিস্মিত হয়েছে সে।

সবাই একযোগে কথা বলতে শুরু করলো, প্রত্যেকেই নিজের কথা ছাড়া আর কিছু শুনতে আগ্রহী নয়। একা শুধু আল দাউদ নির্লিপ্ত থাকলো। সব ক'টা গাধা, ভাবলো সে, সব ক'টা। মুখ ফিরিয়ে ম্যাপের গায়ে সাঁটা প্রমোদতরীর দিকে তাকালো সে। মাথার ভেতর কাজ চলছে।

'আমরা শুধু মিশরীয় নই,' বলে চলেছে কর্নেল নাগিব ইয়াজদানী, 'সেই সাথে আমরা আরবও। আমরা যদি আমাদের অফিসারদের পাইকারীভাবে খুন করি, অন্যান্য আরব দেশগুলো আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। আল্লাহর নির্দেশ ইত্যাদি বলে তাদেরকে বোঝানো যাবে না, ব্যাপারটাকে তারা রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখবে।'

ফৈয়াজ সিদ্দিকী ইঙ্গিতে মৌলানা কাইউমকে দেখালো। 'মৌলানার কথায় যুক্তি আছে। বিদেশী একজন প্রেসিডেন্টের সামনে ইসমাইলকে খুন করার চেয়ে তাকে বরং দেশের মাটিতে খুন করা হোক।'

'খুনটা করতে গিয়ে যদি বিদেশী প্রেসিডেন্ট বা তার সহকারীরা মারা পড়ে, সারা দুনিয়ায় আমাদের বিরুদ্ধে কথা উঠবে,' চিন্তিত সুরে বললো মৌলানা কাইউম।

মুশাররফ মালিক চিৎকার করে বললো, 'আপনারা সবাই কায়সার আজিজের দালাল! আমি আবারও বলছি, জাহাজটা আক্রমণ করা হোক, দুনিয়া দেখুক আমরা কতোটা শক্তি রাখি।' যদিও মারমুখো তরুণের কথায় কান দিলো না কেউ।

'আপনি বুঝতে পারছেন না, জনাব কামাল?' আবেদনের সুরে বললো কর্নেল ইয়াজদানী। 'পান্টা ডেল এস্টে-র সিকিউরিটি পেনিট্রেট করা প্রায় অসম্ভব। চারদিকে গিজগিজ করবে উরুগুয়ের পেট্রল বোট। প্রত্যেকটি জাহাজে, যেগুলোয় নেতারা থাকবেন, সশস্ত্র গার্ড থাকবে। আপনি কি সুইসাইড স্কোয়াড পাঠাবার কথা ভাবছেন?'

'আমি কি ভাবছি না ভাবছি সব যদি তোমাদেরকে জানাতে পারতাম!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো মোস্তফা কামাল। 'আল্লাহর গোপন ইচ্ছে জানার এই হলো বিপদ, মন খুলে সব কথা বলা যায় না। শুধু এইটুকু তোমাদেরকে জানাই, একটা বিশেষ উৎস থেকে সাহায্যের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে আমাকে।' আল দাউদের দিকে ফিরলো সে। 'তুমি, দাউদ, আণ্ডারকাভার অপারেশন সম্পর্কে একজন এক্সপার্ট। কারো চোখে ধরা না পড়ে আমাদের সেরা যোদ্ধাদের একটা দলকে যদি লেডি মেরিয়েটা-য় তুলে দেয়া সম্ভব হয়, তারা কি জাহাজটা দখল করতে পারবে, দখল করার পর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে, যতোক্ষণ না আমরা মিশরকে ইসলামিক রিপাবলিক বলে ঘোষণা করি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো আল দাউদ, এখনো তাকিয়ে আছে ম্যাপে সাঁটা লেডি মেরিয়েটার দিকে। তার গলা শান্ত, তবে বিশ্বাসে দৃঢ়। 'দরকার হবে দশজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা আর পাঁচজন অভিজ্ঞ নাবিক। যদি বিস্ময়ের ধাক্কা দিতে পারা যায়, কোনো রক্তপাত ঘটবে না।'

মোস্তফা কামালের চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। 'জানতাম! জানতাম, তোমার ওপর ভরসা করা যায়।'

'অসম্ভব!' প্রতিবাদ জানালো কর্নেল নাগিব। 'সন্দেহ না জাগিয়ে উরুগুয়েতে এতোগুলো লোককে তুমি পাচারই করতে পারবে না। আর যদি জাদু দেখিয়ে জাহাজটা তুমি দখল করতেও পারো, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমা দুনিয়ার অ্যাসল্ট টিমগুলো খুঁজে বের করে ফেলবে ওটাকে। জিম্মিদের খুন করার হুমকি দিলেও তারা থামবে না।'

'এসো তাহলে বাজি হয়ে যাক,' প্রস্তাব দিলো আল দাউদ। 'আমি দু'হপ্তার জন্যে গায়েব করে দেবো লেডি মেরিয়েটাকে।'

মাথা নাড়লো কর্নেল নাগিব। 'তুমি স্বপ্নের জগতে বাস করছো।'

'কি করে সম্ভব, বলবে আমাদের?' জিজ্ঞেস করলো ফৈয়াজ সিদ্দিকী। 'উরুগুয়ে সরকার যে কড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থা করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রহরার দায়িত্ব নেবে উরুগুয়ে সেনাবাহিনীর কমাণ্ডো ইউনিট। তারা অভিজ্ঞ, তাই না? কিভাবে তুমি তাদের সাথে লড়ে জিততে চাও?'

'কে বললো আমি লড়তে চাই, লড়ে জিততে চাই?' মুচকি হেসে পাল্টা প্রশ্ন করলো আল দাউদ।

'একি পাগলামি!' বললো মোস্তফা, বিব্রত বোধ করছে।

'পাগলামি নয়,' আশ্বস্ত করলো দাউদ। 'কৌশল জানা থাকলে পানির মতো সহজ।'

'কৌশল?'

'অবশ্যই,' আবার ঠোঁট টিপে হাসলো দাউদ। 'বুঝতেই পারছেন, আমার প্ল্যান হলো—লেডি মেরিয়েটাকে, তার ক্রু ও প্যাসেঞ্জারসহ,

গায়েব করে দেয়া। যে জিনিস গায়েব হয়ে গেছে, সেটা আর কেউ কখনো খুঁজে পায়?'

'আমার এটা আনঅফিশিয়াল ভিজিট,' উম্মে সালিহাকে বললেন বিল হ্যারিংটন, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের স্কি লজের সিটিংরুমে ঢুকলেন ওঁরা। 'সবাই জানে এই মুহূর্তে কী ওয়েস্টে মাছ ধরছি আমি।'

'বুঝতে পারছি,' উম্মে সালিহা বললেন। 'কুক আর সিকিউরিটি গার্ডদের সাথে কতো আর কথা বলা যায়, আপনি আসায় আমি খুশি হয়েছি।' আইসল্যাণ্ডে তৈরি খয়েরি রঙের সোয়েটার জ্যাকেট আর ম্যাচ করা প্যান্ট পরে বিল হ্যারিংটনকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তিনি, বিল হ্যারিংটন যেমন স্মরণ করতে পারেন তারচেয়ে অনেক কম লাগলো বয়স।

পরনে বিজনেস স্যুট, তার সাথে পায়ে ছুঁচালো ডগার জুতো আর হাতে অ্যাটাচী কেস থাকায়, স্কি রিসর্ট-এ কেমন যেন বেমানান লাগছে ভদ্রলোককে। 'আপনার নিরাপদ সময়টা আরো সহনীয় করার জন্যে আমার যদি কিছু করার থাকে, মিস উম্মে সালিহা...।'

'না, ধন্যবাদ। কোনো কাজে হাত দিতে পারছি না, এটাই অস্থির করে তুলেছে আমাকে।'

'আর তো মাত্র ক'টা দিন।'

'আপনাকে কিন্তু মোটেও আশা করিনি,' দাঁড়িয়ে পড়লেন উম্মে সালিহা, সরাসরি তাকালেন বিল হ্যারিংটনের দিকে।

'মিশরের স্বার্থ আছে এমন একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাই আপনার সাথে। আমাদের প্রেসিডেন্ট ভাবছেন, সব কথা আপনাকে

জানানো দরকার।'

ইঙ্গিতে একটা সোফা দেখিয়ে নিজেও বসলেন উম্মে সালিহা। চোখে প্রশ্ন, নির্লিপ্ত চেহারা।

'আপনার সহযোগিতা পেলে তিনি ভারি কৃতজ্ঞ বোধ করবেন।'

'কোন্ ব্যাপারে ?'

সোফায় বসে হাঁটুর ওপর রেখে অ্যাটাচী কেসটা খুললেন বিল হ্যারিংটন, ভেতর থেকে একটা ফোল্ডার বের করে বাড়িয়ে দিলেন উম্মে সালিহার দিকে। বেয়ারা চা দিয়ে গেল।

ফোল্ডারের শেষ পাতাটি পড়া শেষ করে মুখ তুললেন উম্মে সালিহা। তাঁর চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। 'এটা কি এখন পাবলিক নিউজ ?'

মাথা ঝাঁকালেন বিল হ্যারিংটন। 'আজ বিকেলে ঘোষণা করা হবে যে জাহাজটা পাওয়া গেছে। তবে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর কথাটা গোপন রাখা হচ্ছে।'

জানালা দিয়ে বাইরে, দূরে তাকালেন উম্মে সালিহা। 'ষোলো শো বছর আগে আমাদের লাইব্রেরী হারানো আর আজ আপনাদের ওয়াশিংটন আর্কাইভ ও ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি পুড়িয়ে দেয়া, দুটো প্রায় সমার্থক, তাই না ?'

মাথা ঝাঁকালেন বিল হ্যারিংটন। 'সমার্থক।'

'প্রাচীন বইগুলো উদ্ধার পাবার কোনো আশা আছে ?'

'এখনো আমরা জানি না। মোম ট্যাবলেটগুলো অস্পষ্ট কিছু সূত্র দিতে পারছে মাত্র। আইসল্যাণ্ড আর দক্ষিণ আফ্রিকার মাঝখানে যে-কোনো জায়গায় লাইব্রেরীটা থাকতে পারে।'

'তবে আপনারা খুঁজে দেখতে চাইছেন,' বললেন উম্মে সালিহা,

আগ্রহের সাথে সিধে হয়ে বসলেন তিনি। .ন আমি প্ল্যান দিলো।

'হ্যাঁ, একটা টিম গঠন করা হয়েছে, কাজ আর ভ্যানটাকে

'আর কে জানে?' ...তে পার... সবচেয়ে

'প্রেসিডেন্ট, আমি, টিমের লোকজন, সরকারী দু'চার...

আমাদের এক কি দু'জন বিশ্বস্ত বন্ধু।' ...শ

'আমাদের প্রেসিডেন্টকে না জানিয়ে আমাকে জানানোর কথা ভাবলেন কেন?'

সোফা ছেড়ে কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেন বিল হ্যারিংটন, তারপর উম্মে সালিহার দিকে ফিরলেন। 'প্রেসিডেন্ট ইসমাইল অদূর ভবিষ্যতে ক্ষমতায় না-ও থাকতে পারেন। তাঁকে জানানোর চেষ্টা করা হলে তথ্যটা ভুল লোকের হাতে পৌঁছে যেতে পারে।'

'মোস্তফা কামাল।'

'সত্যি কথা বলতে কি, হ্যাঁ।'

'কিন্তু পরে হলেও মোস্তফা কামালকে তথ্যটা আপনারা জানাবেন। লাইব্রেরীর খোঁজ পাওয়া গেলে সেটা মিশরকে ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানাবে সে। প্রতিটি মিশরবাসীর দাবি হবে সেটা। আমিও তাই চাইবো।'

'ব্যাপারটা আমরা বুঝি,' বললেন বিল হ্যারিংটন। 'সে-ব্যাপারে কথা বলার জন্যেই আপনার কাছে আমার আসা। আমাদের প্রেসিডেন্ট চান, আপনার ভাষণে আবিষ্কারের কথাটা আপনি ঘোষণা করুন।'

কঠোর হলো উম্মে সালিহার দৃষ্টি। 'তাতে কি লাভ?'

'আমরা চাইছি আবিষ্কারটা যেন আপনাদের বর্তমান প্রেসিডেন্টের পক্ষে জনমত তৈরিতে সাহায্য করে। মিশরকে কয়েক শো বিলিয়ন

জানানো দরকার।' ক্সা উপহার দিতে পারে আলেকজান্দ্রিয়া
ইঙ্গিতে একটা সো

চোখে প্রশ্ন, নির্লিপ্ত উম্মে সালিহার চেহারা। 'খোঁজ পেতে যেখানে 'বছর' লাগতে পারে, সেখানে কি করে আপনারা আশা করেন ...বাসীকে আমি বলবো, দাঁড়াও, তোমাদের সুদিন এসে গেছে, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর বদৌলতে তোমরা ধনী হয়ে গেছো? মিঃ হ্যারিংটন, মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে অনেক বাজে খেলা খেলেছেন আপনারা, এটাও সেরকম একটা নোংরা খেলা। মিশরবাসীকে মিথ্যে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে আমাকে আপনারা ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন, এতোটা আশা করে বসে আছেন?'

ধীরে ধীরে ফিরে এসে সোফায় আবার বসলেন বিল হ্যারিংটন। কোনো প্রতিবাদ করলেন না।

'আপনি ভুল করেছেন, মিঃ হ্যারিংটন। আমি আমার সরকারের পতন দেখবো, মোস্তফা কামালের পাঠানো খুনীদের হাতে মারা যাবার ঝুঁকি নেবো, কিন্তু দেশবাসীকে মিথ্যে তথ্য সরবরাহ করতে পারবো না।'

'মহৎ ভাবাবেগ,' শান্তকণ্ঠে বললেন বিল হ্যারিংটন। 'আপনার নীতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রকাশ করছি। তবে, এখনো আমার বিশ্বাস, প্ল্যানটা সব দিক থেকে ভালো।'

'দেশের কাছে আমি মিথ্যেবাদিনী হয়ে যাবো, বুঝতে পারছেন না? শেষ পর্যন্ত যদি লাইব্রেরীটার সন্ধান পাওয়া না যায়? পাওয়া না গেলে আপনারাও দুর্নামের ভাগীদার হবেন। এমনিতেও আপনাদের মধ্যপ্রাচ্য নীতি···।'

একটা হাত তুলে বাধা দিলেন বিল হ্যারিংটন। 'হ্যাঁ, কিছু ভুল

আমরা করেছি। কিন্তু, মিস সালিহা, এখানে আমি মধ্যপ্রাচ্য নীতি নিয়ে কথা বলতে আসিনি।'

'দুঃখিত। আপনাকে আমি কোনো সাহায্য করতে পার

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিল হ্যারিংটন বললেন, 'বেশ। প্রেসিডেন্টকে নার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানাবো আমি। তিনি যে ভীষণ হতাশ হবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' অ্যাটাচী কেস হাতে নিয়ে সোফা ছাড়লেন তিনি, দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

'দাঁড়ান!' তীক্ষ্ণ আদেশের সুরে বললেন জাতিসংঘ মহাসচিব।

দাঁড়ালেন বিল হ্যারিংটন, ধীরে ধীরে ঘুরলেন। 'প্লিজ?'

সোফা ছেড়ে দাঁড়ালেন উম্মে সালিহা, কিন্তু এগিয়ে এলেন না। 'প্রমাণ করুন, লাইব্রেরীর সন্ধান পাবার মতো পজিটিভ সূত্র আপনাদের হাতে আছে, হোয়াইট হাউসের অনুরোধ রক্ষা করবো আমি। সূত্রগুলো নির্ভেজাল কিনা সেটা আমি নিজে বুঝবো।'

'ভাষণে উল্লেখ করবেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ভাষণের আর মাত্র চারদিন বাকি। এতো অল্প সময়ে...।'

'ওটাই আমার শর্ত।'

গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকালেন বিল হ্যারিংটন। 'ঠিক আছে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে হন হন করে এগোলেন তিনি।

বিল হ্যারিংটনের গাড়িটা প্রাইভেট রোড থেকে হাইওয়ে নাইনে বেরিয়ে এলো। গাড়ি বা আরোহীকে চিনতে না পারলেও, এই প্রাইভেট রোড ধরে খানিকদূর গেলেই যে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের লজ দেখা যাবে তা ভালো করেই জানে আবু সুফিয়ান। মাসি-

জানানো দরকা ল স্কি শহর ব্রেকেনরিজ-এর দিকে।

ইঙ্গিতে এক যে সরকারী গাড়ি, বুঝতে পারলো আবু সুফিয়ান। চোখে প... ডের ওপর সশস্ত্র লোকজন হাঁটাচলা করছে, মাঝে মধ্যে ...ছে রেডিও ট্র্যান্সমিটারে, রাস্তার মুখেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ডজ ভ্যান। এসব দেখে আবু সুফিয়ানের বুঝতে বাকি থাকলো না, ওয়াশিংটন থেকে মোস্তফা কামালের এজেন্টরা যে তথ্য সংগ্রহ করেছে তা মিথ্যে নয়।

একটা মার্সিডিজ-বেঞ্জ ডিজেল সিডানের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আবু সুফিয়ান, গাড়ির ভেতর বসা লোকটাকে আড়াল করে রেখেছে সে, চোখে বিনোকিউলার নিয়ে খোলা জানালা দিয়ে প্রাই-ভেট রোডটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে লোকটা। গাড়ির ছাদে একটা র‍্যাক, তাতে কয়েক সেট স্কি। আবু সুফিয়ানের পরনে সাদা স্কি স্যুট, মুখেও সে একটা স্কি মাস্ক পরেছে। স্কি র‍্যাক অ্যাডজাস্ট করার ছলে আরেক দিকে মুখ ফেরালো সে, জিজ্ঞেস করলো, 'দেখা হলো?'

'আর এক মিনিট,' বললো লোকটা। লজটা দেখছে সে, গাছের ফাঁক দিয়ে কোনো রকমে দেখা যাচ্ছে। লোকটার মুখ ভর্তি দাড়ি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল।

'তাড়াতাড়ি করো, ঠাণ্ডায় কাঁপ ধরে যাচ্ছে। কি রকম বুঝছো?'

'সব মিলিয়ে মাত্র পাঁচজন গার্ড। তিনজন বাড়ির ভেতর, দু'জন গাড়িতে। মাত্র একজন লোক বাড়িটাকে ঘিরে চক্কর দিয়ে আসছে ত্রিশ মিনিট পরপর। ঠাণ্ডা বলে কেউই বেশিক্ষণ বাইরে থাকছে না। তুষারের ওপর দিয়ে প্রতিবার একই পথ ধরে টহল দিচ্ছে ওরা। টিভি ক্যামেরার কোনো চিহ্ন দেখছি না। তবে, ভ্যানের ভেতর থাকতে পারে একটা, বাড়ির ভেতর নজর রাখছে।'

'হামলাটা করা হবে দু'দিক থেকে,' আবু সুফিয়ান প্ল্যান দিলো। 'একদল বাড়িটা দখল করবে, দ্বিতীয় দলটা টহল গার্ড আর ভ্যানটাকে সামলাবে—হামলা হবে পিছন থেকে, যেদিক থেকে বিপদের সবচেয়ে কম সম্ভাবনা।'

'আপনি কি আজ রাতেই হামলা করার চিন্তা করছেন?' চোখ থেকে বিনোকিউলার নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো লোকটা।

'না, কাল। সকালে যখন আমেরিকান শুয়োরগুলো নাস্তা খাবে।'

'কিন্তু দিনের বেলা···বিপদ হতে পারে।'

'আমরা কাপুরুষ নই যে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কাজ সারবো,' রেগে গেল আবু সুফিয়ান।

'কিন্তু এয়ারপোর্টে ফেরার সময় শহরের মাঝখান দিয়ে যেতে হবে,' প্রতিবাদ জানালো লোকটা। 'ট্রাফিক আর কয়েকশো ক্ষিয়ার থাকবে রাস্তায়। এ-ধরনের অহেতুক ঝুঁকি নিতে রাজি হবেন না আল দাউদ।'

চরকির মতো আধপাক ঘুরে ঠাস করে লোকটার গালে চড় কষালো আবু সুফিয়ান। 'এখানে নেতৃত্ব দিচ্ছি আমি!' চাপা গলায় গর্জে উঠলো সে। 'আমার সামনে ফের যদি তার নাম মুখে এনেছো তো খুন করে ফেলবো! তার মাতব্বরি করার দিন শেষ হয়ে গেছে!'

লোকটা ভয়ও পেলো না, নতও হলো না। তার কালো চোখে ঘৃণা ফুটে উঠলো। 'আপনি আমাদের সবাইকে খুন করবেন!' শান্তভাবে বললো সে।

'বিনিময়ে যদি উম্মে সালিহা খুন হয়, তাতেও আমার আপত্তি নেই!' হিস হিস করে বললো আবু সুফিয়ান।

পনেরো

ব্রেকেনরিজ শহরের এক পাশে গ্যারেজটা, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সবগুলো সংগ্রহ এখানেই রাখা হয়। কেয়ারটেকার লোকটা রানার পরিচিত।

গাড়িটা দর্শনীয় বটে। উনিশশো ত্রিশ সালে তৈরি, এল-টোয়েনটি-নাইন কর্ড টাউন কার—শোফারের জন্যে গাড়ির সামনের অংশটা খোলা। রক্তবর্ণ শরীর, ফেণ্ডার হালকা হলুদ, প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টের ওপর চামড়ার তৈরি ছাদও তাই। গাড়িটা লম্বা, সুন্দর অভিজাত চেহারা, ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ। আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ মিটার লম্বা রানার কার্ড। প্রায় অর্ধেকটাই হুড দিয়ে ঢাকা, শুরু হয়েছে রেস-কার-টাইপ গ্রিল দিয়ে আর শেষ হয়েছে সরু উইণ্ড শীল্ড দিয়ে।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে কর্ডে চেপে বসলো ওরা তিনজন। রানা ড্রাইভিং সিটে, ছাদের নিচে প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টে জেনিথকে নিয়ে নেলসন। ইন্টারস্টেট সেভেনটি-তে বেরিয়ে এলো অ্যান্টিক কার কর্ড। তুষার ঢাকা রকি পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে ওরা। হুড ফেলে নিজেকে

ঢাকলো না রানা, মুখে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা ভালো লাগছে। আট সিলিণ্ডার এঞ্জিনের আওয়াজ শুনছে ও, শুনছে এগজস্টের শব্দ। মেরা-মত করার পর কোথাও কোনো ত্রুটি নেই। মনটা খুশি হয়ে উঠলো ওর। জানে না অদূর ভবিষ্যতে কি অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

হোটেলে পৌঁছে রিসেপশন থেকে ছুটো মেসেজ পেলো রানা। পড়ে পকেটে রেখে দিলো। 'ডঃ ক্লাইভ ফোরম্যান তাঁর বাড়িতে ডিনার খাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রাস্তার ওপারেই তাঁর বাড়ি।'

'কখন ?' পেটে হাত বুলিয়ে আগ্রহের সাথে জানতে চাইলো নেলসন।

'সাড়ে সাতটায়।'

হাতঘড়িতে চোখ বুলালো জেনিথ। 'শাওয়ার নিয়ে চুল ঠিক করতে মাত্র চল্লিশ মিনিট সময় পাচ্ছি, আমি বরং কামরায় ঢুকি।'

পোর্টারের পিছু নিয়ে জেনিথ চলে যাবার সাথে সাথে নেলসনকে সাথে আসার ইঙ্গিত দিয়ে ককটেল লাউঞ্জে চলে এলো রানা। বার-মেইড অর্ডার নিয়ে সরে যাবার পর পকেট থেকে দ্বিতীয় মেসেজটা বের করে নেলসনের হাতে ধরিয়ে দিলো।

নেলসন নিচু গলায় পড়লো, 'তোমাদের লাইব্রেরী প্রজেক্ট টপ প্রায়োরিটি পেয়ে গেছে। আগামী চারদিনের মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ার ঠিকানা খুঁজে বের করাটা অত্যন্ত জরুরী। লাক, অ্যাডমিরাল হ্যামিল-টন।' মুখ তুলে রানার দিকে তাকালো সে। 'পড়তে ভুল করিনি তো ? মাত্র চারদিনের মধ্যে ? স্কি করার কথা ভুলে যাও।'

'ব্যস্ত হয়ে কি লাভ ?' বললো রানা। 'মারলিনের ভাগ্যে শিকে না ছেঁড়া পর্যন্ত আমাদের কিছু করার নেই।' চেয়ার ছাড়লো ও। 'তার একটা খবর নেয়া দরকার।'

হোটেলের লবি থেকে ফোন করলো রানা। 'মারলিন, রানা বলছি। কতোদূর এগোলে?'

'এগোচ্ছি।'

'কিছু পেলে?'

'কয়েকটা কমপিউটর কাজ করছে, ব্যাংকগুলোর জিওলজিকাল ডাটা, ক্যাসাব্লাঙ্কা থেকে জাঞ্জিবার পর্যন্ত, তন্নতন্ন করে যাচাই করা হচ্ছে। আফ্রিকা উপকূলে এমন কোনো স্পট নেই যা তোমার নক্সার সাথে মেলে। তিনটে অস্পষ্ট বা ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিলো, কিন্তু পরে আমি সেগুলোও বাতিল করে দিয়েছি। ষোলো শো বছরে ল্যাণ্ড-মাস ট্রান্সফরমেশন অবশ্যই ঘটেছে, সম্ভাবনাগুলোর সাথে তার হিসেব ধরলে কোনো মিলই আর পাওয়া যায় না।'

'তোমার পরবর্তী পদক্ষেপ?'

'উত্তর দিকে সার্চ করবো। সময় আরো বেশি লাগবে। কারণ ব্রিটিশ দ্বীপগুলো ছাড়াও বাল্টিক সী আর সাইবেরিয়া পর্যন্ত স্ক্যাণ্ডিনে-ভিয়ান দেশগুলোর উপকূল রেখা ধরে কাজ করতে হবে আমাকে।'

'চারদিনের মধ্যে শেষ করতে পারবে?'

'তুমি তাগাদা দিলে ভাড়াটে কর্মীদের সংখ্যা বাড়াতে পারি।'

'তাগাদা খুব জোরালো বলে ধরে নাও। আর্জেণ্ট প্রায়োরিটি।'

'ঠিক আছে, সাধ্যমতো চেষ্টা করবো।'

'ব্রেকেনরিজ, কলোরাডোয় রয়েছি আমরা। যদি কিছু পাও, হিল-টনে খবর দেবে।' মারলিনকে রুম আর ফোন নম্বর দিলো রানা। 'ভালো কথা, তোমাকে এতো খুশি লাগছে কেন?'

'নদীটা কোথায় এখনো তা আমি জানি না,' জবাব দিলো হেনরি মারলিন, 'কিন্তু জানি কোথায় সেটা নেই।'

*

হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরোলো ওরা, সাদা পাউডারের মতো তুষারে ঢাকা পড়ে গেল জামা-কাপড়। বিশতলা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ছয়তলায় থাকেন ডঃ ক্লাইভ ফোরম্যান। দরজা খুলে দিয়ে এমন আন্তরিকতার সাথে ওদেরকে তিনি অভ্যর্থনা জানালেন যেন কতো বছরের পরিচয়। সিটিংরুমে, আগুনের চারপাশে বসালেন ওদেরকে। 'নিজে রান্না করতে শিখিনি, রেস্তোরাঁ থেকে দিয়ে যায়—আজ আট-টার সময় দেবে। তার আগে একটু গরম হয়ে নাও, বাছারা!' তিনি নিজেই সবার হাতে হুইস্কির গ্লাস ধরিয়ে দিলেন। রানা নিজেদের পরিচয় দিতে গেল, তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'সবাইকে চিনি, রাহাত আমাকে তোমাদের বর্ণনা পাঠিয়েছে।'

'বস বলছিলেন আপনি নাকি সারা জীবন ধরে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর ওপর গবেষণা করছেন।'

ছোটোখাটো মানুষটা, মোটা সোয়েটার আর ট্রাউজার পরে আছেন, দাড়ি আর গোঁফে ঢাকা পরে আছে ছোট্ট মুখটা। সলজ্জভাবে একটু হাসলেন তিনি। 'বত্রিশ বছর। ধুলো ঢাকা বুকশেলফ আর প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে শুধু চোখ নষ্ট করেছি, বোধহয় বিয়ে করে সংসারী হলেই ভালো করতাম। তবে, সাবজেক্টটা আমার কাছে রক্ষিতার মতো —কখনো কিছু চায় না, শুধু দেয়। আমি যে তার প্রেমে পড়ে গেছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন প্রৌঢ় ইতি-হাসবেত্তা। তারপর জেনিথের দিকে ফিরে বললেন, 'একজন আর্কিও-লজিস্ট হিসেবে তুমি আমার অনুভূতি বুঝতে পারবে।'

'লাইব্রেরীটা সম্পর্কে বলবেন আমাদের, প্লিজ?' অনুরোধ জানালো নেলসন।

ফায়ারপ্লেসের আগুনটা উসকে দিয়ে এলেন ডঃ ফোরম্যান। 'প্রাচীন দুনিয়ার একটা বিস্ময় ছিলো আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী। গোটা সভ্যতার সমস্ত দলিল-পত্র আর নমুনা ওখানে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল।' আধবোজা চোখে বলে গেলেন তিনি, যেন তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। 'গ্রীক ঈজিপশিয়ান আর রোমানদের মহৎ শিল্প আর সাহিত্য, ইহুদিদের পবিত্র বাণী, প্রাচীন দুনিয়ার সেরা মেধাসম্পন্ন মনীষীদের জ্ঞান আর কীর্তি, দর্শনের বিস্ময়কর তত্ত্ব, সুর আর সঙ্গীতের অপূর্ব সব আবিষ্কার, প্রাচীন বেস্টসেলার, বিজ্ঞান আর মেডিসিনের যুগান্তকারী সব কৃতিত্ব, কী না জমা ছিল লাইব্রেরীটায়।'

'ওটা কি সাধারণ মানুষের জন্যে খোলা থাকতো?'

'মূর্খ বা ভিখিরীদের অবশ্যই প্রবেশাধিকার ছিলো না,' বললেন ডঃ ফোরম্যান। 'তবে গবেষক আর পণ্ডিতরা নিয়মিত যেতেন লাইব্রেরীতে—পরীক্ষা, যাচাই, অনুবাদ, সংশোধন করতেন তাঁরা; ক্যাটালগ তৈরি করতেন। শুধু সংগ্রহশালা বললে ভুল হবে, ওটা ছিলো দুনিয়ার প্রথম রেফারেন্স লাইব্রেরী। প্রতিটি আইটেম ক্যাটালগে তোলা ছিলো, সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো রাখা হতো।

'পরবর্তী সম্রাটরা এবং বহু জাতি আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছে। প্রাচীন যুগে আর কোনো প্রতিষ্ঠানে এতো জ্ঞান-সম্পদ ছিলো না। প্লিনী, প্রখ্যাত রোমান পণ্ডিত, প্রথম খ্রিস্টাব্দে এনসাইক্লোপিডিয়া রচনা করেন। অ্যারিসটোফানেস, খ্রিস্টের জন্মের দুশো বছর আগে লাইব্রেরীর প্রধান ছিলেন—তোমরা জানো, তিনিই প্রথম অভিধান রচনা করেন। ক্যালিম্যাচাস গ্রীক ট্র্যাজেডির বিখ্যাত লেখক, সবার আগে রচনা করেন হু'জ হু। পণ্ডিত, অংকশাস্ত্রবিদ ইউক্লিড জ্যামিতির ওপর প্রমথ টেক্সটবুক লেখেন। সুষ্ঠু-

ভাবে সাজিয়ে ব্যাকরণের নিয়মকানুন প্রথম প্রকাশ করেন ডাইয়োনাই-সিয়াস। "আর্ট অভ গ্রামার" তাঁর একটা মহৎ সৃষ্টি, প্রায় সব ভাষার জন্যে ওটা একটা মডেল হয়ে ওঠে। এই সব মনীষীরা, আরো হাজার হাজার পণ্ডিতদের সাথে বসে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীতে কাজ করেছেন।'

'আপনি যেন একটা ইউনিভার্সিটির বর্ণনা দিচ্ছেন,' মন্তব্য করলো রানা।

'ইউনিভার্সিটিই তো ছিলো সেটা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-ভাণ্ডার। তখনকার দিনে লাইব্রেরী আর মিউজিয়ামটাকে এক করে বলাও হতো তাই—হেলেনিস্টিক দুনিয়ার ইউনিভার্সিটি। সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি বিশাল সব কাঠামোর মধ্যে পিকচার গ্যালারি ছিলো, মূর্তিগুলোর জন্যে ছিলো আলাদা হলঘর, কবিতা পাঠের আসর বসতো থিয়েটার হলে, পণ্ডিতরা জ্ঞানগর্ভ লেকচার দিতেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে। লাইব্রেরীর সাথে ডরমিটরি, ডাইনিং হল, চিড়িয়াখানা আর বোটা-নিক্যাল গার্ডেনও ছিলো। প্রকাণ্ড আকারের দশটা হলঘরে রাখা হতো বই আর পাণ্ডুলিপি। সেগুলোর কয়েক হাজার ছিলো হাতে লেখা, হয় প্যাপিরাসে নয়তো পার্চমেন্টে। লেখার পর সেগুলো গুটিয়ে ব্রোঞ্জ টিউবে ঢুকিয়ে রাখা হতো।'

'দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি?' নেলসনের প্রশ্ন।

'প্যাপিরাস ট্রপিকাল প্ল্যান্ট্। মিশরীয়রা ওটার কাণ্ড থেকে লেখার জন্যে কাগজের মতো এক ধরনের জিনিস তৈরি করতো। পার্চমেন্ট, ভেল্যাম-ও বলা হয়, তৈরি হতো পশুর চামড়া থেকে—হাতি গরু ছাগল বা ভেড়ার বাচ্চার চামড়াই ব্যবহার করা হতো সাধারণত।'

'এতোদিনে ওগুলো নষ্ট হয়ে যাবার কথা নয়?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'প্যাপিরাসের চেয়ে বেশিদিন টেকার কথা পার্চমেন্টের,' বললেন ডঃ ফোরম্যান। রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'ষোলো শো বছর পর ওগুলোর অবস্থা কি হয়েছে নির্ভর করে কোথায় রাখা হয়েছে তার ওপর। মিশরীয় সমাধি থেকে পাওয়া তিন হাজার বছরের পুরনো প্যাপিরাসের লেখাও তো পড়া গেছে।'

'গরম আর শুকনো আবহাওয়া।'

'হ্যাঁ।'

'ধরুন, সুইডেন বা রাশিয়ার উত্তর উপকূলে কোথাও আছে ওগুলো।'

চিন্তিতভাবে মাথা নিচু করলেন ডঃ ফোরম্যান। 'শীত ওগুলোকে সংরক্ষণ করবে, কিন্তু গরমের দিনে পচে যেতে পারে।'

লাইব্রেরীটাকে অক্ষত খুঁজে পাবার সম্ভাবনা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে বুঝতে পেরে মন খারাপ হয়ে গেল রানার। কিন্তু জেনিথ ওর মতো হতাশ নয়। সে কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি যদি জুনিয়াস ভেনাটর হতেন, ডঃ ফোরম্যান, কি ধরনের বই আপনি রক্ষা করতে চাইতেন?'

'কঠিন প্রশ্ন,' চোখ পিট পিট করে জেনিথের দিকে ফিরলেন ডঃ ক্লাইভ ফোরম্যান। 'আমি শুধু আন্দাজ করতে পারি। সোফোক্লিস, ইউরিপেডিস, অ্যারিস্টটল আর প্লেটো-র সমগ্র রচনা তো থাকবেই। আরো থাকবে, অবশ্যই, হোমার। তিনি বই লিখেছেন চব্বিশটা, কিন্তু অল্প দু'চারটে হাতে পেয়েছি আমরা। আমার ধারণা, গ্রীক, ঐট্রুস্কান, রোমান ও ঈজিপশিয়ান মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার ভলিউম

ইতিহাস অবশ্যই সাথে নিয়েছিলেন ভেনাটর, কারণ জাহাজের সংখ্যা তো আর কম ছিলো না। ঈজিপশিয়ান বইগুলো অত্যন্ত মূল্যবান হবে, কারণ ওগুলো শুধু আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীতে ছিলো বলে প্রাচীন মিশরের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই আমরা জানতে পারিনি। এট্রুসক্যান সভ্যতা সম্পর্কেও প্রায় কিছুই আমরা জানি না অথচ ক্লডিয়াস তাঁদেরকে নিয়ে বড়সড় একটা ইতিহাস লিখেছিলেন—সেটাও নিশ্চয়ই লাইব্রেরীর কোনো শেলফে আছে। ভেনাটরের জায়গায় আমি হলে হিব্রু আর খ্রিস্টান আইন ও ঐতিহ্য সম্পর্কে লেখাগুলোও সাথে নিতাম। ওগুলোয় হয়তো এমন সব তথ্য ও উপাদান আছে যা আজকের খ্রিস্টান ধর্মের পণ্ডিতদের বেকায়দায় ফেলে দিতো।'

'বিজ্ঞান?'

'বিজ্ঞানের ওপর অসংখ্য বই লেখা হয়েছে সে-যুগে। ভেনাটর সেগুলো না নিয়ে পারেন না।'

'ভুলে যেয়ো না,' বললো জেনিথ, 'সে-যুগে রান্নার ওপরও অনেক বই লেখা হয়েছে।'

হেসে উঠলেন ডঃ ফোরম্যান। 'ভেনাটর অত্যন্ত বিবেচক ও বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন, জ্ঞানের কোনো শাখাই তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি। শুধু রান্নাবান্না কেন, দৈনন্দিন প্রয়োজনের ওপর বা ঘর-গেরস্থালির ওপর লেখা বইও তিনি জাহাজে তুলেছিলেন বলে ধরে নেয়া যায়। সবার জন্যেই কিছু না কিছু নিয়েছিলেন তিনি।'

'বিশেষ করে প্রাচীন জিওলজিকাল ডাটা,' বললো রানা।

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, এ-কথা কি জানা গেছে, মানুষটা কেমন ছিলেন তিনি?'

জেনিথের প্রশ্ন।

'ভেনাটর?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁর যুগে তিনি সেরা বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম ছিলেন। এথেন্সে পণ্ডিত বলে খ্যাতি ছিলো তাঁর, সেখানে তিনি শিক্ষকতা করতেন। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী ও মিউজিয়ামের কিউরেটর হিসেবে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয় তাঁকে। আমরা জানি, রাজনীতি আর সামাজিক বিষয় নিয়ে একশোর ওপর বই লিখেছেন তিনি, আজ থেকে চার হাজার বছরের পুরনো পটভূমির সন্ধানও সে-সব বইতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর কোনো বই-ই রক্ষা পায়নি।'

'তাঁর সম্পর্কে আর কি জানেন আপনি?' রানার প্রশ্ন।

'খুব বেশি না। ভেনাটরের অনেক মেধাবী ছাত্র ছিলেন, যাঁরা পরে বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন অ্যানটিওক-এর ডায়োক্লেস। ডায়োক্লেস তাঁর একটা রচনায় ভেনাটরের কথা উল্লেখ করেছেন—তাঁর শিক্ষক নতুন কিছু প্রবর্তন বা আবিষ্কারের প্রতি নিবেদিত ছিলেন, এমন সব বিষয়ে গবেষণা চালাতেন তিনি, অন্যান্য পণ্ডিতরা সে-সব বিষয়ে গবেষণা করতে ভয় পেতেন। যদিও খ্রিস্টান ছিলেন, তবে ধর্মকে তিনি সমাজবিজ্ঞান হিসেবে দেখতেন। আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ থিয়োফিলোস-এর সাথে এই নিয়েই তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। ভেনাটরের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগেন থিয়োফিলোস, রায় দিয়ে বসেন লাইব্রেরী আর মিউজিয়াম পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণার ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করছে। শেষ পর্যন্ত তিনি সম্রাট থিয়োডোসিয়াস-কে লাইব্রেরী আর মিউজিয়াম পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিতে রাজি করান। সম্রাট ছিলেন গোঁড়া খ্রিস্টান। পোড়ানোর সময় খ্রিস্টান আর অখ্রিস্টানদের মধ্যে

তুমুল মারামারি শুরু হয়ে যায়। ধরে নেয়া হয়েছিল, থিয়োফিলোস-এর ফ্যানাটিকাল অনুসারীদের হাতে নিহত হন ভেনাটর।'

'কিন্তু এখন আমরা জানি সংগ্রহের ভালো একটা অংশ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি,' বললো জেনিথ।

'রাস্তার ঝাড়ুদার লটারিতে এক মিলিয়ন ডলার পেলে যেমন খুশি হয়, রাহাতের মুখে গ্রীনল্যাণ্ডে তোমরা কি আবিষ্কার করেছো শুনে আমিও ঠিক সেরকম খুশি হয়েছি।'

'ভেনাটর ওগুলো কোথায় রাখতে পারেন, আপনি কোনো ধারণা দিতে পারেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

দীর্ঘ এক মিনিট চুপ করে থাকলেন ডঃ ফোরম্যান। তারপর শান্ত গলায় তিনি বললেন, 'জুনিয়াস ভেনাটর সাধারণ একজন মানুষ ছিলেন না। তিনি তাঁর নিজের পথ অনুসরণ করছিলেন। জ্ঞানের পাহাড় ছিলো তাঁর হাতে। বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি, অমূল্য সম্পদ ভাবী বংশধর-দের জন্যে সংরক্ষণের ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিই তিনি ব্যবহার করেছেন। ষোলো শো বছর পেরিয়ে যেতে চললো অথচ আজও লাই-ব্রেরীটার কোনো সন্ধান আমরা পাইনি, এ-থেকেই কি প্রমাণ হয় না যে লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি?' পরাজয় স্বীকার করার ভঙ্গিতে হাত দুটো মাথার ওপর তুললেন তিনি। 'আমি কোনো সূত্র দিতে অপারগ। ভেনাটরের বুদ্ধির নাগাল পাওয়া আমার সাধ্যের অতীত।'

'কিন্তু আন্দাজ করতে অসুবিধে কি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে, নৃত্যরত শিখাগুলোর দিকে দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন ডঃ ফোরম্যান। 'আমার ধারণা, ভেনাটর ওগুলো এমন এক জায়গায় রেখেছেন যেখানে খোঁজার কথা

ভাববে না কেউ।'

আবু সুফিয়ানের হাত ঘড়িতে সাতটা আটান্ন মিনিট। একটা ঝোপের আড়ালে শুয়ে, পাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে লজটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। দুটো চিমনির একটা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। উম্মে সালিহা, সে জানে, সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠেন, রাঁধতেও জানেন ভালো। তার অনুমানটাই ঠিক, গার্ডদের জন্যে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছেন তিনি।

মরুর মানুষ, হিম শীতল ঠাণ্ডা তার সহ্য হচ্ছে না। গোড়ালি ব্যথা করছে, হাত-পায়ের আঙুল দস্তানার ভেতর অসাড় হয়ে যাচ্ছে। হাঁটাচলা করার সুযোগ থাকলে খুশি হতো সে। ধীরে ধীরে ভয়টা বাড়ছে তার, এভাবে তুষারের ওপর পড়ে থাকলে ক্ষিপ্রতা হারাবে সে। অপারেশনটা ভেস্তে যেতে পারে, কোনো উদ্দেশ্য পূরণ না করেই খুন হয়ে যেতে পারে প্রতিপক্ষের হাতে।

এ-সবই আসলে অনভিজ্ঞতার ফল। মিশনের সংকটময় মুহূর্তে অস্থির হয়ে উঠছে সে। হঠাৎ তার সন্দেহ হলো, আমেরিকান গার্ডরা তার উপস্থিতির কথা জেনে ফেলেনি তো? নার্ভাস হয়ে পড়ায় দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার বা উপস্থিত বুদ্ধি খাটাবার ক্ষমতা হারাচ্ছে আবু সুফিয়ান।

সাতটা উনষাট মিনিট। প্রাইভেট রোডে ঢোকার মুখে চট করে একবার তাকালো সে। ভ্যানটা সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। চার ঘণ্টা পরপর পালা বদল, লজ থেকে ভ্যানে আসে দু'জন, ভ্যান থেকে লজে ফিরে যায় অপর দু'জন। সময় ঘনিয়ে এসেছে, লজ থেকে দু'জন, যে-কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে আসবে। লজ থেকে ভ্যানটা

একশো মিটার দূরে।

বাড়ির পাশ ঘেঁষে একজন গার্ড টহল দিচ্ছে। বরফের ওপর দিয়ে ধীরপায়ে হাঁটছে সে। আবু সুফিয়ানের দিকে আসছে লোকটা। নিঃশ্বাস বাষ্প হয়ে যাচ্ছে বেরিয়েই। সতর্ক দৃষ্টি বেমানান কিছু দেখার জন্যে ছটফট করছে।

চারপাশের বৈচিত্র্যহীন দৃশ্য বা হাড় কাঁপানো শীত সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টকে নিস্তেজ করতে পারেনি। দৃষ্টিপথের প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে এগোচ্ছে সে। ডানে বাঁয়ে তাকাচ্ছে। আর এক মিনিটও নেই, তুষারের ওপর আবু সুফিয়ানের পায়ের দাগ দেখতে পাবে সে।

ভাগ্যকে অভিশাপ দিলো আবু সুফিয়ান, নড়েচড়ে তুষারের ভেতর আরো সেঁধিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। ঝোপের আড়ালে থাকলে কি হবে, সরু পাতা আর চিকন ডালের ফাঁক দিয়ে অবশ্যই তাকে দেখতে পাবে লোকটা। ওগুলো বুলেটও ঠেকাতে পারবে না।

কাঁটায় কাঁটায় আটটা বাজলো। সেই সাথে লজের সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো দু'জন লোক। তাদের মাথায় ক্যাপ, গায়ে স্কি কোট। রাস্তা ধরে হেঁটে আসছে তারা, শান্তভাবে কথা বলছে, চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছে তুষার ঢাকা আশপাশ।

পালাবদলের মুহূর্তে ভ্যানে লোক থাকবে চারজন, সুফিয়ানের প্ল্যান ছিলো ঠিক তখনই হামলা করবে তারা। হিসেবে ভুল হয়েছে তার, পজিশনে পৌঁছে গেছে সময়ের আগে। প্রাইভেট রোড ধরে পঞ্চাশ মিটারের মতো এগিয়েছে লোক দু'জন, এই সময় টহলরত গার্ড সুফিয়ানের পায়ের ছাপ দেখতে পেলো।

দাঁড়িয়ে পড়লো সে, ট্র্যান্সমিটার ধরা হাতটা উঠে গেল ঠোঁটের কাছে। ঠোঁট ফাঁকই হলো শুধু, কোনো আওয়াজ বেরুলো না, তার

আগেই সুফিয়ানের হেকলার অ্যাণ্ড কোচ এমপি-ফাইভ সাবমেশিন গানের গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তার গলা।

অনভিজ্ঞ সুফিয়ান অসময়ে অ্যাকশন শুরু করতে বাধ্য হলো। পেশাদার কেউ হলে সাইলেন্সার লাগানো সেমিঅটোমেটিক ব্যবহার করতো, গুলি করতো মাত্র একটা, সেটা লাগতো গার্ডের দুই চোখের ঠিক মাঝখানে। দশ রাউণ্ড গুলি করে গার্ডের গলা আর বুক ঝাঁঝরা করে দিয়েছে সে, আরো বিশ রাউণ্ডের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সামনের বনভূমিতে। তার সঙ্গীদের একজন ব্যস্ততার সাথে ভ্যান লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুঁড়লো একের পর এক, আরেকজন ভ্যানের দু'পাশে এলো-পাতাড়ি গুলি ছুঁড়লো। একটা গ্রেনেড উইণ্ডশীল্ড দিয়ে ভেতরে ঢুকলো, জোরালো আওয়াজের সাথে বিস্ফোরিত হলো সেটা। সিনে-মায় যেমন দেখা যায় তেমন কিছু ঘটলো না, আগুনের কুণ্ডলী নিয়ে বিস্ফোরিত হলো না গ্যাস ট্যাংক। ভ্যানের শরীর ফুলে উঠলো, ফেটে গেল, যেন পাকা একটা ফল।

আরোহীদের দু'জনই সাথে সাথে মারা গেছে।

রক্ততৃষ্ণায় অধীর দুই খুনী, কারো বয়সই বিশের বেশি নয়, বিধ্বস্ত ভ্যানের ওপর বার বার আঘাত হানলো, রাস্তার ওপর যে আরো দু'-জন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট রয়েছে তাদের কথা ভুলে গেছে। ইতি-মধ্যে গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে তারা, কাঁধ থেকে উজি নামিয়ে অব্যর্থ নিশানায় ঘায়েল করলো আনাড়ি দুই টেরোরিস্টকে। ভ্যানের ভেতর সঙ্গী যারা রয়েছে তাদের আর সাহায্য দরকার নেই, বুঝতে পেরে লজের দিকে দ্রুত পিছু হটতে শুরু করলো তারা, একজন সুফিয়ানের সাথে গুলি বিনিময় করছে। কাছেপিঠে একটা বড় পাথর পেয়ে তার আড়ালে কাভার নিয়েছে সুফিয়ান।

সুফিয়ানের প্ল্যানটা মার খেলো আরো একটা কারণে। কথা ছিলো, গুলির শব্দ হবার সাথে সাথে দশজন টেরোরিস্ট লজের পিছনের দরজার দিকে ছুটবে। হাঁটু সমান উঁচু, আলগা তুষার বাধা দিলো তাদেরকে। অনেক দেরি করে ফেললো তারা, লজের ভেতর থেকে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা ঝাঁক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ে ঠেকিয়ে দিলো তাদের।

টেরোরিস্টদের একজন লজের উত্তর দেয়ালের নিচে অল্প সময়ের জন্যে আশ্রয় পেলো। গ্রেনেডের পিন খুলে জানালা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলো সে। জানালার কাঁচ কতোটা পুরু ধারণা করতে পারেনি, ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো গ্রেনেড। বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হবার আগে আতংকে শুধু চেহারাটা বিকৃত করার সময় পেলো সে।

লাফ দিয়ে ধাপ পেরোলো এজেন্ট দু'জন, সদর দরজা দিয়ে স্যাৎ করে ঢুকে পড়লো ভেতরে। বিরামহীন গুলি করছে টেরোরিস্টরা, একজনের পিঠে একটা বুলেট ঢুকলো। পড়ে গেল লোকটা, তার শুধু পা দুটো দোরগোড়ায় দেখা গেল। এক সেকেণ্ড পর টেনে ভেতরে ঢোকানো হলো তাকে, দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

অবিরাম গুলিবর্ষণে সব ক'টা জানালার কাঁচ ভেঙে পড়লো, কিন্তু শক্ত কাঠের দেয়ালগুলোর তেমন কোনো ক্ষতিই হলো না। এজেন্টরা সুফিয়ানের আরো দু'জন লোককে ফেলে দিলো, তবে বাকি সবাই আড়াল নিয়ে এগিয়ে এলো লজের আরো কাছাকাছি। এরপর তারা বিশ মিটার দূর থেকে একের পর এক গ্রেনেড ছুঁড়তে শুরু করলো জানালা লক্ষ্য করে।

লজের ভেতর কারো মুখে কথা নেই। একজন এজেন্ট নির্দয় ধাক্কা দিয়ে উম্মে সালিহাকে ঠাণ্ডা একটা ফায়ারপ্লেসে ঢুকিয়ে দিলো। একটা রাইটিং ডেস্ক টেনে আনছে সে, ইচ্ছে ফায়ারপ্লেসের মুখটা আড়াল

করবে, এই সময় এক ঝাঁক বুলেট ঢুকলো ঘরের ভেতর। দেয়ালে পিছলে তিনটে বুলেট ছুটে এলো, লোকটার শিরদাঁড়া ভেঙে ভেতরে ঢুকলো একটা, বাকি দুটো হৃৎপিণ্ড ফুটো করলো। ডেস্কের আড়ালে বসে কিছুই দেখতে পেলেন না উম্মে সালিহা, তবে কাঠের মেঝেতে পতনের শব্দটা তিনি শুনতে পেলেন।

গ্রেনেডগুলো বিপজ্জনক করে তুললো পরিস্থিতি। কাছ থেকে গ্রেনেডের টুকরো রাইফেল বুলেটের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর। এজেন্টরা অভিজ্ঞ, নিশানাভেদে অব্যর্থ, কিন্তু এ-ধরনের ব্যাপক হামলার জন্যে তারা প্রস্তুত ছিলো না। অ্যামুনিশন শেষ হয়ে এসেছে, হাতে আর মাত্র কয়েকটা ক্লিপ।

সুফিয়ান প্রথম গুলি করার সাথে সাথে ট্র্যান্সমিটারের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া হয়েছে, কিন্তু জরুরী আবেদনটা ডেনভার সিক্রেট সার্ভিস অফিস হয়ে স্থানীয় শেরিফের কাছে পৌঁছতে মাঝখানে অপচয় হয়েছে মূল্যবান কয়েকটা মিনিট।

স্টোররুমে বিস্ফোরিত হলো একটা গ্রেনেড, রঙ ভর্তি বড় একটা টিনের পাত্রে আগুন ধরে গেল। স্নোব্লোয়ারে ভরার জন্য যে গ্যাস ক্যানটা ছিলো, বিস্ফোরিত হলো সেটা। দেখতে দেখতে লজের এক দিকের পুরোটা দেয়ালে আগুন ধরে গেল।

আগুন ভালো করে ছড়াবার সাথে সাথে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেল। চারদিক থেকে বৃত্তটাকে ছোটো করে আনলো টেরোরিস্টরা। তাদের অটোমেটিক রাইফেল প্রতিটি জানালা আর দরজার দিকে তাক করা। আগুনে পুড়ে মরার ভয়ে লজের বাসিন্দারা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে, ধৈর্যের সাথে সেই আশায় অপেক্ষা করছে।

এজেন্টদের মাত্র দু'জন এখনো নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাঙাচোরা, উল্টে পড়া ফার্নিচারের সাথে রক্তাক্ত স্তূপের মতো পড়ে আছে বাকি সবাই। আগুনের শিখা সগর্জনে কিচেন হয়ে পিছন দিককার সিঁড়ি লক্ষ্য করে ছুটলো, ছড়িয়ে পড়লো ওপরতলার বেডরুম-গুলোয়। এরইমধ্যে আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, ফায়ারব্রিগেড ছাড়া আর কারো নেভাবার সাধ্য নেই। নিচের তলায় যারা রয়েছে, মৃত্যুর প্রহর গুণছে সবাই। আর বেশিক্ষণ এখানে তারা টিকতে পারবে না।

শহরের দিক থেকে ভেসে আসা সাইরেনের আওয়াজ উপত্যকায় প্রতিধ্বনি তুললো।

এজেন্টদের একজন ফায়ারপ্লেসের সামনে থেকে উল্টে পড়া ডেস্কটা সরালো। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলেন উম্মে সালিহা। এজেন্টের সাথে ক্রল করে নিচু একটা জানালার দিকে এগোলেন তিনি।

'লোকাল শেরিফের ডেপুটিরা আসছেন,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো এজেন্ট। 'টেরোরিস্টরা ওদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বে। সেই সুযোগে লজ থেকে বেরোবো আমরা। তা না হলে পুড়ে মরতে হবে।'

উম্মে সালিহা শুধু নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাতে পারলেন। কানেও তিনি ভালো শুনতে পাচ্ছেন না। গ্রেনেডগুলোর বিস্ফোরণ তাঁর কানে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। তবে চেহারায় ভয় বা হতাশার চিহ্নমাত্র নেই, শুধু চোখ দুটো ভিজে রয়েছে। তাঁকে রক্ষার জন্যে এজেন্টদের অকাতরে প্রাণ দিতে দেখেছেন তিনি, তাদের জন্যে প্রার্থনা ছাড়া আর কিছু করতে পারেননি। একটা রুমাল দিয়ে চোখ দুটো চেপে ধরলেন, ধোঁয়ায় ভরে আছে ঘরের ভেতরটা।

বাইরে তুষারের ওপর শুয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে আবু সুফিয়ান। গোটা লজ দেখতে দেখতে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো। জানালা দিয়ে ধোঁয়া আর শিখা বেরিয়ে আসছে। কেউ যদি এখনো বেঁচে থাকে,

এখুনি বেরিয়ে না এলে পুড়ে মরতে হবে তাকে।

কিন্তু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার সময় নেই, বুঝতে পারলো সুফিয়ান। লাল আর নীল আলোর ঝলক দেখে টের পেয়ে গেছে সে, পুলিশের গাড়ি হাইওয়েতে পৌঁছে গেছে।

টিমে ছিলো বারোজন, তাকে নিয়ে সাতজন বেঁচে আছে। কেউ আহত হলে তাকে মেরে ফেলতে হবে, আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা যেন ইন্টারোগেট করতে না পারে। সাংকেতিক ভাষায় নিজের লোকদের নির্দেশ দিলো সে। বৃত্ত ভেঙে পিছিয়ে এলো লোক-গুলো, তারপর এন্ট্রান্স রোডের দিকে ছুটলো।

ডেপুটিদের প্রথম দলটা পৌঁছেই লজে ঢোকার রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করলো। একজন রেডিওযোগে রিপোর্ট করছে, অপরজন সতর্ক-তার সাথে দরজা খুলে ভ্যান আর জ্বলন্ত লজটার দিকে তাকালো, শক্ত করে ধরে আছে রিভলভারটা। ওদের কাজ হলো দেখা, রিপোর্ট করা, ব্যাকআপ টিমের জন্যে অপেক্ষায় থাকা।

সশস্ত্র ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে কৌশলটা ভালো। কিন্তু অদৃশ্য টেরো-রিস্টদের একটা বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনো কাজে লাগলো না, কারণ তারা হঠাৎ করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো। পাল্টা আঘাত হানার সুযোগ দেয়া হলো না, তার আগেই ডেপুটি দু'জন গুলি খেয়ে মারা পড়লো।

এজেন্টদের একজন জানালা পথে উঁকি দিয়ে বাইরেটা দেখছে, তার ইঙ্গিতে উম্মে সালিহা নিচু জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে বাইরের তুষারের ওপর পড়লেন। তিনি দাঁড়াবার আগেই এজেন্টরা লাফ দিলো। দু'জন তাঁর দু'পাশে পাঁচিল তৈরি করলো, তাঁর দুটো হাত ধরে ছুটিয়ে নিয়ে চললো কোণাকোণি পথ ধরে হাইওয়ের দিকে।

মাত্র ত্রিশ পা এগিয়েছে ওরা, সুফিয়ানের একজন লোক দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠলো। ছুটন্ত, পলায়নরত মানুষগুলোর চারদিকে বুলেট-বৃষ্টি শুরু হলো। এজেন্টদের একজন আচমকা মাথার ওপর খাড়া করলো হাত দুটো, যেন আকাশটাকে থামচে ধরতে চাইছে। হোঁচট খেয়ে তিন পা এগোলো সে। আছাড় খেলো সটান। সাদা তুষার টকটকে লাল হয়ে উঠলো।

'ও আল্লাহ!' বলে হাহাকার করে উঠলেন উম্মে সালিহা, দাঁড়াবার জন্যে অপর এজেন্টের হাত থেকে কব্জি ছাড়াবার চেষ্টা করলেন।

হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলো লোকটা। 'আপনাকে বাঁচতে হবে! আর সব ভুলে যান! ওরা চেষ্টা করছে আমরা যেন হাইওয়ের দিকে যেতে না পারি।' হাঁপাতে হাঁপাতে, ধমকের সুরে কথা বলছে সে, 'আমি আপনাকে কাভার দেবো, ওদেরকে ঠেকাবো। আপনি একা হাইওয়েতে পৌঁছুতে চেষ্টা করবেন।'

এজেন্টের দিকে তাকিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করলেন উম্মে সালিহা, কিন্তু লোকটা তাঁর কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে দিলো, তারপর পিঠে হাত রেখে ঠেলে দিলো সামনের দিকে। 'দৌড়ান, ফর গডস সেক, দৌড়ান!' আর্তনাদ করে উঠলো সে।

কিন্তু এজেন্ট দেখলো, এরইমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। নিজেদের অজান্তেই হাইওয়েতে পৌঁছুনোর জন্যে ভুল একটা পথ বেছে নিয়েছে তারা। পথের শেষে, রাস্তার কাছাকাছি, জঙ্গলের ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটো মার্সিডিজ বেঞ্জ সেডান। উদ্‌ভ্রান্ত এজেন্ট উপলব্ধি করলো, গাড়িদুটো টেরোরিস্টদের। দিশেহারা বোধ করলেও, লোকটা তার কর্তব্য ভুললো না। টেরোরিস্টরা উম্মে সালিহাকে বাধা দেয়ার জন্যে কোণাকোণি একটা পথ ধরে ছুটে আসছে। ওদেরকে

সে ঠেকাতে পারবে না, জানে। নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে পারলে দেরি করিয়ে দিতে পারবে। সেই সুযোগে, ভাগ্য যদি সহায়তা করে, উম্মে সালিহা রাস্তায় উঠে যেতে পারবেন। ভাগ্য যদি আরেকটু সহায়তা করে, হাইওয়ের কোনো গাড়ি হয়তো তাঁকে দেখে দাঁড়াতে পারে।

মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে টেরোরিস্টদের দিকে সরাসরি ছুটলো এজেন্ট, উজির ট্রিগারে আঙুল, কামানের গোলার মতো মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে অশ্রাব্য খিস্তি।

মুহূর্তের জন্যে সুফিয়ান আর তার দল থমকে গেল, কারণ তাদের মনে হলো খোদ শয়তান ওদেরকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। অবিশ্বাস্য দুটো সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল। তারপর তারা সবাই একযোগে গুলি ছুঁড়লো। অকুতোভয় সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট বুলেটের আঘাতে ছিটকে পড়লো তুষারের ওপর। তবে তার আগে তিনজন শত্রুকে ধরাশায়ী করতে পেরেছে সে।

গাড়ি দুটোকে উম্মে সালিহাও দেখলেন। আরো দেখলেন, টেরোরিস্টরা তাঁর দিকে ছুটে আসছে। পিছন থেকে কান ফাটানো গুলিবর্ষণের আওয়াজ পেলেন তিনি। লম্বা পা ফেলে ছুটছেন, হাঁপাচ্ছেন, হোঁচট খেয়ে ছোটো একটা গর্তের ভেতর আছাড় খেলেন। জগিং করা অনেক দিনের অভ্যেস, লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে আবার ছুটলেন তিনি। দেখলেন সামনেই কালো অ্যাসফল্ট। ছোটার গতি কমালেন না, যদিও জানেন অবধারিত মৃত্যুকে তিনি শুধু দেরি করাতে পারছেন, এড়াতে পারছেন না। নিশ্চিতভাবে জানেন, দু'চার মিনিটের মধ্যে তাঁরও লাশ পড়ে থাকবে এখানে।

ষোলো

ব্রেকেনরিজ থেকে হাইওয়ে ধরে রওনা হলো কর্ড। পুরনো গাড়ি হলে কি হবে, নতুন রঙ করা হয়েছে, সকালের রোদ লেগে চকমক করছে গা। লিফটের দিকে হেঁটে যাচ্ছে স্কিয়ার-রা, ষাট বছরের পুরনো গাড়ি-টাকে দেখে সহাস্যে হাত নাড়লো তারা। ঘেরা অংশে, পিছনের সিটে বসে ঝিমুচ্ছে বেন নেলসন। জেনিথ বসেছে রানার সাথে বাইরে।

ভোরে ঘুম ভেঙেছে রানার ইতস্তত একটা ভাব নিয়ে। ব্রেকেনরিজে এসেছে অথচ স্কি করবে না, তা কি হয়? এর আগে যতোবার এখানে এসেছে ও, তুষার ঢাকা পাহাড় আর প্রান্তরের ওপর ছুটোছুটি করে পাঁচ বা সাতটা করে দিন মহা আনন্দে কাটিয়েছে। এবারের আসাটা অবশ্য কাজ নিয়ে, ডঃ ফোরম্যানের পরামর্শ দরকার ছিলো। তাগাদা দেয়া হয়েছে, দু'চারদিনের ভেতরে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর হদিশ বের করতে হবে। কিন্তু হেনরি মারলিন কোনো সূত্র না দেয়া পর্যন্ত রানার কিছু করার নেই। করার যখন কিছু নেই, স্কি করার সুযোগটা গ্রহণ করা উচিত নয়?

ঘুম থেকে তুলে প্রস্তাবটা দিতে যা দেরি, জেনিথ আর নেলসন লাফিয়ে উঠলো। কোনো রকমে শাওয়ার সেরে, নাকেমুখে ব্রেকফাস্ট গুঁজে বেরিয়ে পড়েছে ওরা, যাচ্ছে স্কি সরঞ্জাম ভাড়া করার জন্যে পরিচিত একটা দোকানে।

'এতো সকালে আতসবাজি পোড়ায় কে ?' হঠাৎ অবাককণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো জেনিথ।

'আতসবাজি নয়,' বললো রানা, গুলিবর্ষণের তীক্ষ্ণ শব্দ আর গ্রেনেড বিস্ফোরণের ভোঁতা প্রতিধ্বনি আগেই ওর কানে গেছে। 'মনে হচ্ছে যেন পদাতিক বাহিনী যুদ্ধে নেমেছে।'

'আওয়াজটা আসছে ওদিকের জঙ্গল থেকে,' একটা হাত তুলে দেখালো জেনিথ। 'রাস্তার ডান দিক থেকে।'

অস্বাভাবিক গম্ভীর রানা, চোখের চারপাশ কুঁচকে উঠলো। গোপন তথ্যটা জানে বটে ও, কিন্তু দরকার না হলে প্রকাশ করবে না। গোলা-গুলির আওয়াজ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের লজের দিক থেকে আসছে। জাতিসংঘের মহাসচিব উম্মে সালিহা সিকিউরিটি কর্ডনের ভেতর আত্মগোপন করে আছেন ওখানে। এ কি বিধাতারই কোনো ইচ্ছে যে হাইওয়ে ধরে ওদিকেই যাচ্ছে ওরা ?

কর্ডের গতি বাড়িয়ে দিলো রানা, ডিভাইডার উইণ্ডোর গায়ে নক করলো। তন্দ্রা ছুটে গেল নেলসনের, সিটের ওপর সিধে হয়ে বসে জানালার কাঁচ সরালো সে। 'শোনো,' বললো রানা।

মুখে ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় চোখ কোঁচকালো নেলসন। কানের পিছনে হাত রাখলো একটা। ধীরে ধীরে বিস্ময় ফুটে উঠলো চেহারায়। 'রাশিয়া ছত্রীসেনা পাঠিয়েছে ?'

'দেখো, দেখো—ওহ্, গড !' চেঁচিয়ে উঠলো জেনিথ। 'জঙ্গলে আগুন

ধরে গেছে।'

গাছপালার মাথার ওপর হঠাৎ ভাসতে দেখা গেল কালো ধোঁয়া, ধোঁয়ার নিচে কমলা রঙের লকলকে শিখা। 'বড় বেশি ঘন, তাই না, ধোঁয়াটা?' মন্তব্য করলো নেলসন, 'আমি বলবো, গাছপালা নয়, নিরেট কোনো কাঠামোয় আগুন ধরেছে—হয় কোনো বাড়ি, নয়তো দোচালায়।'

রানারও তাই ধারণা। স্টিয়ারিং হুইলের ওপর ঘুসি মারলো ও। ধরেই নিয়েছে, আগুনটা অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের লজে লেগেছে।

'ওদিকে বসের লজ!' হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় আঁতকে উঠলো নেলসন।

'হ্যাঁ,' শান্তস্বরে বললো রানা। 'কি ঘটছে না বুঝে থামা উচিত হবে না। প্রথমে পাশ কাটিয়ে যাবো আমরা। বেন, সামনে চলে এসো। জেনিথ, পিছনে বসো, মাথা নিচু করে থাকবে।'

'কেন, আমাকে সামনে বসতে হবে কেন?'

'তোমার প্রাণ প্রিয় বন্ধুকে কাভার দেয়ার জন্যে,' বললো রানা। 'তাড়াতাড়ি করো।' ধমক লাগালো ও। 'আমি সন্দেহ করছি, গোলাগুলি আর আগুন ধরাবার সাথে টেরোরিস্টরা জড়িত থাকতে পারে।'

'টেরোরিস্ট! কি বলছো! রানা, তুমি কি দুঃস্বপ্ন দেখছো?'

রানা জবাব দিলো না। তাতেই যা বোঝার বুঝে নিলো নেলসন। জেনিথকে পিছনে আসতে সাহায্য করলো সে, নিজে সামনে গিয়ে বসলো।

প্রাইভেট রোডের মুখ থেকে আধ মাইল দূরে, হাইওয়ের পাশে থেমে আরোহীরা যার যার গাড়ির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে উঁকি মারছে, কালো ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে অটোমেটিক রাইফেলের আও-

য়াজ শুনছে। শেরিফের অফিস থেকে এখনো কেউ পৌছায়নি দেখে অবাক হলো রানা। তারপরই ওর চোখ পড়লো বুলেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ভ্যানটার ওপর। প্রাইভেট রোডের মুখে একটা বাধা হয়ে রয়েছে ভ্যানটা।

ডান দিকে তাকালো রানা, ধোঁয়া আর আগুন ছাড়িয়ে আরো সামনে কিছু দেখার চেষ্টা করলো। এমন সময় হঠাৎ জঙ্গলের কিনারা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো একটা মূর্তি, সরাসরি কর্ডের দিকে ছুটে এলো সে।

ব্রেকের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো রানা, ডান দিকে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরালো। নব্বই ডিগ্রী বাঁক নিয়ে রাস্তার ওপর আড়াআড়ি ঘুরে গেল কর্ড। পেভমেন্টের সাথে ঘষা খেলো টায়ার। অবধারিত দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়ে স্থির পাথর হয়ে গেছে মূর্তিটা, ড্রাইভারের কাছ থেকে মাত্র এক মিটার দূরে।

রানার হার্টবিট বেড়ে গেল। সিট থেকে ঝুঁকে নারীমূর্তির দিকে ভালো করে তাকালো ও, চোখে ফুটে উঠলো সমীহ আর অকৃত্রিম বিস্ময়।

'আ-আপনি।' উম্মে সালিহা হাঁপিয়ে উঠলেন। 'সত্যিই কি আপনি?'

'কি সৌভাগ্য আমার যে দ্বিতীয়বার আপনাকে উদ্ধার করার সুযোগ হচ্ছে। উঠে পড়ুন, মিস সালিহা, জলদি উঠে পড়ুন।'

'ওহ্, থ্যাঙ্ক গড।' ফিসফিস করে বললেন উম্মে সালিহা। 'প্লিজ, সাহায্য করুন আমাকে। সবাইকে ওরা মেরে ফেলেছে। ওরা আ-আমাকে খুন করতে আসছে।'

রানা হুইলের পিছন থেকে, আর জেনিথ প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্ট

থেকে নেমে পড়লো। পিছনের সিটে উঠতে উম্মে সালিহাকে সাহায্য করলো ওরা। 'কারা ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'মোস্তফা কামালের ভাড়াটে লোক। সিক্রেট সার্ভিসের সব ক'জন এজেন্টকে মেরে ফেলেছে। গাড়ি ছাড়ুন, প্লিজ। এখুনি এসে পড়বে ওরা !'

'শান্ত হোন,' তাঁর একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিলো জেনিথ, এই প্রথম লক্ষ্য করলো মহাসচিবের কাপড়চোপড় ধোঁয়া লেগে কালো হয়ে আছে, চুল এলোমেলো। 'আপনাকে আমরা সরাসরি একটা হাসপাতালে নিয়ে যাবো।'

'তাড়াতাড়ি!' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বললেন উম্মে সালিহা। 'দেরি করলে আপনারাও মারা পড়বেন।'

উম্মে সালিহার দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ফেরালো রানা, আর ঠিক সেই সময় ঝোপ-ঝাড় ফুঁড়ে হাইওয়েতে বেরিয়ে এলো মার্সিডিজ দুটো। এক সেকেণ্ডের বেশি দেখলো না ও, লাফ দিয়ে উঠে পড়লো ড্রাইভিং সিটে। ফার্স্ট গিয়ার দিয়েই মেঝের সাথে চেপে ধরলো অ্যাকসিলারেটর, কর্ড ঘোরালো ওর জন্যে খোলা একমাত্র দিকটায়—ব্রেকেনরিজ-এর ফিরতি পথ ধরে ছুটলো গাড়ি।

স্পেয়ার টায়ারের মাথায় একটা আচ্ছাদন রয়েছে, সেটার ওপর বসানো রিয়ার ভিউ মিররে তাকালো রানা। মার্সিডিজ দুটো পিছু নিয়েছে, মাত্র তিনশো মিটার দূরে ওগুলো। পরমুহূর্তে দৃশ্যটা চুরমার হয়ে গেল একঝাঁক বুলেট ছুটে এসে আয়নার কাঁচ গুঁড়িয়ে দেয়ায়।

'মেঝের সাথে সেঁটে থাকুন!' চিৎকার করলো রানা।

পিছনের অংশে ড্রাইভ শ্যাফট না থাকায় মেঝেতে প্রচুর জায়গা, উম্মে সালিহাকে নিয়ে সেখানে কুণ্ডলী পাকালো জেনিথ। উম্মে

সালিহাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে অভয়ের হাসি উপহার দিলো সে। 'ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। হাবভাব দেখেই বোঝা যায়, যোগ্য লোকের হাতে পড়েছেন আপনি। বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করার প্রথমশ্রেণীর রেকর্ড আছে ওদের। শহরে পৌঁছুতে পারলে বিপদ কেটে যাবে।'

'রানার কথা বলছো?' মাথা নাড়লেন উম্মে সালিহা। 'আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে, বলতে হবে না। কিন্তু এ-যাত্রা তিনিও আমাদের বাঁচাতে পারবেন না। আমরা ফ্যানাটিকাল টেরোরিস্টদের পাল্লায় পড়েছি।'

সামনের সিটে কুঁকড়ে যতোটা সম্ভব ছোটো হয়ে গেছে বেন নেলসন। 'এটার টপ স্পীড কতো? তুমি জানো, এখনো আমি বিয়ে করিনি!'

'এল-টোয়েনটিনাইনের টপ স্পীড রেকর্ড করা হয়েছে সাতাত্তর,' জবাব দিলো রানা।

'মাইল, না কিলোমিটার?'

'মাইল।'

'তাহলে বোধহয় আর বিয়ে করা হলো না, আজই পটল তুলতে হবে!' বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠলো নেলসনের গলা।

'কেন, ওগুলো কি?'

ঝট করে ঘুরলো নেলসন, দরজার ওপর ঝুঁকে উঁকি দিলো পিছনে। 'সামনে থেকে দেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কোন্ মডেলের মার্সিডিজ, তবে সম্ভবত থ্রি হানড্রেড এস. ডি. এল.।'

'ডিজেল?'

'টার্বোচার্জড ডিজেল, ঘণ্টায় দুশো বিশ কিলোমিটার ছুটতে পারে।'

'দূরত্ব কমছে?'

'ছারপোকাকে খানার তাড়া করলে দূরত্ব কমে না বাড়ে?' ঝাঁঝের সাথে পাল্টা প্রশ্ন করলো নেলসন। 'শেরিফের অফিস অনেক দূরে থাকতেই ওরা আমাদেরকে ধরে ফেলবে।'

পায়ের চাপ দিয়ে মেঝের সাথে সেঁটে ধরলো রানা ক্লাচ। গিয়ার বদলে থার্ডে দিলো। 'কোথাও না থেমে নাগালের বাইরে থাকার চেষ্টা করবো। থামতে যাচ্ছি দেখলেই এলোপাতাড়ি গুলি করবে ওরা, তাতে বহু নিরীহ মানুষ মারা পড়তে পারে। খুন করা ওদের এক ধরনের নেশা।'

আবার একবার পিছন দিকে তাকালো নেলসন। 'ওদের চোখের সাদা অংশটুকুও আমি দেখতে পাচ্ছি।'

হাতের অস্ত্র জ্যাম হতেই ভাগ্যকে মা-বাপ তুলে গালি দিলো আবু সুফিয়ান, মার্সিডিজ থেকে হাইওয়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো সেটা। পিছনে বসা এক সঙ্গীর হাত থেকে আরেকটা অস্ত্র ছিনিয়ে নিলো সে, জানালার দিকে ঝুঁকে এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়লো কর্ড লক্ষ্য করে। মাজল্ থেকে মাত্র পাঁচটা শেল বেরুলো, অ্যামুনিশন ক্লিপ খালি হয়ে গেছে। আরেকটা ক্লিপের সন্ধানে পকেট হাতড়াতে শুরু করে আবার গাল দিলো সে, ক্লিপটা বের করে স্লটে ঢোকালো।

'উত্তেজিত হয়ো না,' শান্তভাবে বললো ড্রাইভার। 'সামনের এক কিলোমিটারের মধ্যেই ওদেরকে ধরে ফেলবো। কর্ডের বাঁ দিকে থাকবো আমরা, দ্বিতীয় মার্সিডিজ নিয়ে সাদ্দাম থাকবে ডান দিকে। দু'দিক থেকে গুলি করে সব ক'টাকে পাঠিয়ে দেবো জাহান্নামে।'

'মাঝখানে যারা বাদ সেধেছে তাদের আমি নিজের হাতে মারতে

চাই।' গর্জে উঠলো সুফিয়ান।

'সুযোগ তুমি পাবে। ধৈর্য ধরো।'

বলা যায়, বায়না ধরা শিশুর মতো, যার আবদার রক্ষা করা হয়নি, হাঁড়িপানা মুখ নিয়ে ধপাস করে সিটের ওপর বসে পড়লো সুফিয়ান, চোখ পিট পিট করে তাকিয়ে থাকলো সামনের গাড়িটার দিকে।

আবু সুফিয়ান নিকৃষ্টতম খুনীদের একজন। অপরাধবোধের সাথে তার পরিচয় নেই। হাসতে হাসতে একটা মাতৃসদন উড়িয়ে দিতেও তার বাধবে না। প্রথমশ্রেণীর খুনীরা তাদের কাজের ধরন-ধারণ নিয়ে মাথা ঘামায়, কাজটা সারার পর ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে চিন্তা করে, আরো নিখুঁত হবার চেষ্টা করে পরবর্তী কাজটায়। আবু সুফিয়ানের কাছে এ-সবের কোনো গুরুত্ব নেই। যথেষ্ট সময় আর মেধা খরচ না করায় তার প্ল্যানে স্থূল সব ভুল থেকে যায়, সেজন্যে অঘটনও কম ঘটে না। ইতিমধ্যে দু'বার দু'জন মানুষকে মারতে গিয়ে তাদের বদলে অন্য দু'-জনকে মেরে এসেছে সে। এ-ধরনের ঘটনা সুফিয়ানের মতো খুনীদের আরো বিপজ্জনক করে তোলে। উত্তেজিত হাঙরের মতো অস্থিরমতি, কখন কি করবে ধারণা করা যায় না, ঘটনাচক্রে বাধা হয়ে দাঁড়ালে পাইকারী হারে নিরীহ মানুষজনকে খুন করবে। তার প্রেরণার উৎস হলো ধর্ম। তার ধারণা, ধর্মের নামে কাফেরদের খুন করে বিপুল সওয়াব হাসিল করছে সে। খুন করে ভারি মজা পায় আবু সুফিয়ান, আরো খুন করার প্রেরণা অনুভব করে, ধরে নেয় আল্লাহ তার প্রতি বিশেষভাবে সন্তুষ্ট বলেই তাকে এতো আনন্দ দান করছেন।

'গাড়ি আরো জোরে চালাও!' ড্রাইভারকে তাগাদা দিলো সে। 'মনে থাকে যেন, সব ক'টার মাথায় গুলি করতে চাই আমি! বেজন্মাদের আমি দেখিয়ে দেবো!'

*

'ওরা বোধহয় অ্যামুনিশন বাঁচাচ্ছে,' কৃতজ্ঞচিত্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো নেলসন।

'আমাদেরকে মাঝখানে রেখে স্যাণ্ডউইচ তৈরি করতে চাইছে,' বললো রানা। 'যাতে মিস না করে।' রাস্তার দিকে চোখ, তবে মাথার ভেতর পালানোর পথ খোঁজার কাজ চলছে দ্রুত।

'একটা রকেট লঞ্চার পেলে আমি আমার রাজ্য হারাতেও রাজি আছি।'

'ভালো কথা মনে করেছো। সকালে গাড়িতে ওঠার সময় কি যেন একটা ঠেকেছিল পায়ে, ঠেলে সিটের তলায় পাঠিয়ে দিই,' বললো রানা।

মেঝের দিকে ঝুঁকে রানার সিটের নিচেটা হাতড়ালো নেলসন। ঠাণ্ডা, শক্ত কি যেন একটা ঠেকলো হাতে। চেহারা ব্যাজার হয়ে উঠলো তার। 'স্রেফ একটা সকেট রেঞ্চ, এ দিয়ে কিস্যু হবে না।'

'সামনে একটা জীপ ট্রেইল, স্কি রান-এর চূড়ায় উঠে গেছে। সাপ্লাই আর ইকুইপমেণ্ট নিয়ে দু'চারটে গাড়ি মাঝে মধ্যে যায় ওদিকে। জঙ্গল বা নালায় গা ঢাকা দেয়ার সুযোগ এনে দিতে পারে। হাই-ওয়েতে থাকলে বাঁচার কোনো আশা নেই।'

'সামনে কতোদূর?'

'পরবর্তী বাঁকের কাছাকাছি।'

'কিন্তু হাইওয়ে ছাড়লে আমাদের স্পীড আরো কমবে,' বললো নেলসন। 'ব্যাপারটা ফাঁদ হয়ে উঠবে না তো?'

'তুমিই বলো।'

তৃতীয়বার পিছন দিকে তাকালো নেলসন। 'পঁচাত্তর মিটার দূরে

ওরা, দূরত্ব প্রতি মুহূর্তে কমিতেছে।'

'উহাদের গতি মন্থর করিতে হইবে।'

'তুমি অনুমতি দিলে আমি আমার কুৎসিত চেহারাটা উহাদেরকে দেখাইতে পারি, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করিতেও আপত্তি নাই,' শুকনো গলায় প্রস্তাব রাখলো নেলসন।

'তাহাতে কাজের কাজ কিছুই হইবে না, উহারা আরো বরং খেপিয়ে উঠিবে। না হে, তারচেয়ে এক নম্বর প্ল্যান কাজে লাগাও।'

'ব্রিফিংটা আমি মিস করেছি,' ব্যঙ্গের সুরে বললো নেলসন।

'ছোঁড়াছুঁড়িতে তোমার হাত কেমন?'

বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকালো নেলসন। 'বাহনটাকে একটা সরল-রেখায় ধরে রাখো, বেন নেলসন-বম্ব এখন প্রতিপক্ষের ওপর নিক্ষিপ্ত হবে।'

খোলা টাউন কার আদর্শ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে চমৎকার উতরে গেল। পিছন দিকে মুখ করে সিটে হাঁটু সাঁটিয়ে সিধে হলো নেলসন, ছাদের ওপর উঁচু হলো তার কাঁধ আর মাথা। লক্ষ্যস্থির করলো সে, হাত তুললো, ছুঁড়ে দিলো রেঞ্চটা। ধনুকের মতো বাঁকা একটা পথ তৈরি করে ছুটলো হাতিয়ার, সামনের মার্সিডিজটাকে লক্ষ্য করে।

পলকের জন্যে থেমে গেল হৃৎপিণ্ড। রেঞ্চ টার্গেটে পৌঁছুনোর আগেই বড় বেশি নিচে নেমে যাচ্ছে। টার্গেটে নয়, পড়লো হুডের ওপর। তবে পড়ে ছিটকে গেল, উইণ্ডশীল্ডটা নিখুঁতভাবে চুরমার করে ঢুকে পড়লো ভেতরে।

টেরোরিস্ট ড্রাইভার নেলসনকে জিনিসটা ছুঁড়তে দেখেছিল। তার ক্ষিপ্রতা ভালো হলেও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ভালো নয়। ব্রেকে চাপ দিলো সে, বন বন করে হুইল ঘোরালো রেঞ্চের পথ থেকে সরে

যাবার জন্যে, ঠিক তখনই হাজারটা টুকরো হয়ে গেল উইণ্ডশীল্ডের কাঁচ, ছড়িয়ে পড়লো তার মুখে। স্টিয়ারিং হুইলের গায়ে বাড়ি খেয়ে আবু সুফিয়ানের কোলের ওপর পড়লো রেঞ্চটা।

দ্বিতীয় মার্সিডিজের ড্রাইভার সুফিয়ানের ঠিক পিছনেই ছিলো, সে দেখতেই পায়নি বাতাস চিরে একটা মিসাইল ছুটে আসছে। সামনের টেইললাইট হঠাৎ করে লাল হয়ে উঠতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সে। পিছন থেকে প্রথম মার্সিডিজকে ধাক্কা দেয়ার সময় অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো, দেখলো ধাক্কা খেয়ে ঘুরে যাচ্ছে গাড়িটা, চোখের পলকে উল্টো দিকে অর্থাৎ তার দিকে মুখ করলো সেটা।

'তুমি কি ঠিক ইহাই চাহিয়াছিলে?' ফুর্তির সাথে জিজ্ঞেস করলো নেলসন।

'অক্ষরে অক্ষরে। শক্ত হও, বেন, বাঁকের কাছে এসে পড়েছি।' স্পীড কমালো রানা, সরু একটা তুষার ঢাকা পথে ঘুরিয়ে নিলো কর্ডকে। পথটা আঁকাবাঁকা, কোনো কোনো বাঁকের পর উল্টোদিকে বিস্তৃত হয়েছে, তবে শেষ পর্যন্ত পৌচেছে পাহাড়ের চূড়ায়।

পিচ্ছিল, অমসৃণ পথ। ভারি গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একশো পনেরো ঘোড়ার স্ট্রেইট-এইট এঞ্জিনের ওপর খুব ধকল যাচ্ছে। স্প্রিংবহুল চেসিস সবাইকে নিয়ে টেনিস বলের মতো খেলতে লাগলো।

মেঝে থেকে তুলে নিজেদেরকে সিটের ওপর বসিয়েছে মহিলা আরোহীরা, দু'জোড়া পা ডিভাইডার পার্টিশনটাকে পেঁচিয়ে রেখেছে, সিলিঙের স্ট্র্যাপ ধরে ঝুলে আছে।

ছ'মিনিট পর জঙ্গলটাকে পিছনে ফেলে এলো ওরা। রাস্তার দু'-ধারে এখন বড়বড়—বোল্ডার আর গভীর তুষার। রানার প্রথম ইচ্ছে ছিলো কর্ড ফেলে পালাবে ওরা, পাথর আর জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে

কেটে পড়বে। কিন্তু ইচ্ছেটা বাতিল করে দিতে হলো পাউডার-মিহি তুষার দেখে, পা ফেলামাত্র হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাবে। বিকল্প উপায় একটাই আছে, চূড়ায় উঠে যাওয়া, তারপর একটা চেয়ার লিফট নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে শহরে নামা, হারিয়ে যাওয়া ভিড়ের মধ্যে।

'আমরা ফুটছি,' ঘোষণা করলো নেলসন।

র‍্যাডিয়েটর ক্যাপের চারদিক থেকে বাষ্প উঠছে, আগেই দেখেছে রানা। টেমপারেচার গজের কাঁটাও উঠে গেছে 'হট' লেখা ঘরে। 'এ-ভাবে দৌড় খাটানো হবে ভেবে তৈরি করা হয়নি গাড়িটা,' বললো ও। 'এখনো যে ভেঙে চারখানা হয়ে যায়নি সেটাই আশ্চর্য।'

'রাস্তা শেষ হয়ে গেলে? কি করবো আমরা?'

'দু'নম্বর প্ল্যানটা কাজে লাগাবো। চেয়ার লিফটে চড়ে ধীরেসুস্থে নেমে যাবো কাছাকাছি একটা সেলুনে।'

'তোমার স্টাইলটা পছন্দ হলেও, না বলে পারছি না যে যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি,' পিছন দিকে ইঙ্গিত করলো নেলসন। 'বন্ধুরা ফিরে এসেছে।'

এতো ব্যস্ত ছিলো রানা, অনুসরণকারীদের খবর রাখার সময় পায়নি। দুর্ঘটনা সামলে নিয়ে দুটো মার্সিডিজই আবার নতুন উদ্যমে কর্ডটাকে ধাওয়া শুরু করেছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাবারও অবসর পেলো না ও—পিছনের জানালার কাঁচ, উম্মে সালিহা আর জেনিথের মাথার মাঝখানে, এক ঝাঁক বুলেটের আঘাতে গুঁড়িয়ে গেল, সামনের উইণ্ডশীল্ড ফুটো করে বেরিয়ে গেল ঝাঁকটা। চোখের সামনে তিনটে ফুটো দেখতে পেলো রানা, কিনারাগুলো এবড়ো-খেবড়ো। মহিলা আরোহীদের কিছু বলতে হলো না, আবার তারা আশ্রয় নিলো গাড়ির মেঝেতে। এবার তারা চেষ্টা করলো মেঝে

ফুটো করে ভেতরে সেঁধোবার।

'আমার সন্দেহ হচ্ছে, রেঞ্চটা ছুঁড়ে দেয়ায় ওদের খুব রাগ হয়েছে,' আঁচ করলো নেলসন।

'আমার গাড়িটাকে যেভাবে ঠেলছে ওরা, আমারও খুব রাগ হচ্ছে।'

চুলের কাঁটার মতো তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিলো রানা, গাড়ি সিধে করার সময় চুরি করে তাকালো ধাওয়ারত মার্সিডিজগুলোর দিকে। দৃশ্যটার মধ্যে বিপদের উপাদান যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে।

সামনের মার্সিডিজ এঁকেবেঁকে ছুটে আসছে। কর্ডের চাকা তুষারের ওপর গভীর গর্ত তৈরি করেছে, সেই গর্তের ফাঁদে পড়ার কোনো ইচ্ছে নেই ড্রাইভারের, উন্মত্ততার সাথে সারাক্ষণ হুইল ঘোরাচ্ছে সে। প্রতিটি বাঁকে পিছলে রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করছে না। প্রায়ই তুষারের স্তূপে আটকা পড়ছে চাকা। মার্সিডিজে স্নো টায়ার লাগানো নেই দেখে অবাক হলো রানা। ওর জানা নেই, নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার জন্যে গাড়িগুলো মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে চালিয়ে এনেছে টেরোরিস্টরা। অস্তিত্বহীন একটা টেক্সটাইল কোম্পানীর নামে রেজিস্ট্রি করা ওগুলো, উম্মে সালিহার জান কবচ করার পর দুটোকেই ফেলে যাওয়া হবে ব্রেকেনরিজ এয়ারপোর্টে।

যা দেখলো, মোটেও খুশি হতে পারলো না রানা। মাঝখানের দূরত্ব দ্রুত কমছে। ওরা মাত্র পঞ্চাশ মিটার পিছনে। পছন্দ হলো না অটোমেটিক রাইফেল হাতে লোকটাকেও, সামনের মার্সিডিজের ভাঙা উইণ্ডশীল্ডের ফাঁক দিয়ে ব্যারেল বের করে ওদের দিকে লক্ষ্যস্থির করার চেষ্টা করছে সে।

'ভগ্নদূতেরা আসছে!' চেঁচালো রানা, হুইলের নিচে মাথা লুকালো,

ড্যাশবোর্ডের কিনারা দিয়ে কোনো রকমে দেখতে পাচ্ছে সামনের রাস্তা। 'সবাই নত হও।'

কথাগুলো মুখ থেকে বেরুতে যা দেরি, কর্ডের গায়ে আঘাত করলো এক ঝাঁক বুলেট। প্রথম বিস্ফোরণে ডান দিকের ফেণ্ডার মাউন্টিঙের ওপর রাখা স্পেয়ার টায়ার আর হুইল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। পরের ঝাঁক ছাদটাকে ফুটো করলো। নিজের অজান্তেই মাথাটা আরো নামিয়ে নিলো রানা। পিছনের দরজা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল কব্জাগুলো, দরজাটাও উড়ে গেল বাতাসে ডানা মেলে। একটা গাছের সাথে ঘষা খেলো কর্ড। বৃষ্টির মতো ঝরলো কাঁচের টুকরো। মহিলা আরোহীদের একজন আর্তনাদ করে উঠলো, দু'জনের মধ্যে ক বোঝা গেল না। ড্যাশবোর্ডে গাঢ় রক্তের পোচ দেখতে পেলো রানা। পর-মুহূর্তে উপলব্ধি করলো, নেলসনের একটা কান এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছে বুলেট। কী আশ্চর্য, কৌতুকপ্রবণ ইটালিয়ান যুবক টুঁ-শব্দটিও করলো না।

নির্লিপ্তভাবে ক্ষতটা স্পর্শ করলো নেলসন, ভাবটা যেন ওটা অন্য কারো কান। তারপর মাথা কাত করে রানার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলো। 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, কাল রাতে খাওয়া মদটুকু ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসছে।'

'সিরিয়াস?'

'দু'হাজার ডলার লাগবে প্লাস্টিক সার্জারী করাতে, ফুটো হয়েছিল কিনা টেরও পাবে না। মহিলাদের কোনো খবর জানো?'

না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলো রানা, 'জেনিথ, তোমরা ঠিক আছো তো?'

'কাঁচের টুকরো চামড়ায় দু'একটা দাগ কেটেছে,' প্রায় সাথে সাথে,

উঁচু গলায় জবাব দিলো জেনিথ। 'তাছাড়া আমরা অক্ষতই আছি।'

কর্ডের র‍্যাডিয়েটর থেকে বাষ্প এবার সশব্দ প্রতিবাদের সাথে বেরুচ্ছে। এঞ্জিনের শক্তি কমছে, টের পেলো রানা। সামনে শেষ বাঁক, তারপর চূড়া। গাড়িটাকে ঘোরানোয় মন দিলো ও। পিছনের বাম্পারে প্রায় সেঁটে আছে প্রতিপক্ষরা।

অতিরিক্ত উত্তাপে এঞ্জিনের বেয়ারিংগুলো প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আরো এক ঝাঁক বুলেট বামদিকের পিছনের ফেণ্ডার গুঁড়িয়ে দিলো, চ্যাপ্টা করে দিলো টায়ারটাকে। কর্ডের পিছনের অংশ রাস্তা থেকে নেমে যেতে চাইছে, ধরে রাখার জন্যে হুইলের সাথে যুদ্ধ করছে রানা। রাস্তার পাশে অসংখ্য বোল্ডার, গাড়ি ধাক্কা খেলে ছাতু হয়ে যাবে আরোহীরা।

হুডের নিচ থেকে নীল ধোঁয়া বেরুতে দেখে রানা বুঝলো, মারা যাচ্ছে কর্ড। রাস্তার কিনারায় পড়ে থাকা একটা পাথরকে এড়াতে পারেনি ও, অয়েল প্যানে খোঁচা লাগায় গর্ত তৈরি হয়েছে, এঞ্জিনের নিচ থেকে ঝরে পড়ছে তেল। অয়েল প্রেশার গজ দ্রুত ০-এর ঘরে নেমে এলো। পাহাড় চূড়ায় পৌঁছুনোর আশা ত্যাগ করাই ভালো।

পিছলানো চাকা নিয়ে সামনের মার্সিডিজ শেষ বাঁকটা ঘুরতে শুরু করলো। কর্ডের হুইল শক্ত করে ধরে অনবরত ঘোরাচ্ছে রানা। ধাওয়ারত শত্রুদের চেহারায় উল্লাস কল্পনা করতে পারলো ও, তারা বুঝে ফেলেছে পালানোর কোনো উপায় নেই শিকারের।

চারদিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে আশ্রয়ের কোনো সন্ধান দেখলো না রানা। পা সম্বল করে কোথাও বেশিদূর যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। রাস্তার একদিকে তুষার আর বোল্ডার, আরেকদিকে ঝপ্ করে নেমে গেছে গভীর খাদ, মাঝখানের সরু রাস্তায় আটকা পড়েছে

ওরা। এঞ্জিন অচল হয়ে পড়ছে, একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ার আগেই ঘটে যাবে যা ঘটার।

মরিয়া হয়ে উঠলো রানা, মেঝের সাথে চেপে ধরলো অ্যাকসিলা-রেটর-পেডাল গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে, সেই সাথে বিধাতার সাহায্য চেয়ে আবেদন জানালো উপর মহলে।

আশ্চর্য, যুদ্ধবিধ্বস্ত প্রাচীন বাহনের এখনো কিছু দেয়ার আছে। জ্যান্ত একটা প্রাণীর মতো, লোহা আর ইস্পাতসহ কুঁকড়ে গেল কর্ড। এঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল, সামনের চাকাগুলো ডেবে গেল তুষা-রের ভেতর, পরমুহূর্তে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মতো সামনে লাফ দিলো কর্ড, একবারের চেষ্টাতেই উঠে এলো চূড়ায়।

পিছনে নীল ধোঁয়া আর সাদা বাষ্পের মেঘ উঠলো, খোলা স্কি রান-এর মাথায় পৌঁছে গেল ওরা। ট্রিপল-চেয়ার স্কি লিফট ওদের একশো মিটার দূরেও নয়। কর্ডের সরাসরি নিচের ঢালে কেউ স্কি করছে না দেখে প্রথমে ভারি অবাক হলো রানা। লোকজন চেয়ার থেকে নেমে পড়ছে, ঘুরে যাচ্ছে লিফটের উল্টোদিকে, তারপর ছুটছে সমান্তরাল স্কি ট্রেইল ধরে।

তারপর লক্ষ্য করলো ও, ওর দিকের ঢালটা রশি দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়েছে। বিপজ্জনক বলে এদিকে কাউকে স্কি করতে নিষেধ করা হয়েছে, রশির সাথে ঝুলে থাকা রঙিন বোর্ডগুলোয় তাই লেখা।

'রাস্তার এটাই শেষ মাথা,' হতাশ কণ্ঠে বললো নেলসন।

তার সাথে একমত হয়ে রানা বললো, 'লিফটের দিকে যাবো, তা সম্ভব নয়। দশ মিটার পেরোবার আগেই গুলি করে আমাদের সব ক'টাকে ফেলে দেবে ওরা।'

'তুষারের বল তৈরি করে ছুঁড়ে মারা যায়। নাকি আত্মসমর্পণ করার কথা ভাবছো?'

'তিন নম্বর প্ল্যানের কথাটা ভুলে গেছো?' তিরস্কার করলো রানা।

কৌতূহল নিয়ে রানাকে দেখলো নেলসন। 'প্রথম দুটোর চেয়েও খারাপ হবে সেটা, এ আমি বিশ্বাস করি না।' তারপরই তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। 'তুমি কি ভাবছো···ওহ্, গড, নো!'

মার্সিডিজ দুটো পৌঁছে গেল, প্রতিপক্ষ থুথু ছুঁড়লেও ওদের গায়ে লাগবে। কর্ডের দু'পাশে চলে এসেছে প্রায়। হুইলে মোচড় দিলো রানা, গাড়িটাকে নামিয়ে দিলো স্কি রান-এ, অর্থাৎ বিপজ্জনক ঢালে।

'উন্মাদ! ওরা উন্মাদ!' বিড়বিড় করে বললো সুফিয়ানের ড্রাইভার। 'ওদেরকে ধরা সম্ভব নয়।'

'তাড়া করো!' হুংকার ছাড়লো সুফিয়ান। 'যদি পালায়, তোমাকে আমি খুন করবো!'

'পালিয়ে যাবে কোথায়!' হিসহিস করে বললো ড্রাইভার। 'দেখছো না, আত্মহত্যা করছে ওরা? পাহাড়ের মাথা থেকে সচল গাড়ি নিয়ে নামতে চেষ্টা করলে কেউ বাঁচে?'

অটোমেটিক রাইফেলের ব্যারেলটা স্যাৎ করে ঘোরালো সুফিয়ান, ড্রাইভারের কানে মাজল্ চেপে ধরলো। 'বেজন্মা শুয়োর, লেকচার মারা হচ্ছে? হয় ওদেরকে ধরে দে, নয়তো যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেবো তোকে!'

ইতস্তত করলো ড্রাইভার, বুঝতে পারছে ধাওয়া করলেও মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হবে, না করলেও। হাল ছেড়ে দিয়ে কর্ডের পিছু নিলো সে, কিনারা থেকে ঢালে নামিয়ে আনলো মার্সিডিজকে। 'আল্লাহ,

অন্তত আমাকে তুমি রক্ষা করো।'

ভাঙা উইণ্ডশীল্ডের ভেতর রাইফেলের ব্যারেল লম্বা করে সুফিয়ান বললো, 'গাড়ি সিধে করে রাখো।' দ্বিতীয় গাড়ির ড্রাইভার ইতস্তত করেনি, প্রথমটার পিছু পিছু নেমে এসেছে ঢালে।

জমাট বাঁধা শক্ত বরফের ওপর দিয়ে তীরবেগে নামছে কর্ড, প্রতি মুহূর্তে আরো বাড়ছে গতি। হুইলটা আলতোভাবে ছুঁয়ে আছে রানা প্রায় ঘোরাচ্ছেই না। ব্রেকের ওপরও কোনো চাপ দিচ্ছে না। একটু এদিক ওদিক হলেই চরকির মতো ঘুরতে শুরু করবে কর্ড। যদি আড়া আড়িভাবে পিছলাতে শুরু করে, অবধারিত পরিণতি হবে ঘন ঘন ডিগবাজি খাওয়া, পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছুবে কিছু ভাঙা হাড় আর লোহা-লক্কড়।

'সিট বেল্টের প্রশ্ন তোলার জন্যে এটা কি আদর্শ সময় নয়?' জিজ্ঞেস করলো নেলসন।

মাথা নাড়লো রানা। 'উনিশশো ত্রিশে সে-ধরনের কিছু ছিলো না।'

বুলেটে ঝাঁঝরা পিছনের চাকার রাবার খসে যাওয়ায় ভাগ্যকে ছোট্ট একটা ধন্যবাদ দিলো ও। চুপসে যাওয়া টায়ার থেকে মুক্ত হয়ে কাঠামোর জোড়া কিনারা বরফের গায়ে ভালোভাবে কামড় বসাতে পারছে, ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য পাচ্ছে রানা।

স্পীডমিটারের কাঁটা ষাটের ঘরে উঠে গেল, এই সময় এক ঝাঁক মুঘলকে ছুটে আসতে দেখলো ও। তুষারের অতিকায় স্তূপ, দক্ষ স্কিয়াররা এ-ধরনের বাধা পেরোতে ভালোবাসে। স্কি নিয়ে ঢাল পেরোবার সময় বাধাগুলো রানারও খুব প্রিয়। কিন্তু দু'হাজার একশো বিশ

কিলোগ্রাম ওজনের গাড়ি নিয়ে মুঘলদের মাঝখান দিয়ে পথ করে নেয়ার কথা ভাবতে পারে শুধু পাগলরা। বেন নেলসনের ধারণা, রানা বর্তমানে তাদের ভূমিকাতেই অভিনয় করছে।

আলতো স্পর্শে ট্রেইল থেকে সামান্য সরিয়ে দিলো রানা গাড়ি-টাকে, চলে এলো মসৃণ বরফে। সামনের পরীক্ষাটা সূচের ফুটোয় অলিম্পিক মশাল ঢোকানোর সাথে তুলনা করা যায়। আপনা থেকেই শরীরের পেশী শক্ত হয়ে গেল, ঝাঁকি খাবার জন্যে তৈরি। এক চুল এদিক ওদিক হলে ছাতু হয়ে যাবে সবাই ওরা।

একপাশে অনেকগুলো তুষার স্তূপ, আরেক পাশে সারি সারি গাছ, মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। কোনোটার সাথে ঘষা লাগলো না, সরু পথ ধরে পরিষ্কার বেরিয়ে এলো কর্ড। চওড়া, বাধাহীন ঢালে বেরিয়ে এসেই ঝট্ করে পিছন দিকে তাকালো রানা।

প্রথম মার্সিডিজের ড্রাইভার কাণ্ডজ্ঞানের চমৎকার পরিচয় দিলো। মুঘলদের এড়াবার জন্যে কর্ডের ফেলে আসা চাকার দাগ অনুসরণ করলো সে। দ্বিতীয় মার্সিডিজের ড্রাইভার হয় মুঘলদের দেখেনি বা বিপজ্জনক বলে মনে করেনি। নিজের ভুল বুঝতে পারলো অনেক দেরিতে, ব্যস্ততার সাথে সংশোধনের জন্যে গাড়িটাকে ঘন ঘন ডানে বাঁয়ে ঘোরালো সে। এভাবে তিন কি চারটে মুঘলকে এড়াতে সফল হলো লোকটা, তারপর একটার সাথে মুখোমুখি ধাক্কা খেলো। গাড়ির সামনের অংশ তুষারের ভেতরে ঢুকে গেল, উঁচু হলো পিছনটা। নব্বই ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করে ঝুলে থাকলো সেটা। তারপর শুরু হলো ডিগবাজি খাওয়া। নিরেট বরফে পড়লো, খাড়া হলো, আবার পড়লো, আবার খাড়া হলো—প্রতিবার গাড়ি থেকে কিছু না কিছু ছিটকে পড়ছে, শুধু আরোহীরা বাদে, কারণ ডিগবাজি খাওয়ায়

চ্যাপ্টা হয়ে গেছে বডি, জ্যাম হয়ে গেছে দরজা। গাড়ি থেকে ছিটকে পড়লে আরোহীরা হয়তো প্রাণে বেঁচে যেতো।

মাউন্টিং থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল এঞ্জিন, ছিটকে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। চাকা, ফ্রন্ট সাসপেনশন, রিয়ার-ড্রাইভ ট্রেন, এক এক করে সবগুলো চেসিস থেকে বেরিয়ে ঢাল বেয়ে সবেগে নামতে শুরু করলো।

'যদি বলি একটা খতম, ব্যাকরণ সম্মত হবে কি?' প্রশ্ন করলো নেলসন।

'খুশি হবার কিছু নেই,' দাঁতে দাঁত চেপে বললো রানা। 'সামনে তাকাও।'

সামনে তাকিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলো নেলসন। সামনে নতুন একটা ট্রেইল শুরু হতে যাচ্ছে, সেখানে উজ্জ্বল রঙের স্কি স্যুট পরা অনেক লোকের ভিড়। উইণ্ডশীল্ড ফ্রেমের কিনারা ধরে সটান খাড়া হলো সে, উন্মত্তের মতো হাত নেড়ে চিৎকার জুড়ে দিলো। কর্ডের জোড়া হর্ন বাজাচ্ছে রানা।

চমকে উঠে ওদের দিকে ফিরলো স্কিয়াররা। দেখলো, দুটো ছুটন্ত গাড়ি প্রায় তাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড সময় আছে, ছিটকে একপাশে সরে গেল সবাই, কর্ডটাকে পাশ কাটাতে দেখলো, দেখলো তীরবেগে সেটাকে ধাওয়া করছে একটা মার্সিডিজ।

ট্রেইলে উঁচু হয়েছে একটা স্কি জাম্প, নেমেছে একশো মিটার দূরে। তুষার ঢাকা র‍্যাম্প ঠিক কোথায় পাহাড়ের গায়ে মিশেছে, দেখার অবসর নেই রানার। কোনো রকম ইতস্তত না করে স্টার্টিং ড্রপ-অফ-এর দিকে র‍্যাডিয়েটর অর্নামেণ্ট তাক করলো ও।

'লাফ দেবে, না?' তাজ্জব নেলসন প্রশ্ন করলো।

'চার নম্বর প্ল্যান,' তাকে আশ্বস্ত করলো রানা। 'শক্ত হও। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারি।'

'আছে নাকি যে হারাবে?'

অলিম্পিক কমপিটিশনের জন্যে যে-ধরনের কাঠামো তৈরি করা হয়, এটা তার চেয়ে অনেক ছোটো। এটা শুধু অ্যাক্রবেটিক আর হট-ডগ প্রদর্শনীর জন্যে ব্যবহার করা হয়। তবে র‍্যাম্পটা কর্ডকে ধারণ করার জন্যে যথেষ্ট চওড়া, খানিকটা জায়গা পড়েও থাকবে। ক্রমশ উঁচু হয়েছে ঢালটা, তারপর সমতল খানিকটা বিস্তৃতি, সবশেষে ডেবে গেছে র‍্যাম্প, ত্রিশ মিটার এগিয়ে গ্রাউণ্ড-এর বিশ মিটার ওপরে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে।

স্টার্টিং গেটের দিকে গাড়ি তাক করলো রানা, কর্ডের চওড়া বডির আড়ালে লুকিয়ে রাখলো স্কি জাম্প। সাফল্য নির্ভর করছে সময়জ্ঞান আর প্রয়োজন মতো স্টিয়ারিং হুইল ঘোরানোর ওপর।

একেবারে শেষ মুহূর্তে, সামনের চাকা স্টার্টিং লাইন পেরোবার আগেই, স্টিয়ারিং হুইলে মোচড় দিলো রানা। কর্ডের পিছনটা ঘুরে গেল, চরকির মতো পাক খেতে শুরু করে র‍্যাম্পটাকে এড়িয়ে গেল গাড়ি। কর্ডের আকস্মিক অস্থিরতা লক্ষ্য করে ঘাবড়ে গেল সুফিয়ানের ড্রাইভার, সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে সরলরেখা থেকে সরিয়ে নিলো মার্সিডিজকে, স্টার্টিং গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলো নিখুঁতভাবে।

কর্ডকে সোজা পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে রানা, ঘাড় ফিরিয়ে মার্সিডিজের দিকে তাকিয়ে আছে নেলসন। সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কিনারা থেকে নেমে গেল গাড়িটা। মুহূর্তের জন্যে সেটাকে আকাশের গায়ে ডানাবিহীন মোটাসোটা একটা পাখির মতো লাগলো। র‍্যাম্পের কিনারা ছাড়ার মুহূর্তে ঘণ্টায় একশো বিশ

কিলোমিটার বেগে ছুটছিল ওটা। নিচে পড়ে প্রথমে ওটা চ্যাপ্টা হলো, তারপর গড়িয়ে নামার সময় খুলে খুলে পড়লো একেকটা পার্ট। পাইন গাছের সারিতে ধাক্কা খাওয়ার আগেই আরোহীরা সবাই দলা পাকিয়ে গেছে।

'আরেকটু হলে আমরাও আকাশে উড়তাম!' ঢোক গিলে রানাকে তিরস্কার করলো নেলসন।

'তার বদলে সম্ভবত পাতালে নামতে যাচ্ছি!' সতর্ক করলো রানা। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি পথ ধরতে গিয়ে সফল হলেও, কর্ডের চাকা ঢালে নেমে এসে পিছলাতে শুরু করেছিল। স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে পিছলানো সামলে নিয়েছে রানা, কিন্তু ঢাল বেয়ে পতনের গতি কমাতে পারছে না। ঢালের অর্ধেকটা পেরিয়ে আসতেই ব্রেকের শ্যু পুড়ে গেল, স্টিয়ারিং টাই রড বেঁকে গেছে, সেটাও একটা থ্রেড-এর মাথায় ঝুলছে। কর্ড ছুটে চলেছে তার অবধারিত পথে, সরাসরি একটা স্কি ফ্যাসিলিটি আর রেস্তোরাঁ বিল্ডিঙের দিকে, চেয়ার লিফটের গোড়ায়। একটা কাজই করার আছে রানার, করছেও তাই, বাচ্চাদের মতো অনবরত হর্ন বাজাচ্ছে।

মহিলা আরোহীরা দ্বিতীয় মার্সিডিজের ধ্বংস চাক্ষুষ করেছে নির্দয় কৌতূহল আর বিশাল স্বস্তিকর অনুভূতি নিয়ে। স্বস্তিটুকু ক্ষণস্থায়ী। বিল্ডিংটা সবেগে ছুটে আসছে দেখে আঁতকে উঠলো তারা।

'মিঃ রানা, কিছুই কি আমাদের করার নেই?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করলেন উম্মে সালিহা, প্রশ্নটা প্রায় বুলেটের মতো ছুটে এলো।

'পরামর্শ দেয়ার অধিকার ইচ্ছে করলেই আপনি প্রয়োগ করতে পারেন,' পাল্টা গুলি ছুঁড়লো রানা। পরমুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে উঠলো বাচ্চাদের তৈরি খেলাঘর এড়াবার জন্যে, খেলাঘরের চারপাশে তারা

স্কি নিয়ে ছুটোছুটি করছে।

স্কিয়ারদের প্রধান অংশটা মার্সিডিজের পতন দেখেছে, কর্ডের আওয়াজও তাদের কানে গেছে। ট্রেইলের একপাশে দ্রুত সরে গেল তারা, হাঁ করে পাশ কাটাতে দেখলো গাড়িটাকে।

চেয়ার লিফটের উঁচু প্রান্তটা থেকে ফোনে একাধিক গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে, বেস এরিয়া থেকে লোক-জনকে সরিয়ে দিয়েছে স্কি ইনস্ট্রাকটর-রা। স্কি সেন্টারের ডান দিকে অগভীর একটা পুকুর রয়েছে, বরফে জমাট বাঁধা। রানার ইচ্ছে, ওই পুকুরের ওপর পৌঁছানো। জমাট বাঁধা বরফ ভেঙে গেলে কর্ডের রানিং বোর্ড পর্যন্ত ডুবে যাবে, স্থির হবে গাড়ি। কিন্তু সমস্যা হলো, লোক-জন কি ঘটে দেখার লোভে এমনভাবে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে যে তাদের মাঝখানে রেস্তোরাঁ বিল্ডিং পর্যন্ত একটা করিডর তৈরি হয়েছে, পুকুরের দিকে যাবার কোনো পথ খোলা রাখেনি।

'আশা করতে পারি,' গম্ভীর সুরে জিজ্ঞেস করলো নেলসন, 'এবার তুমি ঝোলা থেকে পাঁচ নম্বর প্ল্যানটা বের করবে?'

'প্ল্যান সব শেষ,' বললো রানা। 'দুঃখিত।'

উম্মে সালিহা গলা লম্বা করে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে। তাঁকে মিথ্যে অভয় দেবে, সে উৎসাহও পাচ্ছে না জেনিথ। সংঘর্ষ অনি-বার্য, আর দেরিও নেই, বুঝতে পেরে পরস্পরকে তারা জড়িয়ে ধরলো, তারপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লো ড্রাইভিং সিটের পিছনে।

স্কি আর পোল রাখা হয় র‍্যাকগুলোয়, কয়েকটার সাথে ধাক্কা খেলো কর্ড। টুথপিকের মতো চারদিকে উড়ে গেল স্কি আর পোল-গুলো। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো তুষারের ভেতর চাপা পড়েছে গাড়ি, তারপর বিস্ফোরণের মতো বেরিয়ে এসে আবার ছুটলো সেটা, কংক্রি-

টের সিঁড়ি বেয়ে সরাসরি উঠে পড়লো বারান্দায়, এড়িয়ে গেল রেস্তোরাঁটাকে, কাঠের দেয়াল ভেঙে ঢুকে পড়লো ককটেল লাউঞ্জে।

রুমটা খালি করা হয়েছে, রয়ে গেছে শুধু পিয়ানো বাদক। সে তার কী বোর্ডের সামনে বসে আছে, বিস্ময়ে পঙ্গু। এক সেকেণ্ড পর দেখা গেল আরো একজন রয়ে গেছে। বার-এর নিচ থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুললো বারটেণ্ডার, কর্ডটা ভেতরে ঢুকছে দেখে আবার ঝপ্ করে বসে পড়লো সে। চেয়ার-টেবিল গুঁড়িয়ে উন্মত্ত হাতির মতো ছুটে এলো কর্ড, উল্টোদিকের দেয়াল ভেঙে নিচে লাফ দেয়ার পাঁয়তারা কষলো। দেয়ালের বিশ ফুট নিচে শক্ত বরফ।

আশ্চর্যই বটে, দেয়াল ভাঙার পর গর্তের ভেতর খানিকটা নাক গলিয়ে দিয়ে স্থির হয়ে গেল কর্ড, বোঝা গেল লাফ দেয়ার কোনো ইচ্ছে ওটার নেই।

র‍্যাডিয়েটরের হিসহিস শব্দ ছাড়া কামরার ভেতর ভৌতিক নিস্তব্ধতা নেমে এলো। উইণ্ডশীল্ড ফ্রেমের সাথে মাথাটা ঠুকে গেছে রানার, চুলের আড়ালে সদ্য তৈরি ক্ষত থেকে গাল বেয়ে নেমে আসছে রক্ত। নেলসনের দিকে ফিরলো ও, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে এমন স্থিরভাবে বসে আছে সে, যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো রানা। মহিলা আরোহীদের দু'জনের চেহারা-তেই প্রশ্নসূচক 'এখনো আমরা বেঁচে আছি।' ভাব।

বারটেণ্ডার এখনো লুকিয়ে আছে, কাজেই পিয়ানো বাদকের দিকে ফিরলো রানা। তিন পায়াওয়ালা একটা টুলে হতভম্ব চেহারা নিয়ে বসে আছে সে। তার মাথায় কাত হয়ে রয়েছে ডাবি হ্যাট, ঠোঁটের কোণে ঝুলে রয়েছে আধপোড়া সিগারেট, ছাইটুকু এখনো ঝরে পড়েনি। কী-র ওপর তাক করা রয়েছে তার হাত দুটো, গোটা শরীর

আড়ষ্ট। রক্তাক্ত আগন্তুকের দিকে তাকালো সে, আগন্তুক হাসলো।

'ক্ষমা করবেন, ভাই,' সবিনয়ে বললো রানা। 'একটু বাজিয়ে শোনাবেন নাকি—ফ্লাই মি টু দ্য মুন?'

সতেরো

চারদিকে বহুবর্ণ ফ্লাডলাইটের ছড়াছড়ি। অতিকায় কাঠামোর প্রতিটি পাথর শিল্পকর্ম, সেগুলোয় প্রতিফলিত হয়ে উজ্জ্বল আলো অতিপ্রাকৃত একটা আভা বিকিরণ করছে। প্রকাণ্ড পিরামিডের দেয়ালগুলো নীল করা হয়েছে, পিরামিডের মাথার ওপর জাদুকরের মন্দির গোলাপী আভায় উদ্ভাসিত। লাল স্পটলাইট দ্রুত ওঠানামা করছে সিঁড়ি বেয়ে, প্রতিবার রক্ত ঢেলে দেয়ার একটা ছবি ফুটে উঠছে ধাপগুলোর ওপর। ওপরে, মন্দিরের ছাদে, সাদা কাপড়ে মোড়া একটা মূর্তি।

নিজের দু'দিকে হাত দুটো মেলে দিলো ম্যানুয়েল রিভেরা, মুঠো খুললো—তার এই ভঙ্গি পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে অনেক আগেই। সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে নিচে তাকালো সে।

ইয়্যুক্যাটান পেনিনস্যুলায় প্রাচীন মায়ান শহর উক্সমাল, মন্দির আর

পিরামিডের চারদিকে গিজগিজ করছে মানুষ, হাজার হাজার ভক্ত মুখ তুলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ম্যানুয়েল রিভেরা তার ভাষণ শেষ করলো প্রতিবারের মতোই কীর্তন গাওয়ার সুরে আযটেক গান গেয়ে। সুরটা ধরতে পারলো বিশাল জনতা, একযোগে গেয়ে উঠলো তারাও।

'এই জাতির শক্তি, সাহস আর সাফল্য নিহিত রয়েছে আমাদের মধ্যে, আমরা যারা কখনোই অভিজাত বা ধনী হবো না। আমরা অভুক্ত থাকি, মেহনত করি সেই সব নেতাদের জন্যে যারা আমাদের চেয়ে কোনো অর্থেই বড় বা সৎ নয়। অবৈধ সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত কোনো রকম মহত্ত্ব বা গৌরবের অস্তিত্ব মেক্সিকোয় থাকবে না। আর নয় দাসত্ব। আর নয় মুখ বুজে শোষণ আর অত্যাচার সহ্য করা। ভদ্রবেশী অভিজাত আর ধনীদের শায়েস্তা করার জন্যে, তাদের দুর্নীতি থেকে জাতিকে চিরকালের জন্যে উদ্ধার করার জন্যে, আবার একজোট হয়েছেন দেবতারা। তাঁরা আমাদের জন্যে নতুন এক সভ্যতা উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছেন। সেটা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে।'

ভাষণ শেষ হবার সাথে সাথে বহুরঙা আলো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এলো, শুধু উজ্জ্বল সাদা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে থাকলো একা ম্যানু-য়েল রিভেরা। তারপর অকস্মাৎ সাদা স্পটলাইটও নিভে গেল, সেই সাথে অদৃশ্য হলো মূর্তিটা।

খোলা প্রান্তরে বহ্ন্যুৎসব জ্বলে উঠলো, ট্রাক বহর থেকে হাজার হাজার কৃতজ্ঞ ভক্তদের মধ্যে বিলি করা হলো বাক্স ভর্তি খাবার। প্রতিটি বাক্সে নরম, সুস্বাদু রুটি আর মাংস আছে, আর আছে একটা করে পুস্তিকা। পুস্তিকাটা কার্টুন পত্রিকার মতো, প্রচুর ছবি, ক্যাপশন কম। ছবিতে দেখানো হয়েছে দৈত্য-দানবের চেহারা নিয়ে মেক্সিকো

ছেড়ে পালাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট অগাস্টিন মোরেনো আর তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যরা, সীমান্তের ওপারে শয়তানরূপী আংকল স্যাম দু'বাহু বাড়িয়ে তাদেরকে আলিঙ্গন করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। প্রেসিডেন্ট আর তার সঙ্গীদের তাড়া করছে দেবতার চেহারা নিয়ে ম্যানুয়েল রিভেরা, তার সাথে রয়েছে আরো চারজন আযটেক দেবতা।

পুস্তিকায় নির্দেশের একটা তালিকাও স্থান পেয়েছে, বুদ্ধি দেয়া হয়েছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কিন্তু কার্যকরীভাবে সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করার।

খাবার বাক্স বিলি করার সময় স্বেচ্ছাসেবক যুবক-যুবতীরা ম্যানুয়েল রিভেরার নতুন শিষ্য সংগ্রহ ও তাদেরকে তালিকাভুক্ত করার দায়িত্বও পালন করলো। গোটা ব্যাপারটার আয়োজন করা হয়েছে পেশাদারী দক্ষতার সাথে। মেক্সিকো সিটি দখল করে সরকারকে উৎখাত করার জন্য এক পা এক পা করে এগোচ্ছে ম্যানুয়েল রিভেরা। শুধু উক্সমালে নয়, আরো বহু প্রাচীন আযটেক শহরে ভাষণ দিয়েছে সে। নিজের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে তার প্রতিটি ভাষণ অবিশ্বাস্য অবদান রাখছে। তবে আজ পর্যন্ত আধুনিক কোনো শহরে সমাবেশের আয়োজন করেনি সে।

সন্তুষ্ট জনতা ম্যানুয়েল রিভেরার নামে জয়ধ্বনি দিতে শুরু করলো। কিন্তু তাদের সে জয়ধ্বনি তার কানে গেল না। স্পটলাইট নেভার সাথে সাথে দেহরক্ষীরা তাকে নিয়ে পিরামিডের পিছন দিকের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে বড়সড় একটা ট্রাক তথা সেমিট্রেইলর-এর পাশে। তাড়াহুড়ো করে ট্রাকে উঠে পড়লো ম্যানুয়েল রিভেরা। স্টার্ট নিলো এঞ্জিন। ট্রাকের সামনে একটা প্রাইভেট কার থাকলো, পিছনে থাকলো আরেকটা। জনতার ভিড়ের মাঝখান দিয়ে ধীরগতিতে এগোলো গাড়িগুলো, উঠে এলো হাইওয়েতে, বাঁক নিয়ে রওনা হলো

ইয়ুক্যাটান রাজ্যের রাজধানী মারিডা-র দিকে।

ট্রেইলরের ভেতরে দামী ফার্নিচার; একপাশে কনফারেন্স রুম/ পার্টিশনের অপর দিকে ম্যানুয়েল রিভেরার লিভিং কোয়ার্টার।

ঘনিষ্ঠ ভক্তদের সাথে আগামীকালের শিডিউল নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলো রিভেরা। বৈঠক শেষ হলো, এই সময় দাঁড়িয়ে পড়লো ট্রাক, শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলো সবাই। প্রাইভেট কারে উঠে মারিডার একটা হোটেলে চলে গেল তারা।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে লিভিং কোয়ার্টারে ঢুকলো ম্যানুয়েল রিভেরা। মাথা থেকে পালকের মুকুট খুললো সে, খুললো সাদা আলখেল্লা, পরনে থাকলো একজোড়া স্ল্যাকস আর একটা স্পোর্টস শার্ট। কেবি-নেট থেকে দামী একবোতল হুইস্কি বের করলো। প্রথম ছ'বার তাড়া-তাড়ি গলায় ঢাললো তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে, তারপর আয়েশ করে ছোটো ছোটো চুমুক দিলো গ্লাসে।

পেশীতে ঢিল পড়ার পর ছোট্ট একটা খুপরিতে ঢুকলো রিভেরা, ভেতরে নানা ধরনের কমিউনিকেশন ইকুইপমেণ্ট রয়েছে। একটা হোলোগ্রাফিক টেলিফোনের কোড করা নাম্বারে চাপ দিয়ে ঘুরলো সে, খুপরির ঠিক মাঝখানে মুখ করলো। হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে অপে-ক্ষায় আছে। ধীরে ধীরে অস্পষ্ট একটা ত্রিমাত্রিক মূর্তি ফুটে উঠতে শুরু করলো। একই ভাবে হাজার মাইল দূরে ম্যানুয়েল রিভেরাকেও দেখা যাচ্ছে।

এক সময় পরিষ্কার হলো ছবিটা। আরেকজন লোক একটা আরাম কেদারায় বসে তাকিয়ে রয়েছে রিভেরার দিকে। তার গায়ের রঙ গাঢ়, ব্যাকব্রাশ করা চুলে চকচক করছে তেল। শক্ত, দামী পাথরের মতো ঝলমলে তার চোখ জোড়া। পা'জামার ওপর আলখেল্লা পরেছে সে।

রিভেয়ার স্ল্যাকস আর শার্ট ভুরু কুঁচকে লক্ষ্য করলো লোকটা, লক্ষ্য করলো হাতে মদের গ্লাসটাও। 'বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছো তুমি। এতোটা বেপরোয়া হওয়া কি উচিত?' ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো সে, বাচন-ভঙ্গি আমেরিকান। 'এরপর মেয়েমানুষের দিকে ঝুঁকবে, কি বলো?'

হেসে উঠলো ম্যানুয়েল রিভেরা। 'শোনো ভাই, আমাকে লোভ দেখিয়ো না। বিজাতীয় কাপড়ে চব্বিশ ঘণ্টা নিজেকে ঢেকে রাখা, পোপের মতো আচরণ করা, তার ওপর কৌমার্য অক্ষুণ্ন রাখা, প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।'

'কেন, একই কাজ কি আমাকেও করতে হচ্ছে না?'

'হ্যাঁ, তা হচ্ছে। কিন্তু আর যে পারি না।'

'সাফল্য নাগালের মধ্যে চলে এসেছে, এখন তোমার কেয়ারলেস হওয়া সাজে না।'

'হতে চাই না, হচ্ছিও না। আমার প্রাইভেসীতে নাক গলাবে এমন সাহস কারো নেই। যখন একা থাকি, ভক্তরা ধরে নেয় ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করছি আমি।'

দ্বিতীয় লোকটা নিঃশব্দে হাসলো। 'ব্যাপারটার সাথে আমিও পরিচিত।'

'কাজের কথা শুরু করবে?' জিজ্ঞেস করলো ম্যানুয়েল রিভেরা।

'ঠিক আছে। বলো কি ব্যবস্থা করেছো।'

'সংশ্লিষ্ট লোকজন ছাড়া কাকপক্ষীও আয়োজনটার কথা জানে না। নির্দিষ্ট সময়ে সবাই যে যার জায়গায় উপস্থিত থাকবে। সমাবেশের জায়গাটা কোথায় জানার জন্যে দশ মিলিয়ন পেসো ঘুস দিয়েছি আমি। বোকার দল তাদের কাজ শেষ করবে, তারপর তাদের বলি দেয়া হবে। শুধু যে তাদের মুখ বন্ধ করাই উদ্দেশ্য তা নয়, আমাদের নির্দেশ পাল-

নের জন্যে যারা অপেক্ষা করছে তাদেরকে সতর্কও করা হবে।'

'আমার অভিনন্দন গ্রহণ করো। তোমার কাজ অত্যন্ত নিখুঁত।'

'কৌশল আর বুদ্ধিমত্তা দেখানোর সুযোগ তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি আমি।'

রিভেরার মন্তব্যের পর কয়েকটা মুহূর্ত নিস্তব্ধতার ভেতর কাটলো, দু'জনেই যে যার চিন্তায় মগ্ন। অবশেষে নড়ে উঠলো দ্বিতীয় লোক-টা, গাউনের ভেতর থেকে ব্র্যাণ্ডির একটা বোতল বের করলো, উঁচু করে দেখালো রিভেরাকে। 'তোমার স্বাস্থ্য।'

হেসে উঠে হুইস্কির গ্লাসটা রিভেরাও উঁচু করলো। 'যৌথ অভি-যানের সাফল্য কামনায়।'

'আমি দেখার অপেক্ষায় আছি, আমাদের মেধা আর পরিশ্রমের ফল ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে কিভাবে বদলে দেয়।'

আঠারো

তুষার ঢাকা রকি পর্বতমালার চূড়াগুলো পিছিয়ে পড়লো, বীচক্রাফট জেট আকাশের আরো ওপরে উঠে এলো।

'প্রেসিডেন্ট শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, আপনি যাতে তাড়াতাড়ি সেরে

ওঠেন,' জিমি উইলফোর্স বললেন। 'ঘটনার বর্ণনা শোনার পর ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি…।'

'তিনি উপলব্ধি করেছেন আপনার ওপর দিয়ে কি রকম বিশ্রী একটা ধকল গেছে,' মন্তব্য করলেন বিল হ্যারিংটন।

'এবং তিনি আমাদের সবার পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। বলেছেন, আপনার নিরাপত্তার জন্যে সম্ভাব্য যে-কোনো ব্যবস্থা নিতে তৈরি আছে মার্কিন প্রশাসন।'

'তাঁকে বলবেন, আমি কৃতজ্ঞ,' উম্মে সালিহা উত্তর দিলেন। 'আমার তরফ থেকে তাঁর প্রতি একটাই অনুরোধ, আমার প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে যারা মারা পড়েছে ওদের পরিবারকে যেন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।'

বিল হ্যারিংটন নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন, সে-ব্যাপারে অবহেলা করা হবে না।

একটা বিছানায় শুয়ে আছেন উম্মে সালিহা, পরনে সাদা সুইট-স্যুট। তাঁর ডান হাঁটু প্লাস্টার করা হয়েছে। এক এক করে বিল হ্যারিংটন, জিমি উইলফোর্স ও অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের দিকে তাকালেন তিনি। 'আমি সম্মানিত বোধ করছি, আপনাদের মতো ব্যক্তিত্ব নিউ ইয়র্কের পথে আমাকে সঙ্গদান করছেন।'

'আপনি কিন্তু বিড়ালকেও হার মানিয়েছেন,' মুচকি হেসে এই প্রথম কথা বললেন অ্যাডমিরাল।

উম্মে সালিহার ঠোঁট জোড়া সামান্য ফাঁক হলো। 'ভদ্রলোকের নাম মাসুদ রানা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জীবন দান করার জন্যে তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এখানে নিশ্চয়ই কেউ আপনারা তাঁর প্রতিনিধিত্ব করছেন? মানে, জানতে চাইছি, আপনাদের তিনজনের মধ্যে কার

অধীনে কাজ করেন ভদ্রলোক ?'

কেবিনের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এলো। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন তিনজন। চেহারায় সামান্য উজ্জ্বলতা ফুটলেও, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন ঠিক বুঝতে পারলেন না রানার কৃতিত্বে তাঁর গর্ববোধ করা উচিত হবে কিনা। খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করলেন তিনি, বললেন, 'রানা আমার অধীনে কাজ করে তা ঠিক বলা যাবে না। তবে নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর ও।'

তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন জিমি উইলফোর্স, 'জাতিসংঘে আপনার ভাষণ প্রসঙ্গে কথা বলতে পারি, মিস সালিহা ?'

'আপনার লোকেরা আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী সম্পর্কে নিরেট তথ্য-প্রমাণ কিছু কি সংগ্রহ করতে পেরেছে ?'

চট করে বিল হ্যারিংটন আর জর্জ হ্যামিলটনের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলেন জিমি উইলফোর্স। জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল, 'ভালো করে সার্চ করার সময় পাইনি আমরা। চারদিন আগে যেখানে ছিলাম, আজও প্রায় সেখানে···।'

জিমি উইলফোর্স ইতস্তত ভাব নিয়ে শুরু করলেন, 'প্রেসিডেন্ট বলেছেন,···তিনি আশা প্রকাশ করেছেন···।'

'সময় নষ্ট করার দরকার নেই, মিঃ উইলফোর্স,' উম্মে সালিহা বাধা দিয়ে বললেন। 'আপনারা শান্ত হোন। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি,ভাষণে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর কথা বলবো।'

'আপনি মত পাল্টেছেন জেনে আমি আনন্দিত।'

'যা ঘটে গেল, আমি আপনাদের কাছে অন্তত এইটুকু ঋণী।'

জিমি উইলফোর্স স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আপনার ঘোষণা প্রেসিডেন্ট হোসেন ইসমাইলকে কিছু রাজনৈতিক সুবিধে এনে দেবে,

অর্থাৎ মোস্তফা কামাল বেশ খানিকটা বেকায়দায় পড়বে। আমার তো ধারণা, ধর্মীয় মৌলবাদের বদলে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার ঘটবে মিশরে।'

'খুব বেশি কিছু আশা করো না,' সতর্ক করলেন অ্যাডমিরাল। 'দুর্গটা ধসে পড়ছে, আমরা শুধু ফাঁক-ফোকরগুলো ভরার চেষ্টা করছি।'

বিল হ্যারিংটন আশংকা প্রকাশ করে বললেন, 'আমার ভয়, মোস্তফা কামাল মিস সালিহার বিরুদ্ধে আরো মরিয়া হয়ে লাগবে।'

'আমি তা মনে করি না,' দ্বিমত পোষণ করলেন জিমি উইলফোর্স। 'নিহত টেরোরিস্টদের সাথে মোস্তফা কামালের যোগাযোগ যদি এফ. বি. আই. আবিষ্কার করতে পারে, আর যদি ষাটজন প্লেন আরোহীর মৃত্যুর জন্যে তাকে দায়ী করা সম্ভব হয়, সাধারণ মিশরীয়রা তার ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে। সারা দুনিয়া যদি তার সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে, মিস সালিহার ওপর আবার আঘাত হানতে সাহস পাবে না সে।

'একটা কথা ঠিক, মিশরীয়রা সুন্নী মুসলমান, ইরানীদের মতো রক্ত-পিপাসু নয়—আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে নিজে-দের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে চাইবো। তবে আপনার দ্বিতীয় ধারণাটি ঠিক নয়। আমি বেঁচে থাকা পর্যন্ত মোস্তফা কামাল ক্ষান্ত হবে না। একের পর এক চেষ্টা করে যাবে সে, তাকে আমি সে-ধরনের ফ্যানাটিক হিসেবেই চিনি। হয়তো এই মুহূর্তেও আমাকে খুন করার প্ল্যান করছে সে।'

'উনি ঠিক বলেছেন,' জর্জ হ্যামিলটন একমত হলেন। 'মোস্তফা কামালের ওপর আমাদের কড়া নজর রাখা দরকার।'

'জাতিসংঘে ভাষণ দেয়ার পর আপনার প্ল্যান কি?' জিজ্ঞেস করলেন বিল হ্যারিংটন।

'আজ সকালে, হাসপাতাল ছাড়ার আগে, প্রেসিডেন্ট ইসমাইলের একটা মেসেজ পেয়েছি আমি,' বললেন উম্মে সালিহা। 'তিনি আমার সাথে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।'

জিমি উইলফোর্স সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'আমাদের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে গেলে আমরা কিন্তু আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো রকম গ্যারান্টি দিতে পারবো না, মিস সালিহা।'

'আপনাদের উদ্বেগের কোনো কারণ নেই,' মৃদু হেসে উম্মে সালিহা বললেন, 'আমার দেশের সিকিউরিটি সিস্টেম আপনাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নির্ভরযোগ্য নয়।'

'জানতে পারি, মিস সালিহা, সাক্ষাৎকারটি কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?' খোঁজ নিলেন বিল হ্যারিংটন। 'নাকি অনধিকার চর্চা হয়ে গেল?'

'গোপন কোনো ব্যাপার নয়। দুনিয়ার সবাই জানবে। উরুগুয়ের পান্টা ডেল এস্টে-তে মিলিত হবো আমরা, যেখানে অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।'

তোবড়ানো, বুলেটে ঝাঁঝরা কর্ডটাকে গ্যারেজে নিয়ে আসা হয়েছে। চোখে অবিশ্বাস নিয়ে গাড়িটার চারদিকে ঘুরলো একবার কেয়ারটেকার। 'গাড়ির অবস্থা যদি এই হয়, আপনারা বেঁচে আছেন কিভাবে, স্যার?'

'গাড়ির মালিককে জিজ্ঞেস করো,' পরামর্শ দিলো বেন নেলসন। তার একটা হাত স্লিঙে ঝুলছে, গলায় একটা পট্টি বাঁধা হয়েছে, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে কানে।

ছ'টা সেলাই পড়েছে, তবে সবগুলো চুলের ভেতর আড়ালে, তাছাড়া অক্ষতই বলা যায় রানাকে। গাড়ির নাকে হাত বুলাচ্ছে ও, ওটা যেন একটা পোষা প্রাণী।

অফিসঘর থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এলো জেনিথ। তার বাম গালে আঁচড়ের দাগ, ডান চোখের নিচটা ফুলে আছে। 'টেলিফোনে হেনরি মারলিন, রানা,' ঘোষণা করলো সে।

অফিসে ঢুকে রিসিভার তুললো রানা। 'মারলিন, আমার কোনো খবর আছে?'

'শুধু একটা স্ট্যাটাস রিপোর্ট,' ওয়াশিংটন থেকে জবাব দিলো হেনরি মারলিন। 'বাল্টিক সাগর আর নরওয়ে উপকূল বাদ দিয়েছি আমি।'

'কারণ?'

'সেরাপিস লগ যে জিওলজিকাল বর্ণনা দিয়েছে তার সাথে ওই এলাকার বৈশিষ্ট্য মেলে না। রাফিনাস যে অসভ্যদের বর্ণনা দিয়েছে তার সাথে প্রথম দিককার ভাইকিংদেরও কোনো মিল নেই। সে যাদের কথা লিখেছে, তাদের সাথে বরং বেশ খানিকটা সিদিয়ানদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তবে গায়ের রঙ আরো গাঢ়।'

'কিন্তু সিদিয়ানরা এসেছিল সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে,' বললো রানা। 'সোনালি চুল বা ফর্সা চামড়া কোত্থেকে পাবে তারা!' এক সেকেণ্ড চিন্তা করলো ও। 'আচ্ছা, আইসল্যাণ্ডের কথা ভেবেছো? আরো প্রায় পাঁচশো বছর ভাইকিংরা ওখানে বসবাস করেনি। রাফিনাস হয়তো এস্কিমোদের কথা বলে থাকতে পারে।'

'সম্ভব নয়,' বললো মারলিন। 'চেক করে দেখেছি। এস্কিমোরা কখনোই আইসল্যাণ্ডে মাইগ্রেট করেনি। রাফিনাস পাইনবনের বর্ণনা

দিয়েছে, আইসল্যাণ্ডে পাচ্ছো না। তাছাড়া, ভুলো না, ছয় শো মাইল লম্বা সাগরপাড়ি নিয়ে কথা বলছি আমরা, তার মধ্যে কয়েকটা সাগর সাংঘাতিক অশান্ত। ঐতিহাসিক মেরিন রেকর্ড বলছে, রোমান জাহাজের ক্যাপটেনরা তীরভূমিকে সাধারণত দু'দিনের বেশি চোখের আড়াল করতো না।'

'এখন তাহলে কোথায় খোঁজ করবো আমরা ?'

'ভাবছি আবার একবার পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে তল্লাশি চালাবো। কিছু হয়তো চোখ এড়িয়ে গেছে।'

'অসভ্যদের সন্ধান পেতে চাইছো তুমি,' বললো রানা। 'কিন্তু সেরাপিস গ্রীনল্যাণ্ডে এলো কি করে, এর কি ব্যাখ্যা দেবে ?'

'কমপিউটর আমাদেরকে বাতাস আর স্রোতের হিসেব দিলে বলতে পারবো।'

'আজ রাতে আমি ওয়াশিংটন যাচ্ছি,' বললো রানা। 'কাল তোমার সাথে দেখা করবো।'

'ঠিক আছে,' ম্লান কণ্ঠে বললো মারলিন।

'ভালো কোনো খবর নেই, তাই না ?' রানার পিছন থেকে জিজ্ঞেস করলো জেনিথ।

তার দিকে ফিরে কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, আবার সেখানেই ফিরে এসেছি।'

রানার বাহু ধরে মৃদু চাপ দিলো জেনিথ। 'হতাশ হয়ো না তো। মারলিন পারবে, তুমি দেখো।'

'কিন্তু সে তো আর জাদুকর নয়।'

অফিসঘরে উঁকি দিলো নেলসন। 'প্লেন ধরতে হলে এখুনি বেরিয়ে পড়তে হয়, রানা।'

*

'শী ইজ সাম লেডি,' প্রশংসা করে বললেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। 'তাঁর মতো কাউকে পেলে কেবিনেটে থাকার জন্যে অনুরোধ জানাতাম আমি।' জাতিসংঘে এইমাত্র তাঁর ভাষণ শেষ করলেন উম্মে সালিহা, রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে টিভি সেট বন্ধ করে দিলেন প্রেসি-ডেন্ট।

'চমৎকার বললেন মহিলা,' অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন সায় দিলেন। 'শব্দচয়ন তুলনাহীন। মোস্তফা কামালকে একেবারে ধুয়ে দিয়েছেন।' তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা চালানোর জন্যে সরাসরি মোস্তফা কামালকে দায়ী করেছেন উম্মে সালিহা, সেই সাথে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর অস্তিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটা বর্ণনা দিয়ে আশা প্রকাশ করেছেন, অচিরেই তা আবিষ্কার করা সম্ভব হবে।

প্রেসিডেন্টের বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টে-লিজেন্স চীফ রাহাত খানও এই মুহূর্তে হোয়াইট হাউসে উপস্থিত রয়েছেন, সম্ভবত তাঁর সম্মানেই খানিক আগে হুইস্কির পরিবর্তে কফি পরিবেশনের নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট, যদিও এ-ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি, চায়ওনি কেউ।

অ্যাডমিরাল জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি জানেন নিশ্চয়ই, মিস সালিহা প্রেসিডেন্ট ইসমাইলের সাথে আলোচনা করার জন্যে উরু-গুয়ে যাচ্ছেন?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। 'সার্চ কেমন এগোচ্ছে, অ্যাডমিরাল?'

'লোকেশন খুঁজে বের করার জন্যে নুমার কমপিউটর ফ্যাসিলিটি কাজ করছে।'

'এগিয়েছে কতোদূর ?'

'চারদিন আগে যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি আমরা।'

'পেন ইউনিভার্সিটির একজনকে চিনি আমি, ট্রিপল-এ রিসার্চার বলা হয় তাঁকে, যদি মনে করেন তাঁর সাহায্য নিতে পারেন আপনারা,' পরামর্শ দিলেন প্রেসিডেন্ট।

'আজই যোগাযোগ করবো আমি,' বললেন অ্যাডমিরাল।

জিমি উইলফোর্সের দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট। 'মোস্তফা কামাল। তার সম্পর্কে খুব কম জানি আমরা।'

রাহাত খানের সাথে কথা বলছিলেন জিমি উইলফোর্স, প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরে বললেন, 'সে দাবি করে, জীবনের প্রথম ত্রিশ বছর সিনাই মরুতে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে, আলাপ করেছে আল্লাহর সাথে।'

'লোকটার উচ্চাশা আছে, মানতে হবে,' তিক্ত হাসি ফুটলো প্রেসিডেন্টের মুখে। 'পয়গম্বর হতে চায়। তার সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে বলেছিলাম সি. আই. এ. চীফকে। বিশেষ করে ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পর্কে। সেটা কতোদূর ?'

'ঘণ্টাখানেক আগে তার সাথে আমার কথা হয়েছে। গবেষকরা এক কি দু'দিনের মধ্যে ফাইল তৈরির কাজটা শেষ করতে পারবে বলে জানিয়েছে।'

'শেষ হলেই সেটা আমি দেখতে চাই।' সোফা ছেড়ে উঠলেন প্রেসিডেন্ট। এগিয়ে গিয়ে রাহাত খানের আরেক পাশে বসলেন। 'শুনলাম আপনি আপনার বন্ধুর সাথে দেখা করার জন্যে উরুগুয়ে যাচ্ছেন।'

'পুরনো বন্ধু, ডাকলে তো যেতেই হয়।' পাইপে তামাক ভরতে ভরতে হাসলেন রাহাত খান।

'উনি যখন মিশরীয় কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর চীফ ছিলেন, তখন থেকে আপনাদের বন্ধুত্ব, তাই না?'

মাথা নাড়লেন রাহাত খান। 'আমরা একই ইউনিভার্সিটিতে লেখা-পড়া করেছি।'

'ধরুন,' বললেন প্রেসিডেন্ট, 'আগামী কয়েক হপ্তার মধ্যে আলেক-জান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর অস্তিত্ব আবিষ্কার হলো। আমরা সম্ভবত লাই-ব্রেরীর শিল্পকর্ম আর নক্সাগুলো মিশরকে ফিরিয়ে দেবো। কিন্তু তার আগে, আনঅফিশিয়ালি, গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে আগেই যদি একটা আভাস দিয়ে রাখি মিঃ ইসমাইলকে, কেমন হয় সেটা?'

'হ্যাঁ, তাঁর জানা দরকার।'

'তাহলে আপনাকে আমি অনুরোধ করতে পারি?' হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট। 'এক বন্ধুর কাছে যাচ্ছেনই যখন, আরেক বন্ধুর একটা মেসেজ নিয়ে যান না কেন?'

'মেসেজটা কি হবে?'

'আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর মালিক মিশর, আমেরিকা সেটা খুঁজে পেলে মিশরের হাতেই তুলে দেবে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'তবে তার আগে একটা আলোচনা হওয়া চাই। আমরা যদি আবিষ্কার করি, ওটার ওপর আমাদেরও খানিকটা অধিকার জন্মায়। যদিও, মিশরের অনুমতি ছাড়া লাইব্রেরী বা মিউজিয়ামের কোনো জিনিসই আমরা আটকে রাখবো না।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলেন রাহাত খান।

'ছোট্ট আরেকটা মেসেজ। মিঃ ইসমাইলকে বলবেন, মোস্তফা কামালের বিরুদ্ধে তিনি যদি কোনো অ্যাকশন নিতে চান, আমরা তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

'বেশ তো, বলবো,' মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান, পাইপে আগুন ধরিয়ে টান দিলেন, ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'প্রেসিডেন্ট ইসমাইল বাংলাদেশের তরফ থেকেও সাহায্যের প্রস্তাব পেতে যাচ্ছেন।'

'ও, তাই নাকি, আচ্ছা!' আড়ষ্ট একটু হাসলেন প্রেসিডেন্ট। 'তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু, মিঃ রাহাত খান, আপনার সেরা এজেন্ট মাসুদ রানা তো শুনছি আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী নিয়ে মেতে আছে।'

'সেরা এজেন্ট নয়, সেরা এজেন্টদের অন্যতম,' সংক্ষেপে জবাব দিলেন রাহাত খান।

'তারমানে আপনি সত্যি ভাগ্যবান,' দীর্ঘশ্বাস চেপে মন্তব্য করলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমাদের সি. আই. এ. চীফের মুখে আমরা শুধু একটা কথাই শুনে আসছি—ভালো এজেন্টের বড় অভাব, আজকাল কারো ওপর ভরসা রাখা যায় না।'

উনিশ

আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে মূল ভূখণ্ডের পশ্চিমে ডুব দেবে সূর্য, এই সময় পান্টা ডেল এস্টে-র ছোট্ট হারবারে সাবলীল ভঙ্গিতে ঢুকে পড়লো প্রমোদতরী লেডি মেরিয়েটা। মৃদুমন্দ দখিনা বাতাসে উড়ছে ইউনিয়ন জ্যাক।

সুশোভিত, সুদর্শন একটা জাহাজ, দেখামাত্র চোখ জুড়িয়ে যায়। ক্রমশঃ সরু হয়ে উঠে গেছে সুপারস্ট্রাকচার। সারা গায়ে স্লেট ব্লু-র প্রলেপ। গোটা চিমনি বেগুনি-লাল।

একশো এক মিটার লম্বা লেডি মেরিয়েটা। বড়সড় পঞ্চাশটা স্যুইট। কখনোই একশোর বেশি আরোহী তোলা হয় না। তাদের সেবা করার জন্যে রয়েছে সমান সংখ্যক ক্রু সদস্য। সান জুয়ান থেকে আসার সময় এবার অবশ্য কোনো আরোহী নিয়ে আসেনি লেডি মেরিয়েটা।

'টু ডিগ্রীজ পোর্ট,' কৃষ্ণাঙ্গ পাইলট বললো।

'টু ডিগ্রীজ পোর্ট,' সাড়া দিলো হেলমস্ম্যান।

খাকি শর্টস আর শার্ট পরে আঙুলের মতো লম্বা মাটির বাড়তি অংশটার ওপর হিসেবী চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকলো পাইলট, মাটির

বাড়তি এই অংশটাই আড়াল করে রেখেছে বে-কে। ধীরে ধীরে সেটা-কে ছাড়িয়ে এলো লেডি মেরিয়েটা।

'স্টারবোর্ডের দিকে ঘুরতে শুরু করো—হোল্ড স্টেডি অ্যাট জিরো-এইট-জিরো।'

নির্দেশ পুনরাবৃত্তি করলো হেলমসম্যান, অত্যন্ত ধীরগতিতে নতুন কোর্স ধরলো জাহাজ।

আরো অনেক রঙচঙে প্রমোদতরী ও ইয়ট রয়েছে হারবারে। অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষ্যে ভাড়া করা হয়েছে অনেক জাহাজ, বাকিগুলো তাদের আরোহীদের নামাচ্ছে।

মুরিং সাইট আধ কিলোমিটার দূরে থাকতে পাইলট নির্দেশ দিলো 'ডেড স্টপ!'

শান্ত পানি কেটে আপনগতিতে এগোলো লেডি মেরিয়েটা, দূরত্ব কমিয়ে এনে ধীরে ধীরে থামছে। সন্তুষ্ট হয়ে পোর্টেবল ট্রান্সমিটারে পাইলট জানালো, 'পজিশনে পৌঁচেছি আমরা। হুক ফেলো।'

নির্দেশটা বো-র দিকে পাঠানো হলো, সাথে সাথে পানিতে ফেলা হলো নোঙর। এতোক্ষণে এঞ্জিন বন্ধ করার নির্দেশ দিলো পাইলট।

সাদা ইউনিফর্ম পরা এক ভদ্রলোক ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সহাস্য বদনে করমর্দনের জন্যে পাইলটের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'প্রতিবারের মতোই নিখুঁত, মিঃ ম্যাককেবিন।' ক্যাপ-টেন মাইকেল ব্রেকওয়াল বিশ বছর ধরে পাইলট কেভিন ম্যাককেবিন-কে চেনেন।

'আর যদি ত্রিশ মিটার লম্বা হতো জাহাজটা, কোনোমতেই হার-বারে ঢোকাতে পারতাম না।' তামাকের দাগে কালো দাঁত বের করে হাসলো ম্যাককেবিন। 'তবে আমার ওপর নির্দেশ আছে, হারবারেই

নোঙর ফেলতে হবে, জেটিতে ভিড়তে পারবো না।'

'অবশ্যই নিরাপত্তার কারণে, আন্দাজ করা যায়,' ক্যাপটেন বললেন।

আধপোড়া একটা চুরুট ধরালো পাইলট। 'শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি গোটা দ্বীপটাকে উলটপালট করে ছেড়েছে। সিকিউরিটি পুলিশের হাবভাব দেখে মনে হয়, প্রতিটি পামগাছের আড়ালে একজন করে স্নাইপার লুকিয়ে আছে।'

ব্রিজের জানালা দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার জনপ্রিয় খেলার মাঠের দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। 'আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সম্মেলন চলার সময় এই জাহাজে মেক্সিকো আর মিশরের প্রেসিডেন্ট থাকবেন।'

'তাই?' বিড়বিড় করে বিস্ময় প্রকাশ করলো পাইলট। 'তাহলে সেজন্যেই তীর থেকে দূরে রাখতে বলা হয়েছে আপনাকে।'

'আসুন না, আমার কেবিনে বসে গলাটা ভিজিয়ে নেবেন,' আমন্ত্রণ জানালেন ক্যাপটেন ব্রেকওয়াল।

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' মাথা নেড়ে বললো ম্যাককেবিন। হারবারের জাহাজগুলোর দিকে একটা হাত তুললো সে। 'আজ অনেক কাজ, আরেকদিন হবে।'

কাগজ-পত্র সই করিয়ে নিয়ে হারবার পাইলট ম্যাককেবিন নিজের বোটে নেমে গেল। হাত নাড়লো সে, তাকে নিয়ে চলে গেল বোট।

'এতো আনন্দ আর কখনো পাইনি,' ব্রেকওয়ালের ফার্স্ট অফিসার হ্যারি ওয়েট বললো। 'ক্রুরা সবাই হাজির, কিন্তু আরোহী বলতে কেউ নেই। ছ'দিন ধরে আমার মনে হচ্ছে, মারা যাবার পর স্বর্গে পাঠানো হয়েছে আমাকে।'

কোম্পানীর নির্দেশ, ক্রুরা যতোটা সময় জাহাজ চালানোয় ব্যয়

করবে, সেই একই পরিমাণ সময় ব্যয় করতে হবে আরোহীদের মনোরঞ্জনের জন্যে। এই দায়িত্ব পছন্দ নয় হ্যারি ওয়েটের। অত্যন্ত দক্ষ একজন নাবিক সে, মেইন ডাইনিং সেলুনের কাছ থেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরে থাকে, খাওয়া দাওয়া সারে সঙ্গী অফিসারদের সাথে, সারাক্ষণ জাহাজের খবরদারিতে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করে। শরীরটা তার প্রকাণ্ড, ড্রাম আকৃতির ধড়, আঁটসাঁট ইউনিফর্ম ছিঁড়ে সেটা যেন প্রতি মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে চাইছে।

'নেতাদের গাল-গল্প নিশ্চয়ই তুমি শুনতে চাইবে,' কৌতুক করে বললেন ক্যাপটেন।

চেহারায় অসন্তোষ নিয়ে হ্যারি ওয়েট বললো, 'ভি. আই. পি. প্যাসেঞ্জারদের সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। একই প্রশ্ন বারবার করা তাঁদের একটা বদভ্যেস।'

'কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আরোহী মাত্রেই শ্রদ্ধেয়, মিঃ ওয়েট। আগামী কয়েকটা দিন নিজের আচরণের প্রতি লক্ষ্য রেখো, প্লিজ। অতিথি হিসেবে এবার আমরা বিদেশী নেতা আর রাষ্ট্রপ্রধানদের পাচ্ছি।'

জবাব দিলো না হ্যারি ওয়েট, সৈকতের দিকে তাকিয়ে আকাশ ছোঁয়া বিল্ডিংগুলো দেখছে সে। 'পুরনো শহরটায় যখনই আসি, প্রতিবার নতুন একটা হোটেল দেখতে পাই।'

'হ্যাঁ, তুমি তো উরুগুয়েরই লোক।'

'মন্টিভিডিয়ো-র সামান্য পশ্চিমে জন্ম আমার।'

'বাড়ি ফেরার আনন্দটুকু উপভোগ করছো না?'

'এ শহরে, শুধু শহরে কেন, এ দেশে আপন বলতে কেউ নেই আমার। ষোলো বছর বয়স থেকে জাহাজে চাকরি নিয়ে সাগরে ঘুরে

বেড়াচ্ছি, সাগরই আমার আসল ঠিকানা।' হ্যারি ওয়েটের চেহারা হঠাৎ বিরূপ হয়ে উঠলো। জানালার দিকে একটা হাত তুলে দেখালো সে। 'ওই যে, ব্যাটারা আসছে—কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন ইন্সপেক্টরের দল।'

'প্যাসেঞ্জার নেই, ক্রুরাও কেউ তীরে নামছে না, রাবার স্ট্যাম্প মেরেই চলে যাবে ওরা।'

'হেলথ ইন্সপেক্টরকে বিশ্বাস নেই, প্যাঁচ কষলেই হলো!'

'পারসারকে জানাও, মিঃ ওয়েট। তারপর ওদেরকে নিয়ে আমার কেবিনে চলে এসো।'

'মাফ করবেন, স্যার, একটু বেশি খাতির করা হয়ে যাবে না? স্রেফ কাস্টমস ইন্সপেক্টরদের ক্যাপটেনের কেবিনে ডাকা কি উচিত?'

'হয়তো একটু বেশি হচ্ছে, তবে হারবারে থাকার সময় বিশেষ করে ওদের সাথে সদ্ভাব রাখতে চাই আমি,' ক্যাপটেন বললেন। 'বলা তো যায় না কখন আমাদের উপকার দরকার হয়।'

'ইয়েস, স্যার!'

লেডি মেরিয়েটার গায়ে বোট ভিড়লো, মই বেয়ে উঠে এলো অফিসাররা। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হঠাৎ করে জাহাজের আলো জ্বলে উঠে ঝলমলে করে তুললো আপার ডেক আর সুপারস্ট্রাকচার। শহর আর অন্যান্য জাহাজের আলোকমালার মাঝখানে নোঙর করা লেডি মেরিয়েটাকে গহনার বাক্সে হীরের একটা টুকরো মনে হলো।

উরুগুয়ের সরকারী অফিসারদের নিয়ে পাইলটের কেবিনের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল ফার্স্ট অফিসার হ্যারি ওয়েটকে। তাকে অনুসরণরত পাঁচজন লোককে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেন ক্যাপটেন। অভিজ্ঞ মানুষ, তাঁর চোখকে ফাঁকি দেয়া সহজ নয়। প্রায় সাথে সাথেই বুঝ-

লেন তিনি, কোথায় কি যেন একটা মিলছে না। অন্তত পাঁচজনের মধ্যে একজনকে অদ্ভুত লাগলো তাঁর। লোকটার মাথায় স্ট্র হ্যাট, এতো চওড়া আর নিচে নেমে আছে যে তার চোখ দুটো দেখা গেল না। পরে আছে একটা জাম্পস্যুট। বাকি সবার পরনে স্বাভাবিক ইউনিফর্ম। ক্যারিবিয়ান দ্বীপগুলোয় বেশিরভাগ অফিসারই এই ইউ-নিফর্ম পরে।

অদ্ভুত লোকটা তার সঙ্গীদের পিছু পিছু আসছে মাথা নিচু করে। সবাইকে নিয়ে দোরগোড়ায় পৌঁছুলো হ্যারি ওয়েট, একপাশে সরে দাঁড়িয়ে অফিসারদের আগে ঢোকার সুযোগ করে দিলো।

সামনে বাড়লেন ক্যাপটেন ব্রেকওয়াল। গুড ইভিনিং, জেন্টলমেন। লেডি মেরিয়েটায় আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি ক্যাপটেন মাই-কেল ব্রেকওয়াল।

কি ব্যাপার, অফিসাররা কেউ নড়ছে না বা কথা বলছে না কেন। হ্যারি ওয়েটের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলেন ক্যাপটেন। এই সময় জাম্পস্যুট পরা লোকটা এক পা সামনে বাড়লো। পা থেকে ধীরে ধীরে জাম্পস্যুটটা খুলে ফেললো সে, ভেতরে দেখা গেল সোনার কাজ করা সাদা ইউনিফর্ম, হুবহু ক্যাপটেন ব্রেকওয়াল যেমন পরে আছেন। মাথা থেকে স্ট্র হ্যাটটা নামালো সে, পরলো একটা ক্যাপ, ইউনিফর্মের সাথে মানানসই।

সাধারণত কোনো ব্যাপারেই দিশেহারা হন না ক্যাপটেন, কিন্তু আজ চোখের সামনে এ-ধরনের একটা ঘটনা ঘটতে দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হলো, তিনি যেন একটা আয়নায় তাকিয়ে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখছেন। আগন্তুককে তাঁর যমজ ভাই বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যায়।

'কে আপনি?' বাকশক্তি ফিরে পেয়ে কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপটেন। 'কি ঘটছে এখানে?'

'নাম জেনে আপনার কাজ নেই,' সবিনয় হাসির সাথে বললো আল দাউদ। 'আপনার জাহাজের দায়িত্ব এখন থেকে আমি নিলাম।'

চোরাগুপ্তা হামলার সাফল্য নির্ভর করে হতচকিত করে দেয়ার ওপর। আল দাউদ আর তার অনুচররা কাজটা এমন নিখুঁতভাবে সারলো যে ক্যাপটেন, ফার্স্ট অফিসার আর পারসার ছাড়া জাহাজের আর কেউ জানতেই পারলো না তাদের জাহাজ বেদখল হয়ে গেছে। ওদের তিনজনকে ফার্স্ট অফিসার হ্যারি ওয়েটের কেবিনে নিয়ে যাওয়া হলো, বাঁধা হলো হাত-পা, মুখে টেপ লাগানো হলো, বন্ধ দরজার ভেতর পাহারায় থাকলো সশস্ত্র একজন লোক।

আল দাউদের সময়ের হিসেবটাও নিখুঁত। উরুগুয়ের নির্ভেজাল কাস্টমস অফিসাররা মাত্র বারো মিনিট পর হাজির হলো জাহাজে। মাইকেল ব্রেকওয়ালের প্রায় নিখুঁত ছদ্মবেশ নিয়েছে সে, অফিসার-দের অভ্যর্থনা জানালো এমনভাবে যেন তাদের সাথে তার কতো-কালের পরিচয়। হ্যারি ওয়েট আর পারসারের ভূমিকায় যে-দু জনকে বেছে নিয়েছে, বেশিরভাগ সময় ছায়ার ভেতর থাকলো তারা। দু'-জনেই তারা অভিজ্ঞ নাবিক, যাদের ভূমিকায় নামানো হয়েছে তাদের সাথে চেহারার মিলও যথেষ্ট। তিন মিটারের বেশি দূর থেকে খুব কম লোকই তাদের চেহারার পার্থক্য ধরতে পারবে।

অনুসন্ধান শেষ করে কাস্টমস অফিসাররা বিদায় নিলো। ব্রেকওয়া-লের সেকেণ্ড আর থার্ড অফিসারকে ক্যাপটেনের কেবিনে ডেকে পাঠালো আল দাউদ। এটাই হবে তার প্রথম ও কঠিনতম পরীক্ষা।

এই দুই অফিসারের চোখকে যদি ফাঁকি দিতে পারা যায়, নিরীহ ও অজ্ঞ সহযোগী হিসেবে তার স্বার্থে আগামী চব্বিশ ঘণ্টা অমূল্য অবদান রাখবে তারা।

প্লেন হাইজ্যাক করার আগে, ক্যাপটেন বব রিচার্ডসনের ভূমিকা গ্রহণের সময়, ছদ্মবেশ নেয়ার পদ্ধতিটা ছিলো অন্যরকম। বব রিচার্ডসনকে খুন করার পর অনায়াসে তার মুখের একটা প্লাস্টিক ছাঁচ তৈরি করে নিয়েছিল সে। লেডি মেরিয়েটার ক্যাপটেন মাইকেল ব্রেকওয়াল-কে খুন করার সুযোগ হয়নি তার, কাজেই তাঁর ছদ্মবেশ নিতে গিয়ে আরেক কৌশল করতে হয়েছে। ব্রিটেনে তার নিজস্ব এজেন্ট আছে, তাকে দিয়ে মাইকেল ব্রেকওয়ালের আটটা ফটো সংগ্রহ করে সে। কণ্ঠস্বর ব্রেকওয়ালের সমান পর্দায় তোলার জন্যে বিশেষ একধরনের মেডিসিন ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে শরীরে গ্রহণ করতে হয়েছে তাকে।

দক্ষ একজন শিল্পীকে ভাড়া করে দাউদ, ব্রেকওয়ালের ফটোগুলো দেখে লোকটা তাকে বানিয়ে দেয় একটা মূর্তি। ভাস্কর্যটি থেকে নারী ও পুরুষ, দু'ধরনের ছাঁচ তৈরি করা হয়। সেই ছাঁচ মুখোশ হিসেবে কাজে লাগায় দাউদ। ব্রেকওয়ালের মুখের রঙ আনার জন্যে মুখোশে ব্যবহার করা হয় গাছের দুধসাদা নির্যাস। ফোমের তৈরি কান লাগিয়েছে দাউদ। ব্রেকওয়ালের চোখের রঙ পাবার জন্যে কণ্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করেছে। দাঁতে পরেছে টুথক্যাপ।

'ক্ষমা করবেন, জেন্টলমেন, ঠাণ্ডা লেগে গলাটা বসে গেছে।'

'জাহাজের ডাক্তারকে খবর দেবো?' সেকেণ্ড অফিসার জো মার্টিন জিজ্ঞেস করলো। দীর্ঘদেহী সে, রোদে পোড়া তামাটে রঙ গায়ের, শিশুসুলভ নিরীহ চেহারা।

ভুল হয়ে গেছে, ভাবলো দাউদ। ক্যাপটেন ব্রেকওয়ালকে চেনে

ডাক্তার, কাছ থেকে পরীক্ষা করলেই মুখোশটা চিনে ফেলতে পারে। 'এরইমধ্যে তিনি আমাকে এক গাদা ট্যাবলেট দিয়েছেন, এখন ভালোর দিকে।'

থার্ড অফিসার, স্কট, নাম রবার্ট উইংমোর, কপাল থেকে লাল চুল সরিয়ে গলাটা সামনের দিকে লম্বা করলো। 'আমাদের কিছু করার আছে, স্যার?'

'হ্যাঁ, আছে বৈকি, মিঃ উইংমোর।' অফিসারদের ফটো দেখা আছে, নাম-ধামও জানা, কাজেই আলাপ চালিয়ে যেতে দাউদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। 'আমাদের ভি. আই. পি. প্যাসেঞ্জাররা কাল বিকেলে আসছেন। অভ্যর্থনা কমিটির নেতৃত্ব দেবে তুমি। এক-সাথে দু'জন প্রেসিডেন্টকে অতিথি হিসেবে পাওয়া দুর্লভ একটা সম্মান, স্বভাবতই কোম্পানী আশা করবে প্রথমশ্রেণীর আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করবো আমরা।'

'ইয়েস, স্যার,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো উইংমোর। 'ভরসা রাখতে পারেন।'

'মিঃ মার্টিন।'

'ক্যাপটেন।'

'এক ঘণ্টার মধ্যে একটা ল্যাণ্ডিং ক্রাফট আসছে, কোম্পানীর কার্গো নিয়ে। তুমি লোডিং অপারেশনের চার্জে থাকবে। আজ সন্ধ্যায় সিকিউরিটি অফিসারদের একটা টিমও আসছে। তাঁদের থাকার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে, প্লিজ।'

'কার্গো নিতে হবে? নোটিশটা আরো আগে পেলে ভালো হতো না, স্যার? আর, আমি ভেবেছিলাম, মিশরীয় ও মেক্সিকোর সিকিউরিটি অফিসাররা আসবেন কাল সকালে।'

'আমাদের কোম্পানীর ডিরেক্টররা চিরকাল রহস্যময় আচরণ করেন,' খানিকটা অভিযোগের সুরে বললো দাউদ। 'সশস্ত্র অতিথি-দের কথা যদি বলেন, এ-ক্ষেত্রেও কোম্পানীর আদেশ কাজ করছে। সাবধানের মার নেই ভেবে তারা নিজেদের লোক রাখতে চাইছে।'

'তারমানে একদল সিকিউরিটি অফিসার আরেকদল সিকিউরিটি অফিসারের ওপর নজর রাখবে?'

'অনেকটা তাই। আমার ধারণা, লয়েড অতিরিক্ত সাবধানতা অব-লম্বন করার দাবি জানিয়েছে, তা না হলে বীমার রেট বাড়িয়ে দেবে।'

'বুঝতে পারছি।'

'কোনো প্রশ্ন, জেন্টলমেন?'

কারো কোনো প্রশ্ন নেই, অফিসাররা চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো।

'জো, আরেকটা কথা,' বললো দাউদ। 'কার্গো লোড করবে যতোটা সম্ভব চুপচাপ আর তাড়াতাড়ি, প্লিজ।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

ডেকে বেরিয়ে গিয়ে জো মার্টিন রবার্ট উইংমোরের দিকে তাকালো। 'শুনলে? উনি আমার নামের প্রথম অংশ ধরে ডাকলেন। ব্যাপারটা অদ্ভুত নয়?'

উইংমোর নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো। 'উনি বোধহয় সত্যি খুব অসুস্থ।'

ঠিক এক ঘণ্টা পরই লেডি মেরিয়েটার পাশে এসে থামলো লোডিং ক্রাফট, সাথে সাথে একটা সেতুবন্ধন রচনা করা হলো। কার্গো লোড করার সময় কোনো বিঘ্ন ঘটলো না। আল দাউদের বাকি লোকরাও,

সবার পরনে বিজনেস স্যুট, পৌছুলো জাহাজে। চারটে খালি স্যুইট ছেড়ে দেয়া হলো তাদেরকে।

মাঝরাতের দিকে মাল খালাস করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ল্যাণ্ডিং ক্রাফট। লেডি মেরিয়েটার সেতু তুলে নেয়া হলো। হোল্ডের ভেতর ঠাঁই পেয়েছে কার্গো, হোল্ডের বিশাল ডাবল ডোর বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

হ্যারি ওয়েটের দরজায় তিনবার টোকা দিলো আল দাউদ। সামান্য ফাঁক হলো কবাট, ভেতর থেকে উঁকি দিলো সশস্ত্র গার্ড। কার্পেট মোড়া প্যাসেজওয়ের দু'দিকে চট করে একবার তাকালো দাউদ, কেউ কোথাও নেই। তাড়াতাড়ি কেবিনের ভেতর ঢুকে পড়লো সে।

গার্ডের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলো সে। নিঃশব্দে এগিয়ে গেল গার্ড। ক্যাপটেন মাইকেল ব্রেকওয়ালের মুখ থেকে টেপটা খুলে দিলো সে।

'কষ্ট দিতে হচ্ছে, সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত, ক্যাপটেন,' বললো দাউদ। 'কিন্তু ধরুন, যদি আপনাকে আটকে না রেখে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দিতাম, আপনি পালাতে চেষ্টা করতেন না? বা ক্রু-দের সাবধান করতেন না?'

একটা চেয়ারে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছেন ক্যাপটেন, হাত আর পা চেয়ারের সাথে বাঁধা, চোখে আগুন ঝরা দৃষ্টি। 'তুমি একটা নর্দমার কীট!'

'তোমরা ব্রিটিশরা, জুতসই গাল দিতেও জানো না!' হেসে উঠলো আল দাউদ। 'আমেরিকানরা এ-ব্যাপারে ওস্তাদ। তারা চার অক্ষরের শব্দ ব্যবহার করে যা বলে তারচেয়ে খারাপ খিস্তি আর হয় না।'

'তুমি আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও।'

'কিন্তু আমার যে আপনার সাহায্য-সহযোগিতা দরকার।'

'তোমার মুখে পেচ্ছাব করতেও আমি রাজি নই।'

'কিন্তু আমি যদি আমার লোকদের অর্ডার দিই, আপনার মহিলা ক্রুদের গলা কেটে সাগরে ফেলে দিতে? এদিকের পানিতে হাঙর আছে তা তো আপনি জানেনই।'

হাত-পা বাঁধা থাকলেও, রাগের মাথায় দাউদের দিকে লাফিয়ে পড়তে চাইলো হ্যারি ওয়েট। তার তলপেটে রাইফেলের মাজল্ চেপে ধরে বাধা দিলো গার্ড। চেয়ারে পিছিয়ে গেল ওয়েট, ব্যথায় কুঁচকে উঠলো তার চেহারা।

ক্যাপটেন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন দাউদের দিকে। 'যা খুশি করতে পারো তুমি, টেরোরিস্টদের সাথে কোনো সহযোগিতার প্রশ্ন ওঠে না,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন তিনি।

'টেরোরিস্ট বলুন আর যাই বলুন, প্রথমশ্রেণীর প্রফেশনাল আমরা,' শান্তভাবে ব্যাখ্যা করলো দাউদ। 'কাউকে খুন করার কোনো ইচ্ছেই আমাদের নেই। টাকা চাই, আর তাই আমরা প্রেসিডেন্ট ইসমাইল ও প্রেসিডেন্ট অগাস্টিন মোরেনোকে আটক করবো। আপনারা যদি বাধা হয়ে না দাঁড়ান, দুই সরকারের সাথে একটা সমঝোতায় আসবো আমরা, টাকা নিয়ে চলে যাবো।'

দাউদের মুখোশ আঁটা চেহারা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন ক্যাপটেন ব্রেকওয়াল, লোকটা মিথ্যে বলছে কিনা বুঝতে চাইছেন। তাঁর মনে হলো, লোকটা সত্যি কথাই বলছে। ভদ্রলোকের জানা নেই, দাউদের রয়েছে দুর্লভ অভিনয় প্রতিভা।

'তা না হলে তুমি আমার ক্রুদের খুন করবে?'

'তাদের সাথে আপনাকেও।'

'কি চাও তুমি?'

'প্রায় কিছুই না। মিঃ মার্টিন আর মিঃ উইংমোর আমাকে ক্যাপটেন ব্রেকওয়াল বলে বিশ্বাস করে নিয়েছেন। কিন্তু আমার দরকার ফার্স্ট অফিসারের সার্ভিস। আপনি তাকে আমার নির্দেশ মানার হুকুম দিন।'

'কেন, মিঃ ওয়েটের সার্ভিস কেন দরকার তোমার।'

'আপনার কেবিনের ডেস্ক ড্রয়ারটা খুলে অফিসারদের পার্সোনাল রেকর্ড পড়েছি আমি,' বললো দাউদ। 'মিঃ হ্যারি ওয়েট এদিকের পানি সম্পর্কে জানেন।'

'ঠিক কি চাইছো?'

'একজন পাইলটকে জাহাজে ডাকার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না,' ব্যাখ্যা করলো দাউদ। 'কাল সন্ধ্যের পর হেলম-এর দায়িত্ব মিঃ ওয়েটকে নিতে হবে, জাহাজটাকে চালিয়ে চ্যানেল থেকে বের করে নিয়ে যাবেন উনি খোলা সাগরে।'

শান্তভাবে প্রস্তাবটা বিবেচনা করলেন ক্যাপটেন। খানিক পর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন তিনি। 'বন্দর কর্তৃপক্ষ টের পাওয়ামাত্র হারবার এণ্ট্রান্স বন্ধ করে দেবে, ক্রুদের তোমরা খুন করার ভয় দেখাও আর নাই দেখাও।'

'টের পাবে না। কালো রঙ করা একটা জাহাজ কালো রাতে অনায়াসে কর্তৃপক্ষের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে।'

'কতোদূর যেতে পারবে বলে মনে করো? দিনের আলো ফোটার সাথে সাথে লেডি মেরিয়েটার একশো মাইল ঘিরে চারদিকে গিজগিজ করবে পেট্রল বোট।'

'তারা আমাদের খুঁজে পাবে না,' আশ্বস্ত করার সুরে বললো দাউদ।

সামান্য অস্থির দেখালো ক্যাপটেনকে। 'বললেই তো হবে না। লেডি মেরিয়েটার মতো একটা জাহাজকে কেউ লুকিয়ে ফেলতে পারে না।'

'সত্যি কথা,' বললো দাউদ, সবজান্তার হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। 'অন্যের বেলায় সত্যি। কিন্তু আমি এটাকে গায়েব করে দিতে পারি।'

কাল সকালে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান, নিজের কেবিনে বসে নোট লিখছে রবার্ট উইংমোর। দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকলো জো মার্টিন। ক্লান্ত সে, ইউনিফর্ম ঘামে ভিজে আছে।

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকালো উইংমোর। 'লোডিং ডিউটি শেষ হলো?'

'হ্যাঁ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

'ঘুমোবার আগে এক ঢোক চলবে নাকি?'

'তোমার স্কটিশ মল্ট হুইস্কি?'

ডেস্ক ছেড়ে উঠলো রবার্ট উইংমোর, ড্রেসারের দেরাজ থেকে একটা বোতল বের করলো। দুটো গ্লাসে হুইস্কি ভরে ফিরে এলো সে। 'ব্যাপারটাকে এভাবে দেখো—ভোররাতে নোঙর পাহারা দেয়ার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছো।'

'কার্গো লোডিঙের চেয়ে সেটাই ভালো ছিলো,' ক্লান্ত সুরে বললো মার্টিন। 'তোমার কি খবর?'

'এইমাত্র ডিউটি শেষ হলো।'

'তোমার পোর্টে আলো না দেখলে ভেতরে ঢুকতাম না।'

'সকালের অনুষ্ঠানটা সুন্দর হওয়া চাই, তাই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো

লিখে রাখছিলাম।'

'ওয়েটকে কোথাও দেখতে পেলাম না, তাই ভাবলাম তোমার সাথেই কথা বলি।'

এই প্রথম রবার্ট লক্ষ্য করলো মার্টিনের চেহারায় কেমন যেন একটা দিশেহারা ভাব। 'কি ব্যাপার, কি হয়েছে তোমার ?'

গলায় হুইস্কি ঢেলে খালি গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে থাকলো মার্টিন। 'এ-ধরনের কার্গো আগে কখনো তুলিনি আমরা। এটা একটা প্রমোদ-তরী, তাই না ?'

'এ-ধরনের কার্গো মানে ? কি তুলেছো তোমরা ?' কৌতূহলী হয়ে উঠলো রবার্ট।

চুপচাপ বসে থাকলো মার্টিন, শুধু এদিক ওদিক মাথা নাড়লো। তারপর মুখ তুলে তাকালো সে, বললো, 'পেইন্টিং গিয়ার। এয়ার কমপ্রেশার, ব্রাশ, রোলার আর পঞ্চাশটা ড্রাম—বোধহয় রঙ ভর্তি।'

'রঙ ?' রবার্ট দ্রুত জিজ্ঞেস করলো। 'কি রঙ ?'

মাথা নাড়লো মার্টিন। 'তা বলতে পারবো না। ড্রামের লেখাগুলো স্প্যানিশ।'

'এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কি আছে ? রিফিটের সময় লাগবে মনে করে কোম্পানী ওগুলো হাতের কাছে রাখতে চাইতে পারে।'

'আহা, সবটুকু আগে শোনোই না। শুধু ওগুলো নয়, প্লাস্টিকের বিশাল আকারের অনেকগুলো রোলও আমরা তুলেছি।'

'প্লাস্টিক ?'

'প্লাস্টিক আর প্রকাণ্ড আকারের অনেকগুলো ফইবারবোর্ড,' বললো মার্টিন। 'অন্তত কয়েক কিলোমিটার তো হবেই। লোডিং ডোর দিয়ে বহুকষ্টে ঢোকানো গেছে। ভেতরে গুঁজতেই বেরিয়ে গেছে তিন ঘণ্টা।'

রবার্ট তার খালি গ্লাসের দিকে আধবোজা চোখে তাকিয়ে থাকলো। 'তোমার কি ধারণা, কোম্পানী ওগুলো নিয়ে কি করবে?'

চোখে বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকালো মার্টিন, কপাল কুঁচকে উঠলো। 'কি জানি! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বিশ

সূর্য ওঠার খানিক পরই পৌঁছে গেল মিশরীয় ও মেক্সিকান সিকিউরিটি এজেন্টরা। জাহাজে ওঠার সাথে সাথে কাজ শুরু করলো তারা। প্রথমে বিস্ফোরকের খোঁজে তল্লাশি চালালো জাহাজের প্রাতিটি কোণে, তারপর সম্ভাব্য আততায়ীকে খুঁজে বের করার জন্যে ক্রুদের রেকর্ড চেক করলো। পাকিস্তানী ও ভারতীয় ক্রু অল্প কয়েকজন, বেশিরভাগই ব্রিটিশ, তাদের কারো সাথেই মিশর বা মেক্সিকো সরকারের শত্রুতা নেই।

দাউদ সহ টেরোরিস্ট গ্রুপের সবাই অনর্গল স্প্যানিশ বলতে পারে, সিকিউরিটি এজেন্টদের প্রতি অত্যন্ত সহযোগিতার মনোভাব দেখালো তারা। প্রত্যেকের কাছে ভুয়া ব্রিটিশ পাসপোর্ট আর ইনস্যুরেন্স-সিকিউরিটি ডকুমেন্ট রয়েছে, চাওয়ামাত্র দেখাতে ইতস্তত করলো না।

প্রেসিডেন্ট অগাস্টিন মোরেনো জাহাজে পৌছুলেন আরো খানিক পর। ছোটোখাটো মানুষটার বয়স হয়েছে, পাকা চুল ক'টাও ঝরো ঝরো, চোখ জোড়া বেদনাকাতর, বুদ্ধিজীবীসুলভ তীক্ষ্ণ চেহারা।

প্রেসিডেন্ট মোরেনোকে অভ্যর্থনা জানালো আল দাউদ, মাইকেল ব্রেকওয়ালের ভূমিকায় তার অভিনয় চমৎকার উতরে গেল। জাহাজের অর্কেস্ট্রা মেক্সিকোর জাতীয় সঙ্গীত বাজালো, তারপর মেক্সিকোর নেতা আর তাঁর স্টাফকে পথ দেখিয়ে পৌছে দেয়া হলো লেডি মেরি-য়েটার স্টারবোর্ড সাইডে, যার যার আলাদা স্যুইটে।

দুপুরের খানিক পর জাহাজের গায়ে এসে ভিড়লো অদ্ভুত সুন্দর একটা ইয়ট। ইয়টের মালিক একজন মিশরীয় কোটিপতি, রফতানী তাঁর প্রধান ব্যবসা। ইয়ট থেকে লেডি মেরিয়েটায় পা রাখলেন প্রেসি-ডেন্ট হোসেন ইসমাইল। ভদ্রলোকের বয়স যাই হোক, চুলে পাক ধরলেও, চেহারা আর স্বাস্থ্য দেখে মনে হবে এখনো তিনি যৌবনকে ধরে রাখতে পেরেছেন। তাঁর হাড়গুলো চওড়া, চামড়ার নিচে অতি-রিক্ত মেদ জমতে দেননি, দাঁড়াবার ভঙ্গিটা টান টান।

মিশরের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হলো। তারপর অতিথিদের পৌছে দেয়া হলো পোর্ট সাইডের স্যুইটে।

তৃতীয় বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশজন সরকারপ্রধান পান্টা ডেল এস্তে শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন। কেউ কেউ তাঁদের জাতীয় নাগ-রিকদের কেনা প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় উঠেছেন, কেউ পাঁচতারা হোটেলে, আবার কেউ বা তীর থেকে দূরে নোঙর করা প্রমোদ-তরীতে।

রাস্তা ও রেস্তোরাঁগুলো আগন্তুক কূটনীতিক আর সাংবাদিকে ভরে উঠলো। হঠাৎ করে চলে আসা বিদেশী ব্যক্তিত্বের এই ভিড় সাম-

লাতে পারবে কিনা ভেবে উরুগুয়ে কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন। এমনিতেই এ-সময়টায় পান্টা ডেল এসটে-তে প্রচুর ট্যুরিস্ট আসে, এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে জাতীয় সামরিক বাহিনী ও পুলিশ সাধ্যমতো সবকিছু করলেও, মানুষের বিরতিহীন মিছিলে তাদের উপস্থিতি নগণ্য হয়ে পড়লো। প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো যানবাহন নিয়ন্ত্রণ। প্রায় প্রতিটি রাস্তায় যানজট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাগলো ছাড়াতে। সব দায়িত্ব কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে অবশেষে তারা শুধু সরকারপ্রধানদের নিরাপত্তার দিকটা দেখবে বলে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলো।

স্টারবোর্ড ব্রিজ উইংয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আল দাউদ, চোখে বিনোকিউলার, তাকিয়ে আছে শহরের দিকে। চোখ থেকে সেটা একবার নামিয়ে হাতঘড়ি দেখলো সে।

পাশে দাঁড়িয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে বিশ্বস্ত ভক্ত ও বন্ধু এখলাস। 'আপনি কি রাত নামার অপেক্ষায় আছেন?'

'তেতাল্লিশ মিনিট পর সূর্য ডুববে,' না তাকিয়েই বিড়বিড় করে বললো দাউদ।

'পানিতে বড় বেশি ব্যস্ততা,' বললো এখলাস। হারবারের চারদিকে ছুটোছুটি করছে ছোটো ছোটো অসংখ্য বোট, একটা হাত তুলে দেখালো সে। প্রায় প্রতিটি বোটে সাংবাদিকরা রয়েছে, ডেকে দাঁড়িয়ে হৈ-চৈ করছে তারা—সরকার প্রধানদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে চায়।

'মেক্সিকান বা মিশরীয় ডেলিগেট, যারা প্রেসিডেন্টদের স্টাফ, শুধু তাদেরকে জাহাজে উঠতে দেবে,' এখলাসকে নির্দেশ দিলো দাউদ। 'আর কেউ যেন উঠতে না পারে।'

'আমরা হারবার ত্যাগ করার আগে কেউ যদি তীরে যেতে চায়?'

'অনুমতি দেবে,' বললো দাউদ। 'জাহাজের রুটিন স্বাভাবিক থাকা চাই। শহরের বিশৃংখল পরিস্থিতি আমাদের উপকারে আসবে। ওরা যখন খেয়াল করবে আমরা নেই, ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'বন্দর কর্তৃপক্ষকে বোকা মনে করা ঠিক নয়। সন্ধ্যার পর আমাদের আলো না জ্বললে খোঁজ নেবে ওরা।'

'ওদের জানানো হবে আমাদের মেইন জেনারেটর মেরামত করা হচ্ছে।' আরেকটা প্রমোদতরীর দিকে হাত তুললো দাউদ, তীর থেকে আরো খানিক দূরে লেডি মেরিয়েটা আর ধনুক আকৃতির পেনিনস্যুলার মাঝখানে নোঙর ফেলেছে সেটা। 'ওটার আলো তীর থেকে মনে হবে আমাদের আলো।'

'যদি না কেউ কাছ থেকে দেখে।'

কাঁধ ঝাঁকালো দাউদ। 'খোলা সাগরে পৌঁছুতে মাত্র এক ঘণ্টা লাগবে আমাদের। দিনের আলো ফোটার আগে-উরুগুয়ে সিকিউরিটি হারবারের বাইরে সার্চ করবে না।'

'মেক্সিকান আর মিশরীয় সিকিউরিটি এজেন্টদের যদি সরাতেই হয়, এখুনি আমাদের কাজ শুরু করা দরকার,' বললো এখলাস।

'তোমরা সবাই তোমাদের অস্ত্রে সাইলেন্সার লাগিয়েছো তো?'

'বুঝতেই পারবে না যে গুলি হয়েছে, মনে হবে হাততালির শব্দ।'

কঠিন দৃষ্টিতে এখলাসের দিকে তাকালো দাউদ। 'চুপিচুপি, নিঃশব্দে, এখলাস। যেভাবেই হোক আলাদা করো ওদেরকে, প্রতি বার এক-জনকে শেষ করতে হবে। কোনো রকম চিৎকার বা ধস্তাধস্তি হওয়া চলবে না। জাহাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে কেউ যদি তীরে উঠে পুলিশকে জানায়, আমরা মারা পড়বো। ব্যাপারটা তোমার লোকজন ভালোভাবে বুঝেছে কিনা নিশ্চিত হও।'

'সবাইকে সব বলা আছে, জনাব। আরেকবার সাবধান করে দেবো আমি।'

'মোস্তফা কামালের লবণ খাচ্ছি আমরা, কথাটা যেন কেউ না ভোলে। তার ঋণ শোধ করার সময় হয়েছে। আমরা তাকে মিশরের শাসক হিসেবে দেখতে চাই।'

প্রথমে মরতে হবে মিশরীয় সিকিউরিটি এজেন্টদের। দাউদের ভুয়া ইনস্যুরেন্স-সিকিউরিটি এজেন্টদের টেরোরিস্ট হিসেবে সন্দেহ করার কোনো কারণ ঘটেনি, প্রতিপক্ষদের তারা সহজেই ভুলিয়ে-ভালিয়ে খালি প্যাসেঞ্জার স্যুইটগুলোয় নিয়ে আসতে পারলো। শুরু হলো নির্মম হত্যাযজ্ঞ।

একজন সিকিউরিটি এজেন্টকে বলা হলো, তাদের একজন কর্মকর্তা ফুড পয়জনিঙে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, জাহাজের ক্যাপটেন ভাবছেন তার উপস্থিতি দরকার। খালি প্যাসেঞ্জার স্যুইটের দোরগোড়া পেরোনো মাত্র দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো, এক হাত দূর থেকে গুলি করা হলো তার হৃৎপিণ্ডে। এভাবে কোনো না কোনো বিশ্বাস্য অজু-হাত দেখিয়ে কেবিন থেকে এক এক করে বের করে আনা হলো তাদের। কাজ ভাগ করা আছে, সাথে সাথে মেঝে থেকে মুছে ফেলা হলো সমস্ত রক্ত, এক এক করে পাশের কামরায় জমা হতে লাগলো লাশগুলো।

এরপর মেক্সিকান সিকিউরিটি এজেন্টদের পালা। প্রেসিডেন্ট অগা-স্টিন মোরেনোর দু'জন গার্ডের মনে সন্দেহ দেখা দিলো, প্যাসেঞ্জার স্যুইটে ঢুকতে অস্বীকৃতি জানালো তারা। এ-ধরনের পরিস্থিতির জন্যেও তৈরি রয়েছে টেরোরিস্টরা। তর্ক বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে

চারজন লোক ঘিরে ধরলো ছু'জনকে, ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে ছোরা মারা হলো পেটে আর বুকে। খালি প্যাসেজওয়েতে লুটিয়ে পড়লো তারা, চিৎকার করার সুযোগ হলো না।

একজন ছু'জন করে সিকিউরিটি এজেন্টদের সংখ্যা কমতে লাগলো। এক সময় লাশের সংখ্যা দাঁড়ালো বারোয়। বাকি থাকলো ছু'জন মিশরীয় আর তিনজন মেক্সিকান গার্ড, সবাই তারা যার যার নেতার স্যুইটের বাইরে পাহারা দিচ্ছে।

চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে, ক্যাপটেনের সাদা ইউনিফর্ম খুলে ফেলে কালো উলের একটা জাম্পস্যুট পরলো আল দাউদ। ক্যাপটে- নে: অবয়বও ত্যাগ করলো সে, তার বদলে পরলো ভাঁড়ের একটা মুখোশ। ভারি একটা বেল্ট জড়ালো কোমরে, তাতে ছুটো অটো- মেটিক পিস্তল আর একটা পোর্টেবল রেডিও আটকানো রয়েছে। নক করে কেবিনে ঢুকলো এখলাস।

'আর পাঁচজন মাত্র বাকি,' রিপোর্ট করলো সে। 'ওদেরকে মারতে হলে সরাসরি হামলা করতে হবে।'

'দারুণ, তোমার ওপর আমি খুশি,' বললো দাউদ। এখলাসের দিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো সে। 'এখন আর গোলযোগের ভয় করার দরকার নেই। চালাও হামলা, তবে তোমার লোকদের সতর্ক থাকতে বলো। আমি চাই না প্রেসিডেন্ট ইসমাইল বা প্রেসিডেন্ট মোরেনো ছুর্ঘটনায় মারা পড়ুন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দোরগোড়া পর্যন্ত হেঁটে গেল এখলাস, বাইরে দাঁড়ানো নিজের লোককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলো। তারপর আবার ফিরে এসে দাউদের সামনে দাঁড়ালো সে। 'ধরে নিন, জাহাজ সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।'

ক্যাপটেন ব্রেকওয়ালের ডেস্কের খানিকটা ওপরে একটা ক্রোনো-মিটার রয়েছে, ইঙ্গিতে সেটা দেখালো দাউদ। 'সাঁইত্রিশ মিনিটের মধ্যে রওনা হবো আমরা। জাহাজের এঞ্জিনিয়ারদের বাদ দিয়ে সব ক'জন প্যাসেঞ্জারকে এক জায়গায় জড়ো করো। এঞ্জিন-রুম ক্রুদের তৈরি থাকতে বলো, যাতে আমি নির্দেশ দিলেই জাহাজ রওনা হতে পারে। বাকি সবাইকে জড়ো করো মেইন ডাইনিং সেলুনে।'

কথা না বলে দাঁড়িয়ে থাকলো এখলাস, নিঃশব্দ হাসিতে পাকা ফলের মতো ফেটে পড়লো তার চেহারা, বেরিয়ে পড়লো বত্রিশটা দাঁত। তারপর সে বললো, 'আল্লাহ আমাদেরকে সাত রাজার ধন দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন।'

'সত্যি আশীর্বাদ করেছেন কিনা আজ থেকে পাঁচ দিন পর জানা যাবে।'

'আপনাকে আমি একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, জনাব—সত্যি তিনি আমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। মেয়েলোকটাকে আমরা হাতে পেয়েছি।'

'মেয়েলোক? কার কথা বলছো তুমি?'

'উম্মে সালিহা।'

প্রথমে বুঝতে পারলো না আল দাউদ। তারপর বিশ্বাস করতে পারলো না। 'উম্মে সালিহা? কি বলছো? সে এই জাহাজে?'

'দশ মিনিটও হয়নি জাহাজে পা রেখেছে, জনাব,' ঘোষণা করলো এখলাস, হাসতে হাসতে তার ফর্সা চেহারা লালচে হয়ে উঠলো। 'মহিলা ক্রুদের কোয়ার্টারে রেখেছি তাকে, কড়া পাহারায়।'

'আল্লাহ সত্যি পরম দয়ালু।' কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়লো দাউদের মাথা।

'তিনি মাকড়সার কাছে পতঙ্গ পাঠিয়েছেন, জনাব,' চাপা স্বরে বললো এখলাস। 'মোস্তফা কামালের নামে তাকে খুন করার আবার একটা সুযোগ পেয়ে গেছেন আপনি।'

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে, এই সময় এক পশলা ঝির ঝিরে বৃষ্টি ঝরিয়ে উত্তর দিকে সরে গেল এক টুকরো মেঘ। পান্টা ডেল এস্‌টে শহর ও বন্দর নবরূপে সাজতে বসেছে, জ্বলে উঠেছে আলোগুলো। হারবারের সবগুলো জাহাজ আলোকমালায় সাজানো। শুধু একটা বাদে।

তবে মাত্র একজনই ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন।

লেডি মেরিয়েটার অস্পষ্ট কাঠামো ছাড়া আর কিছু দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হলেন বি. সি. আই. চীফ মেজর জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) রাহাত খান। লেডি মেরিয়েটার পিছনে আরো একটা জাহাজ রয়েছে, উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত সেটা, সেই আলোর আভায় কোনো রকমে লেডি মেরিয়েটাকে দেখতে পেলেন তিনি।

একটা লঞ্চে রয়েছেন রাহাত খান। লেডি মেরিয়েটাকে শুধু অন্ধকার নয়, পরিত্যক্ত বলে মনে হলো তাঁর। জাহাজটার বো-র সামনে দিয়ে এগোলো লঞ্চ, বোর্ডিং স্টেয়ার-এর পাশে এসে থামলো।

হাতে শুধু একটা ব্রিফকেস, হালকা ছোট্ট লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামলেন তিনি। মাত্র দুটো ধাপ বেয়ে উঠেছেন, লঞ্চটা ঘুরে গিয়ে ডকের দিকে ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেল। ডেকে পৌঁছে দেখলেন, তিনি একা। কোথাও মারাত্মক কিছু একটা ঘটেছে। প্রথমে তাঁর ধারণা হলো, ভুল করে অন্য কোনো জাহাজে উঠে পড়েছেন।

শব্দ আসছে শুধু সুপারস্ট্রাকচারের দিক থেকে, সম্ভবত একটা স্পীকার সিস্টেম অন করা হয়েছে। খোলের গভীর থেকে জেনারেট-

রের গুঞ্জন শোনা গেল। তাছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। ঘুরলেন তিনি, গলা চড়িয়ে লঞ্চটাকে ডাকবেন, কিন্তু এরইমধ্যে বেশ অনেকটা দূরে চলে গেছে সেটা। এই সময় হঠাৎ করে কালো জাম্পস্যুট পরা একটা মূর্তি ঘন ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো, হাতের অটোমেটিক রাইফেলটা সরাসরি রাহাত খানের তলপেট লক্ষ্য করে ধরা।

'এটা কি লেডি মেরিয়েটা নয়?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

'কে আপনি?' পাল্টা প্রশ্ন হলো, কণ্ঠস্বর এতো সতর্ক ও নিচু যে কোনো রকমে শুনতে পেলেন রাহাত খান। 'কি চাই আপনার?'

নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন রাহাত খান, তারপর বললেন, 'আপনি বোধহয় আমাকে চিনবেন না।'

'চিনি বা না চিনি, আপনাকে আমরা আশা করিনি,' স্থির দাঁড়িয়ে থেকে বললো গার্ড, এখনো রাইফেল তাক করে আছে সে।

'প্রেসিডেন্ট হোসেন ইসমাইল জানেন আমি আসবো,' গম্ভীর সুরে বললেন রাহাত খান, রাইফেলটা যে তাঁর দিকে তাক করা রয়েছে তা যেন তিনি দেখেও দেখছেন না। তবে এরইমধ্যে তিনি সতর্ক হয়ে গেছেন, রাইফেল ধরার ভঙ্গিটাই তাঁকে বলে দিয়েছে ওটার পিছনে দাঁড়ানো লোকটা প্রফেশনাল। 'আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন,' বললেন তিনি, অনেকটা নির্দেশের সুরেই।

তীর থেকে আসা আলোয় চকচক করে উঠলো গার্ডের চোখ, সন্দেহের দোলায় দুলছে সে। 'আপনার সাথে আর কেউ এসেছে?'

'না, আমি একা।'

'আপনাকে তীরে ফিরে যেতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে লঞ্চটাকে দেখিয়ে দিলেন রাহাত খান। 'আমার বাহন চলে গেছে।'

মনে হলো ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছে গার্ড। অবশেষে রাইফেলের ব্যারেল নিচু করলো সে, কয়েক পা হেঁটে একটা দরজার সামনে থামলো। খালি হাত লম্বা করে ব্রিফকেসটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে। 'এখানে,' ফিসফিস করে বললো। 'হাতের কেসটা আমাকে দিন।'

'এতে সরকারী ডকুমেণ্ট আছে,' শান্তভাবে বললেন রাহাত খান, সেটা আরো শক্ত করে ধরে গার্ডকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে দরজার দিকে এগোলেন।

ভারি, কালো পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে রাহাত খান দেখলেন, বিশাল একটা বলরুম/ডাইনিং সেলুনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। কামরাটা চারকোণা, দু'হাজার বর্গমিটারের কম হবে না। ভেতরে প্রচুর লোকজন, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে, কারো পরনে বিজনেস স্যুট, কেউ পরে আছে ক্রু ইউনিফর্ম ; সবাই তারা মুখ ফিরিয়ে একযোগে তাঁর দিকে তাকালো, টেনিস ম্যাচে তিনি যেন একটা বল।

চারদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে ন'জন লোক, মারমুখো থমথমে চেহারা সবার, প্রত্যেকের পরনে কালো জাম্পস্যুট, পায়ে কালো জগিং শূ, প্রত্যেকে তার হাতের অটোমেটিক রাইফেল বন্দীদের দিকে অনবরত ঘোরাচ্ছে।

'স্বাগতম,' স্টেজের ওপর, মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ানো লোকটা বললো, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠলো কামরার ভেতর। সশস্ত্র ন'জনের মতো একই কাপড় আর জুতো পরেছে সে, পার্থক্য শুধু আর কারো মুখে মুখোশ নেই। আপনার পরিচয় দিন, প্লিজ।'

'কি ঘটছে এখানে?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

'আপনি কি দয়া করে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন?' ঠাণ্ডা ভদ্র-

তার সাথে জিজ্ঞেস করলো আল দাউদ।

'আমি একজন বাংলাদেশী কূটনীতিক,' বললেন রাহাত খান, এবারও আসল পরিচয়টা গোপন করে গেলেন। 'মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসেন ইসমাইলের সাথে কথা বলার জন্যে এসেছি। আমাকে বলা হয়েছে, তিনি এই জাহাজে আছেন।'

'একটু কষ্ট করে তাকালে দেখতে পাবেন, সামনের সারিতেই বসে আছেন তিনি।'

স্টেজে দাঁড়ানো আল দাউদের দিক থেকে রাহাত খান চোখ সরালেন না। 'সবার দিকে এই লোকগুলো রাইফেল তাক করে আছে কেন? তোমরা কারা?'

'বুঝতে পারছেন না?' বিস্ময় প্রকাশ করলো দাউদ। 'লেডি মেরিয়েটাকে হাইজ্যাক করা হয়েছে।'

প্রচণ্ড রাগে এক সেকেণ্ডের জন্যে দিশেহারা বোধ করলেন রাহাত খান। নিজেকে সামলে নিয়ে আল দাউদের আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর এমন দৃঢ়তার সাথে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তাতে শুধু তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞাই প্রকাশ পেলো। সামনের সারিতে বসা লোকগুলোর দিকে তাকালেন তিনি। এগোলেন।

ক্যাপটেন ব্রেকওয়াল আর তাঁর অফিসারদের পাশ কাটিয়ে এলেন রাহাত খান, তাদের পাশে বসে থাকতে দেখলেন প্রেসিডেন্ট হোসেন ইসমাইল ও প্রেসিডেন্ট অগাস্টিন মোরেনোকে। তারপর উম্মে সালিহাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

লোকজন মারা যাবে উপলব্ধি করে মনে মনে প্রমাদ গুণলেন তিনি।

নিঃশব্দে একটা হাত বাড়িয়ে উম্মে সালিহার কাঁধে রাখলেন, চাপ

দিলেন মৃদু, তারপর চরকির মতো আধপাক ঘুরে আল দাউদের দিকে ফিরলেন। 'ফর গডস সেক, কি করছো তুমি জানো?'

'অবশ্যই জানি। খুব ভালো করে জানি।' রাহাত খানের মুখের ওপর হাসলো দাউদ। 'আল্লাহ্ আমার সাথে প্রতিটি পদক্ষেপ হেঁটেছেন। উপরি পাওনা হিসেবে পেয়েছি জাতিসংঘ মহাসচিবকে। আর আপনি···আপনি দুর্ভাগ্যের শিকার।'

বিশাল কামরার ভেতর গমগম করে উঠলো রাহাত খানের ভারি গলা। 'জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করে বসেছো, হে। নিজেদের ভালো চাইলে, এখনো সময় আছে, পালিয়ে যাও। তা না হলে পস্তানোরও সময় পাবে না।' রাহাত খান আসলে দাউদকে রাগিয়ে দিয়ে দেখতে চাইছেন তার কোনো দুর্বলতা প্রকাশ পায় কিনা।

কিন্তু দাউদ রাগলো না। সে হাসতে হাসতে বললো, 'যা জানেন না তা নিয়ে কথা বলবেন না, প্লিজ। আপনার সাথে আমার কোনো বিরোধ নেই, কারণ আপনি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের নাগরিক। তবে, দুঃখিত, আপনার জন্যে আলাদা কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না, সবার কপালে যা ঘটবে আপনার কপালেও তাই লেখা আছে। এবার, চুপ! মুখ একদম বন্ধ!'

তার শেষ কথাটা রাহাত খান যেন শুনতেই পাননি। সাথে সাথে তিনি জানতে চাইলেন, 'সবার কপালে কি ঘটবে?'

'ধৈর্য ধরুন, নিজের চোখেই দেখতে পাবেন সব।'

একুশ

বিকেল পাঁচটার খানিক পর অফিস থেকে বিদায় নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন জিমি উইলফোর্স, এই সময় সি. আই. এ. হেডকোয়ার্টার থেকে তাঁর সাথে দেখা করতে এলো এক লোক। ডাগ বার্ণসকে তিনি চেনেন, সি. আই. এ. চীফের বিশেষ প্রতিনিধি। বলার অপেক্ষায় না থেকে একটা চেয়ারে বসলো সে, হাতের ব্রিফকেসটা কোলের ওপর ফেলে প্রথমে তালা খুললো, তারপর একটা বোতাম টিপে ভেতরে লুকানো বিস্ফোরক আপাততঃ অকেজো করলো। কেস থেকে মোটা একটা ফাইল বের করে জিমি উইলফোর্সের সামনে ডেস্কের ওপর রাখলো সে।

'চীফ আপনাকে বলতে বলেছেন, মোস্তফা কামাল সম্পর্কে নিরেট তথ্য পাওয়া দুষ্কর। জন্ম, পিতা-মাতা, পূর্ব-পুরুষ, লেখাপড়া, বিয়ে, বাচ্চাকাচ্চা, কিংবা আইনগত কোনো ব্যাপার, তা ক্রিমিনালই হোক বা সিভিল, বলতে গেলে এ-সবের প্রায় কোনো অস্তিত্বই নেই। মধ্য-প্রাচ্যে আমাদের সূত্র থেকে যে-সব তথ্য পাওয়া গেছে তা-ও লোক-জনকে, মানে, তাকে যারা এক সময় চিনতো বলে দাবি করে তাদের

জিজ্ঞেস ক'রে। দুর্ভাগ্য যে তারা সবাই, কোনো না কোনো কারণে মোস্তফা কামালের শত্রু হয়ে ওঠে। কাজেই তাদের বক্তব্য নিরপেক্ষ মনে করা যায় না।'

'আপনাদের সাইকোলজিকাল সেকশন কি বলছে?' জিজ্ঞেস করলেন জিমি উইলফোর্স।

'তারা আবছা একটা প্রোফাইল তৈরি করেছে। তাকে ঘিরে আছে সিকিউরিটির দুর্ভেদ্য দেয়াল। মোস্তফা কামাল মানেই একটা রহস্য। তার আশপাশের লোকজনের সাথে সাংবাদিকরা কথা বলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে সবাই তারা শুধু কাঁধ ঝাঁকায়, মুখ খোলে না।'

'রহস্য আরো বাড়ে।'

নিঃশব্দে হাসলো ডাগ বার্ণস। 'চীফ বলছেন, ছলনাময় মরীচিকা।'

'ফাইলটা নিয়ে আসার জন্যে ধন্যবাদ, বার্ণস,' জিমি উইলফোর্স বললেন। 'হ্যাভ আ নাইস ইভনিং।'

'ইউ টূ,' বলে বিদায় নিলো ডাগ বার্ণস।

জিমি উইলফোর্সের সেক্রেটারী বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলো দরজা। বাক্স থেকে একটা চুরুট বেছে নিয়ে দাঁতের ফাঁকে গুঁজলেন ভদ্রলোক, কিন্তু ধরালেন না। ফাইলটা খুলে ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করলেন।

ডাগ বার্ণস কিছু বাড়িয়ে বলেনি। ফাইলটা যথেষ্ট মোটা হলেও, তাতে শুধু গত দু'বছরের তথ্যই বেশি, মোস্তফা কামাল দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার আগের দীর্ঘ সময় সম্পর্কে লেখা হয়েছে মাত্র ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফ। মোস্তফা কামাল প্রথম খবর হয়ে ওঠে ছোট্ট একটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে। কায়রোর একটা পাঁচতারা হোটেলের সামনে ভুখা-

নাঙ্গা কিছু লোক অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে, সেখান থেকে তাকে গ্রেফ-তার করা হয়, কারণ লোকগুলোকে সে-ই নেতৃত্ব দিচ্ছিলো। কাগজে লেখা হয়, সে নাকি বেশ কিছুদিন থেকে নোংরা বস্তি এলাকায় নিয়-মিত বক্তৃতা দিয়ে আসছিলো।

মোস্তফা কামালের দাবি, কায়রো শহরের একপ্রান্তে, যেখানে দুনি-য়ার আবর্জন ফেলা হয়, তার পাশে ছোট্ট একটা মাটির ঘরে তার জন্ম। পরিবারের সদস্যরা কোনোদিন খেতে পেতো, কোনোদিন পেতো না। অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগে তার দুই বোন আর বাবা মারা যায়। ছেলেবেলায় তার স্কুলে যাওয়া হয়নি, কৈশোরে মৌলভীদের কাছ থেকে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করে সে, যদিও কেউ তারা তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে রাজি হয়নি। মোস্তফা কামাল আরো দাবি করে, দুনি-য়ার শেষ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাকে দেখা দেন এবং তার সাথে কথা বলেন। তিনিই নাকি তাকে আদেশ দিয়ে বলেছেন, ঈমান-দার লোকদের সাথে নিয়ে মিশরকে ইউটোপিয়ান ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলো।

অদ্ভুত সুন্দর ভাষণ দিতে পারে সে। শ্রোতারা তার কথার জাদুতে মুগ্ধ হয়ে যায়। শ্রোতাদের ধর্মীয় আবেগ উসকে দিতেও তার জুড়ি নেই। প্রথমে সে ধীর, শান্তভাবে বক্তৃতা শুরু করে। ক্রমশ গলা চড়তে থাকে, জ্বালাময়ী হয়ে ওঠে ভাষণ, উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকে সে, জিগির শুরু করে, সেই সাথে আগুন জ্বলে ওঠে শ্রোতাদের মনেও। তার দাবি, পশ্চিমা দর্শন মিশরের সামাজিক/অর্থনৈতিক সম-স্যার সমাধান করতে পারবে না। ধর্মীয় সমাবেশে তার প্রিয় বক্তব্য হলো, কাফেরদের সমূলে উৎখাত করার জন্যে ঈমানদাররা যদি তার ডাকা জেহাদে অংশগ্রহণ না করে তাহলে আল্লাহর গজব নেমে

আসবে মিশরের ওপর।

মুখে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করলেও, একাধিক ঘটনা থেকে আভাস পাওয়া যায় যে তার ধর্মীয় আন্দোলনের স্বার্থে সন্ত্রাসী তৎপরতার আশ্রয় প্রায়ই সে নিয়ে থাকে। একটা ঘটনায় এয়ারফোর্সের একজন জেনারেল খুন হন। আরেক ঘটনায় নিহত হন কায়রো ইউনিভার্সিটির চারজন অধ্যাপক, তাঁরা ইসলামী অর্থনীতির বিরুদ্ধে ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পক্ষে বক্তব্য রাখছিলেন। তৃতীয় ঘটনায় ভাগ্যক্রমে কেউ মারা যায়নি, সোভিয়েত দূতাবাসের সামনে বিস্ফোরিত হয় একটা ট্রাক। তদন্ত চালাতে গিয়ে দেখা গেছে প্রতিটি ঘটনার পিছনে গোপনে জড়িত ছিলো মোস্তফা কামাল। নিশ্চিতভাবে কিছু প্রমাণ করা সম্ভব না হলেও, মুসলমান সূত্রের মাধ্যমে সি. আই. এ. জানতে পেরেছে প্রেসিডেন্ট হোসেন ইসমাইলকে খুন করার জন্যে একটা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে মোস্তফা কামাল। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য, জনতা তাকে চায়, এ-কথা বলে সরকারকে উৎখাত করা।

ফাইল বন্ধ করে অবশেষে চুরুটটা ধরালেন জিমি উইলফোর্স। কি যেন তাঁর চোখে পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়েনি, সেজন্যে অস্বস্তিবোধ করছেন। চিন্তা করতে গিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। না, ধরা পড়েনি নয়, কি যেন একটা পরিচিত বলে মনে হয়েছে তাঁর। ফাইলটা আবার খুলে মোস্তফা কামালের ফটোগ্রাফ দেখলেন। ক্যামেরার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে সে।

হঠাৎ করে ব্যাপারটা উপলব্ধি করলেন তিনি। খুবই সহজ একটা ব্যাপার, কিন্তু মহা বিস্ময়কর। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন জিমি উইলফোর্স। সরাসরি একটা লাইন পাবার জন্যে কোড করা নম্বরে চাপ দিলেন। ডেস্কের গায়ে আঙুল

নাচাচ্ছেন, অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

'সি. আই. এ. হেডকোয়ার্টার।'

সি. আই. এ. চীফ-এর গলা চিনতে পারলেন জিমি উইলফোর্স। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি এখনো অফিসে আছো।'

সি. আই. এ. চীফ-ও জিমি উইলফোর্সের গলা চিনতে পারলেন। 'কি ব্যাপার, জিমি? তোমাকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে? মোস্তফা কামালের ফাইলটা পেয়েছো?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ,' বললো জিমি উইলফোর্স। 'ফাইলটা পড়তে গিয়েই তো একটা সন্দেহ ঢুকলো মনে। তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই, কি ব্যাপার?'

'দু'সেট ব্লাড টাইপ আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট দরকার আমার।'

'ফিঙ্গারপ্রিন্ট?'

'হ্যাঁ।'

'আজকাল আমরা জেনেটিক কোড আর ডি. এন. এ. ট্রেসিং ব্যবহার করি,' সি. আই. এ. চীফ জানালেন। 'নির্দিষ্ট কোনো কারণ আছে, জিমি?'

ভাবনাগুলো গুছিয়ে নেয়ার জন্যে চুপ করে থাকলেন জিমি উইলফোর্স, তারপর বললেন, 'কারণটা যদি তোমাকে বলি, ঈশ্বরের দিব্যি, আমাকে তুমি বদ্ধ উন্মাদ ভাববে!'

'ভুলে যেয়ো না,' রাগের সুরে বললো হেনরি মারলিন, 'আমরা ষোলো শো বছরের পুরনো একটা ট্রেইল খুঁজছি। কমপিউটর তো আর অতীতে গিয়ে দেখে আসতে পারে না কেমন ছিলো সেটা।'

'শিল্পকর্মগুলো দেখলে ডঃ মোরেল হয়তো একটা ধারণা দিতে পারতেন,' বললো জেনিথ।

রানা বললো, 'খানিক আগে তাঁর সাথে আমার রেডিওতে কথা হয়েছে।' নুমার অ্যামফিথিয়েটারে বসে রয়েছে ওরা, রানা বসেছে ওদের দু'সারি নিচের সিটে, বাঁ দিক ঘেঁষে। 'তাঁর ধারণা, ভূমধ্য-সাগরের বাইরে কোথাও আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী থাকতে পারে না।'

একটা চিত্রে ফুটে রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর, তাতে তীরের উত্থান-পতন ও ভাঁজগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। স্টেজের ওপর একটা স্ক্রীন জুড়ে রয়েছে সাগরতলের বৈশিষ্ট্য। গভীর ধ্যানমগ্ন দৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। সবাই, শুধু একজন বাদে।

অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন যখন ছোট্ট অ্যামফিথিয়েটারে ঢোকেন বেন নেলসন তাড়াতাড়ি চুরুটটা লুকিয়ে ফেলে। সেই থেকে বারবার তার হাতের দিকে চোরা চোখে তাকাচ্ছেন তিনি। একসময় আর থাকতে পারলেন না, নেলসনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি?'

'আমাকে কিছু বলছেন, বস?'

'তোমার হাতে ওটা কি?'

'জী?' বিব্রত বোধ করলো নেলসন। 'জী, একটা চুরুট।'

'এতো লম্বা?' অবাক হলেন অ্যাডমিরাল। 'হাভানা?'

'জী-না। নাম জানি না।'

'কোত্থেকে পেলে?' রীতিমতো জেরা শুরু করলেন জর্জ হ্যামিলটন।

'বাল্টিমোরের একটা দোকান থেকে কিনেছি।'

আর কোনো সন্দেহ থাকলো না অ্যাডমিরালের, নেলসনই তাঁর

চুরুট চুরি করছে। চুরিটা অনেক দিন থেকেই হচ্ছে, কিন্তু কে করছে বা কিভাবে করছে ধরা যাচ্ছিলো না। বাক্স থেকে প্রতি হপ্তায় দুটো করে চুরুট খোয়া যায়। ঠিক আছে, মনে মনে ভাবলেন অ্যাডমিরাল, কে চুরি করছে তা যখন জানা গেছে, কিভাবে চুরি করছে তা-ও সময়মতো জানা যাবে। 'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে তুমি?' রানাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আমরা ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি,' বললো রানা।

'তুমি বলতে চাও, আরো একটা দৃষ্টিকোণ থাকতে পারে?' প্রায় চ্যালেঞ্জের সুরে প্রশ্ন করলো হেনরি মারলিন।

'দিক-নির্দেশনা না থাকায় কাজটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে,' বললো জেনিথ।

'দুঃখজনক হলো রাফিনাস তার দৈনন্দিন পজিশন বা কতোটা পথ পাড়ি দিলো সে সম্পর্কে লগে কিছু লেখেনি,' অ্যাডমিরাল হতাশা ব্যক্ত করলেন।

'তার ওপর কড়া নির্দেশ ছিলো, কিছু রেকর্ড করা যাবে না।'

'তবে কি তখনকার দিনে পজিশন জানা থাকলে নির্দিষ্ট একটা জায়গা খুঁজে বের করতে পারতো তারা?' নেলসন জিজ্ঞেস করলো।

মাথা ঝাঁকালো জেনিথ। 'গ্রীক হিপারচাস, খ্রিস্টের জন্মের একশো ত্রিশ বছর আগে, ল্যাণ্ডমার্ক-এর পজিশন নির্ধারণ করতেন ওগুলোর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর পিছনে ফেলে আসা ল্যাণ্ডমার্কের দূরত্ব আন্দাজ করে।'

রিডিং গ্লাসটা নাকের ডগায় নেমে এসেছে, ফ্রেমের ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'তোমার চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি

আমি চিনি। কি যেন বিরক্ত করছে তোমাকে।'

সিটের ওপর নড়েচড়ে বসলো রানা। 'এতো কিছু নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি আমরা, কিন্তু আসল লোকটার কথা ভুলে বসে আছি। স্মাগলিঙের প্ল্যানটা ছিলো তাঁর।'

'জুনিয়াস ভেনাটর?'

'তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, একজন বেপরোয়া আবিষ্কারক ও গবেষক। অন্যান্য পণ্ডিতরা যে-সব বিষয় নিয়ে কাজ করতে সাহস পেতেন না, তিনি বিশেষ করে সে-সব বিষয়ে মাথা ঘামাতেন। সমস্যাটাকে এভাবে চিন্তা করতে হবে—আমরা যদি ভেনাটর হতাম, আমাদের সময়কার লাইব্রেরী সম্পদ কোথায় নিয়ে গিয়ে লুকাতাম আমরা?'

'এখনো আমি বলবো—আফ্রিকায়,' দৃঢ়তার সাথে জানালো মারলিন। 'পুবতীরের কোথাও।'

'অথচ তোমার কমপিউটর কোনো মিল দেখাতে পারছে না।'

'সেটা কমপিউটরের দোষ নয়, কারণ ষোলো শো বছরে ল্যাণ্ড ফরমেশন সম্পূর্ণ বদলে গেছে।'

'আচ্ছা, ভেনাটর উত্তর-পুব দিকে অর্থাৎ কৃষ্ণসাগরের দিকে যেতে পারেন না?' প্রশ্নটা জেনিথের।'

'রাফিনাস স্পষ্ট করে জানিয়েছে, যেতে আটান্ন দিন লেগেছিল তাদের,' বললো নেলসন।

চুরুট ধরিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু জাহাজ বহর যদি খারাপ আবহাওয়ায় পড়ে থাকে? ওই সময়ের মধ্যে হয়তো হাজার মাইলও পেরোতে পারেনি।'

তর্ক-বিতর্ক চলতেই থাকলো, কোনো সমাধান আসছে না। এমন সময় হঠাৎ উদ্ভট একটা ধারণা প্রকাশ করে বিপদে পড়ে গেল জেনিথ।

তার ধারণা, ভেনাটির দক্ষিণ বা উত্তর দিকে নয়, পশ্চিম দিকে অর্থাৎ আমেরিকার দিকে এসেছিলেন।

তীব্র প্রতিবাদে চিৎকার জুড়ে দিলো ওরা, শুধু রানা বাদে। জেনিথের সমর্থনে একা এগিয়ে এলো ও। ঠাট্টার ছলে কথাটা বলেছে জেনিথ, রানা সায় দেয়ায় সে-ও অবাক হয়ে গেল।

জেনিথই রানার বিপক্ষে বললো, 'আমেরিকার সাথে কলম্বাসের আগে আর কেউ যোগাযোগ করেছিল, এমন আর্কিওলজিকাল রেকর্ড নেই, রানা।'

'প্রথম কথা, সেরাপিসকে দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, দূরের পথ পাড়ি দেয়ার মতো করেই ওটাকে তৈরি করা হয়,' বললো রানা। 'মায়ান আর্ট ও কালচারের কথাই ধরো, এশিয়া আর ইউরোপের আর্ট ও কালচারের সাথে এমন সব মিল আছে, এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার শুধু একার নয়, অনেকেরই ধারণা, কলম্বাসের আগে আমেরিকায় আরো অনেকেই এসেছিল।'

'আর্কিওলজিস্টরা তোমার কথায় কান দেবে না, রানা,' বললো জেনিথ। ধারণাটা প্রকাশ করায় রীতিমতো লজ্জিত সে।

অ্যাডমিরাল প্রস্তাব দিলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে—রানার যুক্তিটাও পরীক্ষা করে দেখা যাক।'

মারলিন জানতে চাইলো, 'কোথাকার তীর তুমি দেখতে চাও হে?'

গাল চুলকালো রানা। দু'দিন দাড়ি কামানো হয়নি। 'গ্রীনল্যাণ্ড খাঁড়ি থেকে শুরু করো, দক্ষিণ দিকে এগিয়ে পানামায় এসো।' চার্ট প্রজেকশনের দিকে তাকিয়ে আছে ও। 'ওখানে কোথাও লাইব্রেরীটা থাকলে একটুও আশ্চর্য হবো না।'

*

ব্রিজ ব্যারোমিটারে আঙুলের একটা টোকা দিলেন ক্যাপটেন মাইকেল ব্রেকওয়াল। তীর থেকে আসা অস্পষ্ট আলোয় কাঁটাটা কোনোমতে দেখা গেল। মনে মনে হতাশ হলেন তিনি। আবহাওয়া শান্ত থাকবে। যদি ঝড় উঠতো, ভাবলেন তিনি, জাহাজ নিয়ে হারবার ত্যাগ করা সম্ভব হতো না। ক্যাপটেন ব্রেকওয়াল প্রথমশ্রেণীর নাবিক হলেও, মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর ভালো ধারণা নেই।

নব্বই নট বেগে বাতাস বইলেও লেডি মেরিয়েটাকে নিয়ে খোলা সাগরে বেরুবে আল দাউদ। ব্রিজ উইণ্ডোর পিছনে, ক্যাপটেনের সিটে বসে আছে সে, টান টান হয়ে আছে পেশীগুলো, জুলফি আর মাথার পিছনের চুল থেকে গড়িয়ে পড়া ঘামের ধারা মুছছে বার বার।

স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় মুখোশ আর দস্তানা পরে থাকতে কষ্ট হচ্ছে তার। কিন্তু খুলে ফেলারও উপায় নেই। হাইজ্যাকিঙ যদি ব্যর্থ হয়, তাকে যদি পালাতে হয়, আন্তর্জাতিক ইণ্টেলিজেন্স সার্ভিস সাক্ষী বা ফিঙ্গারপ্রিণ্টের সাহায্যে কখনোই তার পরিচয় উদ্ধার করতে পারবে না।

প্রায় অন্ধকার ব্রিজে হেলম-এর দায়িত্ব নিয়েছে টেরোরিস্টদের একজন, চোখে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। দু'জন সশস্ত্র লোক ব্রিজের দরজা পাহারা দিচ্ছে, তাদের অস্ত্র ক্যাপটেন আর ফার্স্ট অফিসার হ্যারি ওয়েটের দিকে তাক করা। দু'জনেই ওরা দাঁড়িয়ে আছে দাউদের হেলমসম্যানের পাশে।

জোয়ার আসার পর নোঙরের মাথায় ঘুরে গেছে লেডি মেরিয়েটা, হারবার এণ্ট্রান্সের দিকে মুখ করে রয়েছে জাহাজ। চোখে বিনোকিউলার তুলে শেষ একবার হারবারের চারদিকটা দেখে নিলো দাউদ,

তারপর একটা হাত তুলে সংকেত দিলো হ্যারি ওয়েটকে, কথা বললো পোর্টেবল রেডিওতে। 'তৈরি হও, এখুনি.' নির্দেশ দিলো সে।

রাগে বিকৃত হয়ে আছে হ্যারি ওয়েটের চেহারা, ঝট করে ক্যাপটে-নের দিকে ফিরলো সে। ম্লান চেহারা নিয়ে ক্যাপটেন শুধু মৃদু কাঁধ ঝাঁকালেন। অগত্যা বাধ্য হয়ে নোঙর তোলার নির্দেশ দিলো ফার্স্ট অফিসার।

দু'মিনিট পর কালো পানি থেকে জাহাজে উঠে এলো নোঙর। হুইলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও স্পোক ধরার কোনো চেষ্টা করলো না হেলমস্ম্যান। আধুনিক জাহাজ সাধারণত শুধু খারাপ আবহাওয়ায় ম্যানুয়ালি চালানো হয়, কিংবা পাইলটের সাহায্যে কোনো বন্দর ত্যাগ করার সময় বা বন্দরে ঢোকার সময়। লেডি মেরিয়েটায় রয়েছে আটোমেটিক কন্ট্রোল সিস্টেম, বোতাম টিপে সব কাজ সমাধা করা হয়। দায়িত্বে রয়েছে ফার্স্ট অফিসার, রাডার স্ক্রীনের ওপরও তীক্ষ্ণ একটা চোখ রেখেছে সে।

হাইজ্যাক করা জাহাজটাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে আল দাউদ। সন্ধ্যার পর চারদিকে গাঢ় হয়ে নেমেছে অন্ধকার, প্রমোদতরীর কাঠা-মোটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে শুধু অপর তীরের আলোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালে। কি ঘটে যাচ্ছে কেউ লক্ষ্য করলো না। ধীরগতিতে এগোলো লেডি মেরিয়েটা, সাবধানে অন্যান্য নোঙর করা জাহাজ-গুলোকে পাশ কাটিয়ে এলো। চ্যানেলে বেরিয়ে এসে ঘুরে গেল খোলা সাগরের দিকে।

ব্রিজ ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে কমিউনিকেশন রুমের সাথে যোগাযোগ করলো দাউদ। 'কিছু বলার আছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সে।

'এখনো কিছু ঘটছে না,' তার একজন অনুচর জবাব দিলো। উরুগুয়ে নেভীর পেট্রল বোটগুলোর রেডিও ফ্রিকোয়েন্সী মনিটর করছে সে।

'কোনো সংকেত পেলেই ব্রিজ স্পীকারে রিলে করবে।'

'জ্বী, জনাব।'

'ছোটো একটা বোট আমাদের বো-র সামনে দিয়ে পার হচ্ছে,' জানালো হ্যারি ওয়েট। 'আমাদের দিক বদলাতে হবে।'

অটোমেটিক পিস্তলের মাজলটা হ্যারি ওয়েটের খুলির গোড়ায় চেপে ধরলো দাউদ। 'কোর্স আর স্পীড যা আছে তাই থাকবে।'

'ধাক্কা লাগবে!' প্রতিবাদ করলো হ্যারি ওয়েট। 'আমাদের আলো নেই, ওরা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না!'

উত্তরে মাজলটা আরো জোরে চেপে ধরলো দাউদ।

ক্রমশ এগিয়ে আসছে বোটটা, লেডি মেরিয়েটা থেকে সবাই তারা পরিষ্কার দেখতে পেলো ওটাকে। বেশ বড় একটা মোটর ইয়ট, লম্বায় চল্লিশ মিটারের কম হবে না, আন্দাজ করলেন ক্যাপটেন ব্রেকওয়াল। চওড়া হবে আট মিটার। খুব সুন্দর দেখতে, উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে। ইয়টে সম্ভবত জমজমাট পার্টি চলছে, ডেকে প্রচুর লোকজন, বাজনার তালে তালে একদল নারী-পুরুষ নাচছে। রাডার অ্যান্টেনা ঘুরছে না দেখে শিউরে উঠলেন ব্রেকওয়াল।

'হর্ন বাজিয়ে সতর্ক করো ওদের,' তাড়াতাড়ি অনুরোধ করলেন তিনি। 'সময় থাকতে ওদেরকে সরে যাবার একটা সুযোগ দাও।'

অবজ্ঞার সাথে চুপ করে থাকলো দাউদ।

দুঃসহ সেকেণ্ডগুলো পেরিয়ে যেতে লাগলো। এক সময় সবাই উপলব্ধি করলো, সংঘর্ষ অবধারিত। ইয়টের ডেকে যারা নাচানাচি

করছে বা যে লোকটা হেলমের দায়িত্বে রয়েছে, কেউ তারা টের পায়নি অন্ধকারের ভেতর থেকে ইস্পাতের তৈরি প্রকাণ্ড একটা দানব তাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছে।

'অমানবিক !' হাঁপিয়ে উঠলেন ব্রেকওয়াল। 'এ স্রেফ অমানবিক !

ইয়টের স্টারবোর্ড সাইডে সরাসরি বো-র ধাক্কা মারলো লেডি মেরিয়েটা। বড় কোনো ঝাঁকি লাগলো না, ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের ঘর্ষণে তেমন কর্কশ কোনো আওয়াজও শোনা গেল না। লেডি মেরিয়েটার চারতলা সমান উঁচু বো-র নিচে চাপা পড়ে গেল ইয়টটা সামান্য একটু কাঁপুনি অনুভব করলো ব্রিজে দাঁড়ানো লোকজন বো-র নিচে চাপা পড়া ইয়ট পানির নিচে নেমে গেছে, মাঝখান থে দু'টুকরো হয়ে গেছে আগেই।

ফরওয়ার্ড ব্রিজে রেইলিঙ ধরে থরথর করে কাঁপছেন ক্যাপ্টেন ব্রেকওয়াল, ইয়টের ভাঙাচোরা অংশ লেডি মেরিয়েটার পাশ ভেসে যেতে দেখছেন তিনি, নারীকণ্ঠের করুণ আর্তনাদ প শুনতে পাচ্ছেন। কোনো একটা অংশও পঞ্চাশ মিটার যেতে পা না, তার আগেই ডুবে গেল। লেডি মেরিয়েটার পিছনে আলে পানিতে লাশ ভাসতে দেখলেন তিনি।

হতভাগা মাত্র কয়েকজন আরোহী ইয়ট থেকে ছিটকে পড়ে সাঁতার কেটে আরো দূরে সরে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে তাদের মধ্যে যারা আহত, সাঁতার কাটতে পারবে না, কিছু ধরার জন্যে হাতড়াচ্ছে চারদিকে। হঠাৎ অন্ধকারে হারিয়ে তারা।

'ইউ, মার্ডারিং বাস্টার্ড !' চিৎকার করে উঠলো হ্যারি ও দলা থুথু ছুঁড়ে দিলো দাউদের দিকে।

'ন্যায়-অন্যায় বিচার করার মালিক একা শুধু আল্লাহ,'

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানিঅর্ডার যোগে ১০০'০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা, ক্লাসিক বা অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনা-মূল্যে ক্যাটালগের জন্যে সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

কিশোর থ্রিলার-৪০

তিন গোয়েন্দার ৩৭তম রহস্যোপন্যাস

পোচার

রচনা : রকিব হাসান

প্রকাশের তারিখ : ৫-২-৯০ মূল্য—২০'০০

বিষয় : আফ্রিকার টিসাভো ন্যাশন্যাল পার্ক দেখতে এসে ভয়ংকর চোরা-শিকারীদের সংগে জড়িয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা। তাদের নেতা, কুখ্যাত লর্ড জন সিলভার। কেউ দেখেনি তাকে, জানে না কোন্ দেশী, চেহারা কেমন। তাকেই ধরার প্রতিজ্ঞা করলো তিন গোয়েন্দা।